# আচার্য্য-বাণী

( আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী )

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় বি. এ.

সঙ্কলিত

বুক করপোরেশন্‌ লিমিটেড.

১/১, গোপাল বসু লেন

কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক :—

**বুক করপোরেশন লিমিটেডের**

পক্ষে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ ঘোষ

১১, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা

**ঢাকা এজেণ্টস্ :—**

আসাম বেঙ্গল লাইব্রেরী

ও

স্কুল সাপ্লাই কোম্পানী

প্রিণ্টার :—শ্রীরামকৃষ্ণ পান

**লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস**

২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রাতঃস্মরণীয়

## আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-স্মরণে

**হে দেব!**

যাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের জন্য আপনি সর্ব্বত্যাগীর জীবন
যাপন করিয়াছেন, আপনার সমগ্রজীবন যাহাদের অশেষ
মঙ্গল-চিন্তায় সমাহিত ছিল, যাহাদের কল্যাণ কামনায়
দধীচির ন্যায় আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হন নাই,
আপনার সেই

**অতি প্রিয়, অতি আপনার**

বঙ্গের যুবকগণকে

আপনারই লেখা
এই "প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র-সংগ্রহ"
তাহাদের সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য
সানন্দে উৎসর্গ
করিলাম।

বিনীত—**প্রকাশক।**

# প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "প্রবন্ধ ও পত্রাবলী"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, প্রথমখণ্ডে সন্নিবেশিত আচার্য্যদেবের প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর ন্যায় ইহাতেও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র একত্র গ্রথিত হইয়াছে। আচার্য্য-দেবের বহুমুখী প্রতিভা ও দেশের কল্যাণে তাঁহার সদাজাগ্রত চক্ষু জনকল্যাণের কোন্ ক্ষেত্রকেই উপেক্ষা করে নাই। তাঁহার বহুমূল্য প্রবন্ধ ও বক্তৃতারাজির মধ্যে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ, অন্ন ও খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়, দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষাসমস্যার সমাধান, জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্যার নিরসন দ্বারা একজাতি গঠনের সূত্র নিরূপণ, অন্যান্য জাতির আক্রমণ হইতে দেশের শিল্পবাণিজ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আচার্য্যদেব প্রতিনিয়ত চিন্তা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় অতি পরিষ্কারভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র-সংগ্রহ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় প্রতি গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত।

আচার্য্যদেবের বাণী যাহাতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় না থাকিয়া একত্র সন্নিবদ্ধ পুস্তকাকারে সকলের অনায়াসলভ্য হয়, এই উদ্দেশ্যে এই দুর্ম্মূল্যতার বাজারেও আমরা এই সংগ্রহ প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, দেশের কল্যাণব্রতী সকলেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সহায় হইবেন। আচার্য্যদেবের বাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

**বলা বাহুল্য এই সমস্ত প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র পূর্ব্বে কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।**

'বেঙ্গল পেপার মিলের' শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সৌজন্যে কিছু কাগজ পাওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা,
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৩

বিনীত—**প্রকাশক**

# সূচীপত্র

| বিষয় | | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|

# আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী

## ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ

এই জায়গার সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। উত্তরে একটু তফাতে তিন কুড়ি বৎসর আগে আমাদের মাইনর স্কুল ছিল। মাঠের ভিতর বলে তাকে "মাঠের স্কুল" বলিত। আমার কত সহাধ্যায়ী ছিলেন ; কাটীপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ বসু, অতুলবাবু সবাই এক সঙ্গে পড়েছি। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে মনে কত ভাব হয়, হিংসা হয়, পড়তে ইচ্ছা করে। "আলো ও ছায়া"র একটি কবিতার কথা মনে পড়ে—

"স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে,
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়।"

"আলো ও ছায়া"র প্রায় সব কবিতাই আমার মুখস্থ আছে। এখনও এই বুড়া বয়সে আমি মুখস্থ করি। ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করা ভাল। এই স্কুল আমার বড় সাধের স্কুল।—বাংলাদেশের কেন, আমি ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই ঘুরে বেড়াই। বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে অহরহ যাতায়াত করি। এই সেদিন বোম্বাইএর দক্ষিণ পুনা সহর থেকে আস্‌ছি। বোম্বাই অঞ্চলে মেয়েদের পর্দ্দা নাই—সেখানে স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ে সব একসঙ্গে পড়ে। মেয়ে-ছেলেরা পুরুষের সাম্‌নে একহাত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে না। আমি উইলসন কলেজে একবার ছদ্মবেশে গিয়াছিলাম। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় ধরিয়া ফেলিলেন এবং ছেলেদের লেক্‌চার দিতে বলিলেন। বক্তৃতা দিতে গেলাম—গিয়া দেখি প্রথম দুই বেঞ্চে শুধু বর্ষীয়সী মহিলারা সব বসিয়াছেন। পুনায় ফার্গুসন কলেজেও ঐরূপ দেখিয়াছি। মেয়েদের বলিলাম তোমাদের বাংলার ভগিনীরা তোমাদিগকে এরূপ দেখিলে লজ্জায় ও হিংসায় মরিয়া যাইবে। মোটের উপর আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়া পর্দ্দা-প্রথা প্রায় কোন প্রদেশেই নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় সাড়ে নয়শ' স্কুল। এই এতগুলি স্কুলের ছেলে কেবল পুস্তকে-লেখা গদ তোতাপাখীর মত মুখস্থ করে ; কি সর্ব্বনাশের কথা—যেটুকু শুধু পরীক্ষায় লাগিবে কেবল সেইটুকু গলাধঃকরণ করিয়াই খালাস—নিশ্চিন্ত। বাস্তবিক পক্ষে লেখাপড়াকে অত ছোট করিয়া ভাবা উচিত নয়। শুধু বই পড়িলেই জ্ঞানলাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা একটা সামান্য জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ করিতে যাওয়া আহাম্মুকি নয় কি? শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের যাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

* আচার্য্য রায়ের গ্রামস্থ স্কুলের ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ। জ্যোতিশচন্দ্র বসু বি-এ হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক অনুলিখিত। (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিও না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" পরিশ্রম করিলে মানুষ ছোট হয় না। নীচকুলে জন্মিলেও মানুষ নীচ হয় না। পঞ্চম বেদ মহাভারতে দেখিতে পাই, মহাবীর কর্ণকে যখন সূতপুত্র বলে ঠাট্টা করা হয়েছিল, তখন কর্ণ গর্ব্বভরে উত্তর করেছিলেন, "সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।" বৈশম্পায়নও মহাভারতে বলেছেন—

"ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভির্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ।"

আমি নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা যাই—শীতের সময়—গ্রীষ্মের সময় এক মাস করে ছুটী ছিল। বাড়ী এসেই কোদালী ধরতাম। যত নারিকেল গাছ আমার বাড়ীর চারিপাশে দেখ, এই হাতে তাদের পুঁতেছি, চারা বাঁচাইয়া বড় গাছ করেছি। বাগানের জন্য আমার নেশা ছিল—মদের বোতলের উপর মাতালের নেশার মত। নিজের হাতে বেড়া ঘিরেছি। বাবার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না, লোকজনও যথেষ্ট ছিল। সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে বলে মনে কখনও এমন হয়নি যে পরিশ্রম করতে নেই। তোমাদের কেন এমন হয়?

বিলাত যাইতেছিলাম। তোমরা বোধহয় ম্যাপে মাল্টা দ্বীপ দেখেছ। মাল্টা হইতে একজন ইংরেজ জাহাজে উঠেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে ফুটবল খেলার কথা হইল। স্বাস্থ্যের জন্য খেলার কথা বল্লেই তোমরা ধরে বস ফুটবল। তিনি বলিলেন, "ফুটবল স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে।" একে ত অতিরিক্ত পরিশ্রম—তাহাও আবার কয়জনের হয়—এগার দুগুণে বাইশ জনের মাত্র। কিন্তু ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার লোক জড় হইয়া কেবল মজা দেখে। পাড়াগাঁয়ে এমন কেউ নেই যার বাড়ী দু'কাঠা পাঁচ কাঠা জমি নেই। অনেকের দু'দশ বিঘাও আছে। যদি কোদাল নিয়ে সকালে আধ ঘণ্টা ও বিকালে আধ ঘণ্টা কাজ কর, বৎসরের শেষে কতটা জমি নিজ হাতে চাষ করতে পার ভাব দেখি। কচু বেগুণ কত করতে পার—একটা লাউ গাছ কর—কত কুড়ি লাউ ফলে। ছোট ঘেরা দিয়ে একটা সিম গাছ করে', উপরে একটা মাচা দেও ও গাছের গোড়ায় সার দেও ত দেখবে গাছের "ভাল ধাত" হবে—কত হাজার সিম ফলে ভাব দেখি?

আমাদের ছেলেবেলায় শুনেছি—মা' প্রায়ই বলতেন—"ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোণা।" খুব কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ হতে হয়। আর নিজের পরিশ্রমের অর্জ্জিত দ্রব্য দেখিতে কত সুন্দর, খাইতে কত মিষ্ট, রূপে সেগুলি অনুপম, গুণে অতুলনীয়।

অনেকে বলে খাই কি? কিন্তু আমি বলি পরিপাক করি কি প্রকারে? ইহাই প্রশ্ন হওয়া উচিত। আমাদের খাবার জিনিসের অভাব; অবস্থা ভাল নয়; তা বেশ। ফ্যানে ফ্যানে ভা'ত খাও। সিকি পয়সা খরচে বেশ সারবান জলখাবার হয়। দুই আনায় এক সের ছোলা। এক মুঠা ভিজালেই যথেষ্ট। একটু আদার সঙ্গে খাইলে এক পোয়ায় সাতদিন চলে। এরূপ খাদ্য কি লুচি, না সন্দেশ? ইংরেজীতে ইহাকে "পারফেক্ট ফুড"

বলে। লক্ষ্মীপূজার সময় তোমরা মুগের অঙ্কুর খাও। ঐরূপ অঙ্কুর খাইতে পাইলে শরীর দ্বিগুণ সবল হয়। উহাতে 'ভাইটামিন' বলে এক প্রকার জিনিস আছে, তাহা শরীর গঠনের পক্ষে বিশেষ কাজ করে। সিকি বা আধ পয়সা ব্যয় সকলেই করিতে পারে। কিন্তু সে সব খাবার এখন উঠিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল গৃহস্থ বাড়ী খই ভাজার ধান রাখা হয়; কেহবা মুড়ির চাউল তৈয়ার করিতে জানেন। আজকালের বউরা লুচি ও হালুয়া তৈয়ার করিতেই জানেন। সে কালের সস্তা অথচ সারবান খাবার তাঁহাদের নিকট অতি নিকৃষ্ট। খই গুড়, মুড়ির সহিত মোঝোলা গুড়ের চাক্তি, যা আমি এখন খাই, অতি উত্তম খাবার। নিজের হাতের পোতা কলা আরও মিষ্ট, কথায় বলে "আপন হাত জগন্নাথ।"

এখন কি কপাল পুড়েছে! আমাদের ছেলেবেলায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে গরু ছিল; গ্রামে গো-চারণের মাঠ ছিল। গৃহস্থের প্রধান কাজ ছিল গো সেবা করা—ভগবতীর এক রকম মূর্ত্ত্য উপাসনা। বাড়ার কর্ত্তা-কর্ত্রী ঐ সেবার ভার লইতেন। দুগ্ধ ত পাওয়াই যাইত, গোবরও জ্বালানী কাষ্ঠের ও সারের কাজ করিত। গোমূত্র গোবর ফেলা পলকুটা পচিয়া সার হইত। সকল দেশেই ইহা ব্যবহৃত হয়। বিলাতে এডিনবরা সহরের অতি সন্নিকটে দেখেছি গরুর মলমূত্র সারের জন্য ব্যবহার হয়। মনুষ্যের "নরবর" (বিষ্ঠা) আরও ভাল। জাপানে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে একটা হাত গাড়ী আছে; তাতে করে বিষ্ঠা রাখে এবং তাহা কৃষকেরা খোষামোদ করিয়া লইয়া যায় ও জমিতে দেয়। কলিকাতায় ধাপার মাঠ আছে। ঐ মাঠ মলমূত্র আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিঘা প্রতি যথেষ্ট খাজনা ও সেলামি আদায় করিয়া ঐ সার বিলি করে। সেখানে ভাল ভাল কফি, বেগুন ইত্যাদি হয়। এসব হেয় জ্ঞান করার নয়। গোসেবা করিতে বার মাস নিজেরা কেন পারিবে না? গো সেবা করিলে লক্ষ্মীর প্রকৃত পূজা ঘরে ঘরে করা হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি আপশোষ মিটাইয়া খাইতে পার অথচ ব্যয় সামান্য। পাড়াগাঁয়ে এসব এখনও আছে বটে, কিন্তু নামমাত্র। এখন বর্ষাকালে ।৶০ ছয় আনা মূল্যে দুধ বিকায়—কয়জন তাহা খাইতে পায়? পাড়াগাঁয়ে গরুর চেহারা দেখিলে প্রাণ কাঁদে।

তোমরা যখন কলেজে যাবে একটি একটি ক্ষুদ্র নবাব হবে। খাসা টেড়ী, তাম্বুল রাগে রক্ত অধর, কি নধর দেহখানি। মা-বাপ কত কষ্ট করে খরচ পাঠান, আর তোমরা সহরে সিনেমা ও থিয়েটারে গিয়া—আর এখন পাড়ায় পাড়ায় রেস্তোরা হইতেছে, সেখানে যাইয়া চপ্ কটলেট—অনেক সময় অর্দ্ধপচা মাংস প্রভৃতি খাইয়া, সেই অর্থের কি সদ্ব্যবহার কর? গ্রীষ্মকালে আড্ডা, তাস, দিনের বেলায় ঘুম। দৈহিক পরিশ্রমে পাপ, হীনতা বোধ কর। যারা দু' পাতা পড়েছে তাদের রোজগারের ক্ষমতা নাই; কিন্তু কাজও কর না। তোমরা লেখাপড়া শিখছ, ডিগ্রি পেলেই তোমাদের শিক্ষা ফুরাল। কিন্তু তা নয়। লেখাপড়া শেখে কেন? দুনিয়াটা চক্ষু মেলে প্রকৃতভাবে দেখার জন্য। প্রকৃতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার জন্য। কিন্তু তা কৈ? পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে প্রভেদ কি? আমার

ছেলেবেলায় গ্রামের প্রজাদের বল্‌তে শুনেছি "আমরা চোখ থাক্‌তে কাণা!" সত্যই অশিক্ষিত লোকগুলি পশুর মত—"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

চোখ ফুটলে তবে দেখতে পাবে, তোমরা যা করছ সব ভূয়া। ঐ যে ইংরেজ দর্পভরে পা' ফেলে চলে যাচ্ছে ওর কর্ম্মশক্তি যে কতবেশী প্রকৃত লেখাপড়া শিখিলে তা চোখে পড়বে। উহাদের নিকট শেখার অনেক আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না—সাধে কি এত বড় রাজ্য হয়েছে? আমাদের মত কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি কখনও এরূপ বৃহৎ সাম্রাজ্য করতে বা চালাতে পারে না। ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীময় সমুদ্রবক্ষে সদর্পে ভ্রমণ করছে। চীন জাপান অষ্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে—দুস্তর আটলান্টিক পার হয়ে মার্কিণে যাচ্ছে। পৃথিবীর যা কিছু ভাল জিনিস সবই তারা নিজেদের দেশে আন্‌ছে। বিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই করে কাঁচামাল দেশে নিয়ে সেগুলি তৈরী করে আবার বিদেশে চালান দিচ্ছে। বোম্বাই থেকে তুলা ল্যাঙ্কাসায়ার কেনে, আবার কাপড় করে বোম্বাইতে ফেরৎ পাঠায়। কত লাখ লাখ টাকা নিয়ে যায়—শুধু আমাদের এই বাংলা দেশে বছরে পঁয়ত্রিশ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হয়। একবার ভাব দেখি বিদেশীয়েরা কি টাকাই উপার্জ্জন করে। আর আমরা কেবলই দেশের টাকা বিদেশে পাঠাই, আর দেশের লোকের অন্ন মারছি। আমার ছোট বেলা রাড়ুলির ঘাটে ২৫।৩০ খানা পান্‌সি থাক্‌ত; কাটীপাড়ায় থাক্‌ত ৫০।৫৫ খানা। সে সব আর এখন নাই, সেদিন গিয়াছে। মাঝিরা জমি বিভাগ করিয়া লইয়া লাঙ্গল ধরেছে অথবা বাবুর্চ্চি হয়েছে। ষ্টিমারে আমরা যাতায়াত করি, পায়ে হাঁটা ত ভুলে গেছি। যখন কলিকাতায় যাও বা বিদেশে যাও তখনই টাকার ৮০ বার আনা বিলাতে মণিঅর্ডার কর। বাকীটা খালাসী মিস্ত্রী আর ঐ "নিরক্ষে" কেরাণীবাবুরা পান। রেলওয়েতেও ঐ প্রকার। রেল-ষ্টিমারের লোহা-লক্কড় কল-কব্জা সবই বিদেশের। এসব যদি আমরা করতে পারতাম তবে আমাদের কিসের অভাব হইত? আর এখন ত মোটর গাড়ী সর্ব্বত্র।

একটু কষ্ট করতে হবে। ইংলণ্ডে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভোঁ ভোঁ করে চরকা চল্‌ত। কামার হাতুড়ি পিটত। কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া, গতর খাটাইয়া, লোকের অন্ন সংস্থান করিতে হইত। গরুর রাখাল পরে কয়লার খনির কুলি ষ্টিফেনসন্ লোকোমোটিভ ষ্টিম-ইঞ্জিন অর্থাৎ গতিশীল রেলগাড়ি আবিষ্কার করেন। তিনি লেখাপড়া জান্‌তেন না। তাঁর ছিল মাথা আর শক্ত খাটা খাটুনির দেহ। জেম্‌স্ ওয়াট তাহার পূর্ব্বে—ষ্টীমের শক্তির আবিষ্কার করেন। এই দুজনের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা রেলওয়ে ষ্টীমার হল। তোমরা বই মুখস্থ করে আর কেরাণীগিরির দরবার করে এই উৎসাহী পরিশ্রমী জাতির সহিত টক্কর দিয়ে কি করে পারবে? রেলওয়ে ষ্টীমারের সহিত কলার ভেলা কি প্রতিযোগিতা করতে পারে?

"সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার, জোলা কর্ম্মকার করে হাহাকার।" আজকাল লাখ লাখ কর্ম্মকারের অন্নকষ্ট। 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।' আজ যদি আমাদের ঘরে ঘরে

চরকার প্রচলন থাকত এবং সেই সূতায় যদি জোলা তাঁতি কাপড় বুনিত তবে কত কোটী টাকা দেশে থাকত। এই বুদ্ধি আপনা হইতে খেলে না। হাতে কলমে কাজ করতে করতে খেলে—"কর্ম্মণা বর্দ্ধতে বুদ্ধিঃ?" কিন্তু কাজ তোমরা করবে না। তোমাদের সম্মানের আদর্শ বড় আশ্চর্য্যজনক। যদি কুড়ালি মার, কাট ফাড়, "খারৈ" হাতে করে মাছ আন, ভাব্‌বে আমার বুঝি লজ্জা পেতে হ'বে।

বাংলাদেশে হাজার ত্রিশেক ছেলে কলেজে পড়ে, আমার মনে হয় যদি পাঁচ হাজার বাছা বাছা ছেলে কলেজে পড়িত, তা'হলে ভাল হ'ত। পাশ করে চাকরি কয়জনের জুটে? নূতন ডিপার্টমেণ্ট হইতেছে না, বরং সর্ব্বত্রই ব্যয় সংকোচের ডাক হাঁক চলিতেছে। যে কোনো অফিস বল, একবার একজন ঢুকিলে আর জায়গা কই? একজন না মরিলে ত আর জায়গা হয় না! আর এদিকে দেখ কত শত শত গ্রাজুয়েট বসে আছে—সর্ব্বত্রই চাহিদার চেয়ে আমদানী বেশী। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সর্ব্বজাতির ভিতর লেখাপড়া শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। পনের বিশ হাজার ছেলে ম্যাট্রিক দেয়—এত ছেলে কেবল চাকুরীর জন্য লেখাপড়া শিখিতেছে, কি ভয়ানক কথা!!!

লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে চাকুরী করতে হয় তা নয়। বুদ্ধি-বৃত্তিকে একটু মার্জ্জিত করা, দেশের ও দুনিয়ার সমস্ত খবর রাখা—এই সব লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এদেশে শতকরা সর্ব্বশুদ্ধ ৫ পাঁচজন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট, কিন্তু জাপানে শতকরা ৯৮, আমেরিকায় শতকরা ১০০ জন বল্লেও হয়, তারা কি কেবল চাকুরি করে? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কথা শুনেছ—তিনি নিজের জীবনস্মৃতি লিখে গেছেন। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে রত ছিল, তখন জর্জ্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, আর ফ্রাঙ্কলিন দৌত্যকার্য্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতা-সমরে বিজয়লক্ষ্মী আমেরিকার অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত মহাপুরুষ নিজের চেষ্টায় ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে লেখাপড়া শিখেছিলেন। অতি সাধারণ অবস্থাপন্ন ঘরে ইঁহার জন্ম। স্কুল কলেজে কতটুকু শিক্ষা হয়? আমার নিজের লেখাপড়া বিদ্যাবুদ্ধি যদি স্কুলে কলেজে একগুণ হয়ে থাকে তবে নিজের চেষ্টায় সহস্রগুণ হয়েছে। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী পড়েছ? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী পড়েছ? কি কষ্ট করেই এঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরিশ্রমের কাজ করিলেই যে লেখাপড়া হয় না, ছোট হয়ে যেতে হয় তাহা তোমার বল্‌তে পার না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে লিখেছেন। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ছিল তা শুনলে অবাক্ হতে হয়। কোন দিন অন্ন জুটিত, কোন দিন জুটিত না। সেজন্য তাঁহাকে কেহ কখনও বিমষ দেখিত না। একবেলা তিনি নিজে রাঁধিয়া মাকে অবসর দিতেন। মা সেই সময় কাঁথা সেলাই করিয়া পয়সা রোজগার করিতেন।

তোমরা বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়েছ? কত শারীরিক পরিশ্রম তাঁকে করতে

হ'ত। ভাত রেঁধে খেয়ে সকলকে খাওয়াইয়া তবে স্কুলে যেতে হ'ত। তোমরা ভাব বাড়ীর কাজ করতে হলে আর পড়া হয় না। শিক্ষা নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। স্কুল কলেজে শুধু কোন্ পথে যাবে তাই দেখে নেওয়া, হাট্‌তে হবে তোমাদের।

যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি একটু কম খেলে হতাশ হইও না। যে যে বিষয়ে পার এগিয়ে যাও। আমাদের বংশের সকলেই অঙ্কে খাট; কিন্তু ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের বড়ই প্রিয়। আমার কনিষ্ঠ পূর্ণ সন তারিখ সব মনে রাখতে পারে; কাহার সহিত কোন সনের কোন তারিখে দেখা হ'য়েছিল, বাংলায় কোন সাহেবের আমলে কোথা হইতে কোন্ পর্য্যন্ত প্রথম রেললাইন খুলে ছিল, কোন্ সন কোন্ তারিখে কাহার ছেলের জন্ম, মেয়ের বিবাহ, বাপের শ্রাদ্ধ হয়েছিল সমস্ত পূর্ণর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই বল্‌তে পারবে। আমার দাদা যখন 'মাঠের স্কুলে' পড়তেন, তখন তিনি রহস্য করে বল্‌তেন ইতিহাস হ'লো ইতি হাস, আর ম্যাথেম্যাটিকস্ না—মাথায় মাটি। লর্ড বাইরণ একজন বড় ইংরেজ কবি, জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার মাথায় ঢুকিল না। স্যর ওয়াল্‌টার স্কট একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক—ঐরূপ লেখক এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একাধারে কবি ও ঐতিহাসিকও বটেন। একখানা জীবন-চরিতে পড়িয়াছি তাঁহার শিক্ষক অঙ্ক কষাইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Dunce he was and dunce he would remain."

খাদ্যের অভাবে আমাদের প্রকৃত লেখাপড়া হয় না তা নয়। চেষ্টার অভাবই মূল কারণ। পাড়াগাঁয়ে কত ভাল খাদ্য—মুড়ির চাক্‌তি, নলেন গুড়। "সরষে ফুলে" ফুট হইতে যখন "চাল্‌তে ফুটে" আসে সেই তাত রস কি মধুর কি উপাদেয়। একটা বড় পুবে "ডয়"* কি সুন্দর খাদ্য।

কলা এত সারবান খাদ্য যে ইংলণ্ডের সমস্ত জায়গায় ঠেলা গাড়ী করে ফেরি করে নিয়ে বেড়ায়, জাহাজে করে বোঝাই হয়ে আসে, ইংলণ্ড কলায় কলায় ছেয়ে যায়। আনারস আগে ১০।১২ টাকা করে বিক্রী হত। 'হট-হাউসে' তৈরী করতে হ'ত। এখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে জাহাজে করে আসে—এসব এমন উপাদেয় খাদ্য যে বিদেশ থেকে জাহাজ ভরে এনে ধনী ইংরাজ খায়। আর আমাদের ঘরের কানাচে দুই ঝাড় কলাগাছ করে তাহা আমরা খাইতে পারি না। ইহাকে কি খাদ্যের অভাব বলে, না চেষ্টার অভাব বলে?

তোমরা নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করার উদাহরণ চারিদিক হইতে গ্রহণ কর এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মানুষ হও। আমাদের দেশে না জন্মে এমন জিনিস নাই। যাদের চাষা বল' তারা যে টুকু তৈয়ার করে দেয় তার উপর আর এক পয়সা যোগ কেউ করে না। তোমরা কেবল 'খাওয়ার খাসি।' কাঁচামাল যাহা আছে তাহা বিদেশীয়েরা লয়ে যায়। আর তাহারা উহার উপর নিজের পরিশ্রম ব্যয় করে উহার

* এক প্রকার বিরাট বীচিপূর্ণ কলা।

মূল্য বিশগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা তাই খরিদ কর, গরীব হয়ে যাও। এই ধর চামড়া। এই চামড়া এখান থেকে মুচিরা চালান দেয়, ইংলণ্ডে যায়। ঐ চামড়া সেখান থেকে লেদারে পরিণত হয়ে আসে। এক টাকার মালে আমাদের কাণ মলে ১৫৲ টাকা আদায় করে। আমরাও ত এসব পারি। আমার পায়ের এই জুতা ডাক্তার নীলরতন সরকারের ট্যানারিতে প্রস্তুত। স্যার নীলরতন, যিনি তোমাদের ইউনিভার্সিটির একজন কর্ত্তা, তিনি কেবল সুনিপুণ চিকিৎসক নন্—He is the Prince of Muchis.

মূলধন নাই—কি করে কি করি, আজকাল এরূপ একটা বুলি শুনা যায়। আমি কিন্তু ও কথা মানি না। এণ্ড্রু কার্ণেগী স্কটল্যাণ্ডের লোক—অতি দরিদ্রের সন্তান। কোনরূপে দেশে অন্নসংস্থান করিতে না পেরে ভিক্ষাদ্বারা "প্যাসেজ" সংগ্রহ করে আমেরিকায় গেলেন। 'নিউস বয়', টেলিগ্রাফিক পিয়ন প্রভৃতি হয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগলেন। ক্রমে স্বীয় প্রতিভাবলে লোহার খনির মালিক হন। তিনি কত টাকাই না রোজগার করেছেন, আর দেশের কাজে কত টাকাই না ব্যয় করেছেন। নিজে শ্রমজীবী ছিলেন—জানতেন শ্রমজীবীরা সন্ধ্যাবেলায় মদ খায়, মন্দসংশ্রব ও কুৎসিৎ আমোদে প্রমোদে মত্ত হয়। তাই অনেক টাকা ব্যয় করে "ওয়ার্কিং ম্যান্‌স্ ইনিষ্টিটিউট" স্থাপন করেন; সঙ্গে সঙ্গে কোকো, কাফি, চা, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, লাইব্রেরীতে বই পাবার সুবিধা সমস্তই তাহারা পাইতে থাকিল। ভাব দেখি কত অজস্র টাকা ব্যয় করেছেন তিনি। সমস্ত জীবন ভরে তিনি কোটী কোটী টাকা দান করে গেছেন। তিনি বল্‌তেন—"Those who die rich die condemned". স্কটলণ্ডে ৪টি ইউনিভার্সিটি আছে, উহার প্রত্যেকটিতে কার্ণেগী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বল্‌তেন স্কটলণ্ডের কোন প্রতিভাবান মেধাবী ছেলে অর্থাভাবে পড়তে পাবে না—ইহা আমার সহ্য হ'বে না।

আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাতে অনেক গরীব ছেলে পড়ে। তারা কিন্তু পরের নিতান্ত গলগ্রহ হয়ে পড়ে না। যারা গরীব তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে রেলওয়ে ষ্টেসনে মুটের কাজ, হোটেলে খানসামার কাজ, বাবুর্চ্চির কাজ করে' পয়সা রোজগার করে, আবার শীতকালে কলেজে পড়ে। সেখানে দৈহিক পরিশ্রমে জাত যায় না। শ্রমের মর্য্যাদা সেখানে পুরাপুরি। কেহ দৈহিক পরিশ্রমের জন্য টিট্‌কারী দিলে সে অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। Ill-mannered, ill-bred বলে তাকে নিষ্যাতিত হ'তে হয়। যে আজ রাস্তার মুটে সে প্রতিভাবলে কালে আমেরিকার সর্ব্বোচ্চপদ প্রেসিডেন্টের আসন দখল করতে পারে। তারা বলে পরিশ্রমই উন্নতির মূল—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি-লক্ষ্মী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।" এই পুরুষকারের আদর এক সময়ে ভারতেও ছিল। কর্ণের উত্তর তাহারই প্রতিপাদন করে। পুরুষকার দেখিয়াই পুরুষের বিচার করা কর্ত্তব্য।

বড় মানুষের ঘরে জন্মিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না, অধিকাংশই গাছগরু হয়। কলিকাতার একজন সর্ব্বপ্রধান ধনী জমিদার, অনেক উপাধিধারী, তাঁর নাম আমি কর্ব্বো

না —তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল এক শ্রাদ্ধ-বাসরে। তাঁকে অভিবাদন করে বল্লাম—"আজ শ্রাদ্ধ-বাসরে দেখা, কিন্তু আপনার শ্রাদ্ধ প্রত্যহ না করিয়া আমি জল খাই না।" তাঁর নিকট থেকে দেশের কাজে কোন সাড়াই পাই নাই; কিন্তু রাজপুরুষেরা ডাক দিলেই ৩০।৪০ হাজার টাকা দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। এই ত বড় মানুষের ছেলে। আর ঐ যে এই নদীর ওপারে আগড়ঘাটার ডাক বাঙ্গালায় বেহারা ছিল—মেহের বেহারা —তার আজন্ম সঞ্চিত অর্থ ৪ হাজার টাকা দান করে তার আয় থেকে তোমাদের পড়াচ্ছে —সমাজের হিসাবে সে ত অতি ছোট লোক! তোমরাই বল কে প্রকৃত বড়?

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁরা ওয়াশিংটন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে দেবতার মত পূজা করেন। ফ্রাঙ্কলিন অতি দরিদ্রের সন্তান। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ছাপাখানার কম্পোজিটার হ'য়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। এই অবস্থায় সন্ধ্যার পর ধার করে বই নিয়ে লেখাপড়া শিখতেন। পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে সন্ধ্যার পর বই লইতেন, সমস্ত রাত্রি পড়তেন, সকালে ফিরাইয়া দিতেন। Spectator পড়তেন আবার Reproduce করতেন, শেষে মূলের সঙ্গে মিলাইতেন। এই প্রকারে লেখার শক্তি বাড়াইতেন। শেষে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে' নিজে ছাপাখানা করেন। শুধু এই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ঘুড়ি উড়াইতে ছিলেন—বিদ্যুৎপ্রবাহ ভিজা সূতা বহিয়া মাটিতে এল। সেই অবধি তাঁহার নির্দ্দেশমত Lightning conductor-এর সৃষ্টি হ'ল। শেষে আমেরিকার যুদ্ধের সময় তিনি বৈদেশিক দূত নিযুক্ত হলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন যেমন কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে উদ্দেশ করে বলেছেন—"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে;" তেমনি যে ছাত্র পদার্থবিদ্যা পড়িতে যায় সে অগ্রে Self-taught Benjamin Frankliln-এর পদাম্বুজ বন্দনা করে।

তোমরা ছেলেমানুষ। সমস্ত দিনটা ২৪ ঘণ্টা না হয় ৮ ঘণ্টা, ঘুমাইলে। তবু ত ষোল ঘণ্টা হাতে রইল। সকালে রাত্রে পড়াশুনায় ৩ ঘণ্টা গেল। তার পর কি করবে? শুপারি নারিকেল গাছে ওঠ, "ঝাঁপাই জোড়", স্বাস্থ্যলাভ কর। বৎসরের ছয়মাস ছুটী; গ্রীষ্মের বন্ধ, হিন্দুর পর্ব্ব, মুসলমানের পর্ব্ব, খৃষ্টানের পর্ব্ব। ভাব দেখি ছুটির সময় কত 'আলসেমি' করে সময় নষ্ট কর। আমার এই বয়স—পাঁচ মিনিট কারো সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারি না।

আমি ৪ বৎসরে ৪০ হাজার মাইল বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘুরেছি। গত তিন মাসে ৮৫০০ মাইল ভ্রমণ করেছি—বম্বে থেকে পুনা, সেখান থেকে ঢাকা—কত কাজ, তবুও সময় পাই। একটু পরে ত নৌকায় বাহির হইব; নিজ হাতে দাঁড় বাইব। তোমরা যদি বল সময় পাওনা তা হ'লে মিথ্যা কথা বলা হবে। মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি করে এত কাজের সময় পান। তাঁর উত্তর:—The busiest man has the largest available time at his disposal—it is only

method, punctuality, precision. সময়ের মূল্য তোমরা বোঝ না, তাই এত সময়ের অভাব। ইংরাজের সঙ্গে দেখা করার যদি কথা থাকে তবে ঠিক সময় না গেলে আর দেখা হবে না। আমাদের নিমন্ত্রণ যদি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য হয় তবে খেতে হবে সেই সন্ধ্যায়। একজন ইংরাজ Punctual to the minute. আর আমরা পাত্রমিত্র, কোটাল, নলনীল, গয়গবাক্ষ দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত। অথচ সময় হয় না।

ইহার সহিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ও চাই। ঐ দেখ রাজপুতনার উষর মরুভূমি পার হ'য়ে, লোটা কম্বল মাত্র সম্বল করে লোক এসে তোমার সাধের বাংলা দেশ জুড়ে বসেছে, It is the Marwari conquest apart from the British conquest that has impoverished Bengal. শুধু কলিকাতার বড়বাজার কেন, আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় হাট 'বড়দল', সেখানে এক একটা রবিবারে যত টাকার কারবার হয় তাহা সমস্ত একজন মাত্র মাড়ওয়ারির মুঠোর ভিতর। তাঁর নাম মাঙ্গিলাল মাড়োয়ারি। আমাদের ভাগ্য-বিধাতা লর্ড বার্কেনহেড লিখিতেছেন:—About 55 years ago there stood behind the counters of a Lancashire grocer a young lad about whom nothing was particularly noticeable except his bright intelligent eyes. —সেই বালক স্কুলে পড়েনি, কলেজে পড়েনি, রসায়ন শাস্ত্র পড়েনি, নিজের চেষ্টায় আজ কোটীপতি। ইহার নাম William Hesketh Lever পরে Lord Leverhulme. ইহাঁর সাবানের কারখানা লিভারপুলের নিকট—ইনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবান নির্ম্মাতা—যাঁর সাবান এমন কি আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে রোজ ব্যবহৃত হয়। "সান লাইট সোপ" দেখেছ ত। ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি। ইহার বর্ত্তমান মূলধন ৪২ মিলিয়ান ষ্টার্লিং অর্থাৎ ৬৩ কোটি টাকা। ভাব দেখি কি বৃহৎ ব্যাপার!

চাকরী চাকরী করেই এদেশটা গোল্লায় গেল। বাংলার মুসলমানেরা আজ কায়েত বামুনের দাসত্বের গর্ব্ব ভাগাভাগি করার জন্য মহাব্যস্ত, অবশ্য সংখ্যা অনুসারে তাদের দাবী অন্যায় নহে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান চাষ-ব্যবসায়ী। অনেক চাষী মুসলমান লেখাপড়া শিখে চাকরীর দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের "এ্যাও" গেল, "অও" গেল —তাঁতিকুল বৈষ্টমকুল দুইই গেল। চাষ ব্যবসায় আর শরীরে সয় না। আমি বলি, মুসলমান তুমি বাংলার মুসলমান হইও না: দিল্লীওয়ালা হও, বোম্বাই-এর নাখোদা হও। কলিকাতায় দিল্লীওয়ালা মুসলমানের হাতে বড় বড় কারবার। লাখ লাখ টাকা তাদের উপায়। ফৌজদারী বালাখানায় যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা জানেন নাখোদারা কি পরিমাণ টাকার মালিক। বোম্বাই-এর একজন মুসলমান স্যর ইব্রাহিম করিমভাই—ইনি মারা গেছেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলে। তাঁর জাপানে টোকিও, কিয়াতো এবং হংকং প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়—রাশি রাশি তুলা রপ্তানি করেন। রেশম আমদানী করেন—কত কোটি টাকা তাঁর উপায়। তাঁর এক একজন ম্যানেজারের মাহিনা ৫,০০০৲ টাকা। আবার কচ্ছের মুসলমানেরা চাল রপ্তানি করেন—ব্যবসা' ছাড়া উন্নতি হয় না।

যত গ্রাজুয়েট হয় তার শত করা কয় জন চাকুরী পায়? চাকুরা চাকুরী করে ঘুরে বেড়ালে কোনো জাত উঠ্‌তে পারে না।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি—কুলীন বামুনের ছেলে। বসিরহাটের কাছে ভেবলায় তাঁর বাড়ী। অতি দরিদ্রের সন্তান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকেন কিন্তু পয়সা অভাবে বেশী দিন পড়তে পারেন না। প্রাইভেট টুইশানি করতেন—শেষে ছোট ছোট কনট্রাক্ট লইতেন—আর এখন তিনি বাংলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার। কত রেল লাইন তাঁর অধীনে। ফেলে ঝেলে ১২ মাসে ১ লক্ষ টাকা তাঁর আয়। তাঁর তাঁবেদারে ১০।১২ জন হাজার দেড়হাজার টাকা বেতনের সাহেব ভৃত্য আছে। It would have been a real misfortune for Bengal if Sir R. N. Mukerjee had come out of the Engineering College successful—এই কথা আমি নানাস্থানে বলিয়া থাকি—আজ তিনি কত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারকে চাকর রেখেছেন।

শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করলেই বিদ্যা হয় না। আকবর লেখাপড়া জানতেন না; শিবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানতেন না, রণজিৎ সিংহও নয়। মানুষ হওয়া চাই। জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়। যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ। পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা, আমার একনিষ্ঠতা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিষ্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবন-যাত্রাকে সফল করিতে হইলে নিজেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে।

আমার শেষ সময় উপস্থিত—হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাব্‌বো আমার জীবন-ব্রত সফল হ'ল The future destiny of my country is in the hands of my young children—তোমরা মানুষ হও—নিজেরা আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠ্‌বে।

## বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয়

অনেক সময় অজ্ঞতাজনিত গরিমাবশতঃ আমাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না; মানুষের ইহা একপ্রকার দুর্ব্বলতা যে সে নিজের দোষ বা ত্রুটি নিজে সহজে দেখিতে পায় না বা দেখিবার চেষ্টা করে না; এমন কি দেখিতে পাইলেও তাহা কৃত্রিম আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে সচেষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাই তাহার অবনতির একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে নিজেকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হয়, সে কখনও বড় হইতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতের অবস্থার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে এই বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, বাঙ্গালা সাহিত্য-পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের সমকক্ষ। বিষয়টি তলাইয়া দেখিলে, ইহা যে কত বড় ভ্রান্তি, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে জগতের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী লেখক সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাই বলিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডার যে ইংরাজী কিংবা ফরাসী সাহিত্য-ভাণ্ডারের ন্যায় বিপুল রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ ইহা কি কখনও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে? বাংলাদেশে প্রতিবৎসর যে সব সুপাঠ্য কাব্য ও পদ্যগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় তাহা ইংলণ্ড কিম্বা ফরাসী দেশের শতাংশেরও একাংশ কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সাধারণ পাঠকের সংখ্যাও ঐ সমস্ত দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম।

সেইরূপ পদার্থ বিজ্ঞানের বা রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চায় ও গবেষণায় আমাদের দেশে মাত্র দুই-চারিজন একনিষ্ঠ সাধকের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাই বলিয়া এই কথা বলা যায় না যে, বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য প্রদেশ-সমূহের সহিত সমান স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি ইংলণ্ডে যত লোক বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছে, এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশ লোকও বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত আছে কি না সন্দেহ! এমন কি ক্ষুদ্র জাপানের সমকক্ষ হইতেও আমাদের অনেক সাধনা করিতে হইবে। এর পর ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিজ্ঞানের তো কথাই নাই। যদি ইংলণ্ডের, জার্ম্মানির কিম্বা আমেরিকার রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্রের মুখপত্র খোলা হয়, এবং তাহার বর্ণানুক্রমিক সূচি-পত্র দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই দেখিবেন পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে ও আমেরিকায় মাত্র একমাসের মধ্যেই কত শত-শত রাসায়নিক আবিষ্কার ঘটিতেছে এবং কত শত-সহস্র বিদ্যার্থী বিভিন্ন রসায়নাগারে অক্লান্ত পরিশ্রমে, চির-নূতন উৎসাহে, অনন্যমনা হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ধ্যানী যোগীর ন্যায় নিবিষ্ট হইয়া আছেন। ইংলণ্ডের গত জানুয়ারী মাসের রাসায়নিক পরিষদের মাসিক-পত্র (Journal) খুলিয়া গণনা করিলে দেখা যাইবে তাহাতে প্রায় ৪৫০টি নূতন তথ্য আবিষ্কারের প্রবন্ধ রহিয়াছে এবং ঐ মাসে ৭৫০ জন রাসায়নিক ঐ সংখ্যায় তাঁহাদের অনুসন্ধানের খবর দিয়াছেন। ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা কোথায় পড়িয়া আছি? কবির ন্যায় দুঃখের পীড়নে শুধু বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা হইবে, "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের সুখ ও সম্ভোগে নিযুক্ত করা। ত্যাগের পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোগের ক্ষমতার অভাবে যে ত্যাগ, সে ত্যাগকে তো সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যাইতে পারে না; কিম্বা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, এই বলিয়া কথার আবরণে আমাদের

বর্ত্তমান দৈন্যের লজ্জা নিবারণ করিলেও তো কোনও ফললাভের আশা নাই। বর্ত্তমান সভ্যজগতের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদিগকেও তাহাদের মত সাধনা করিয়া শক্তি ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে. নতুবা ঐ বিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা যে অতলে ডুবিয়া যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার সময় অতীত হইয়াছে আমাদিগকে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের ন্যায় আমাদিগকেও একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে হইবে। কি বিপুল সাধনা ও শক্তি নিয়োগ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ শিল্প ও বিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে অনেক সময়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কি বিপুল উদ্যোগ ও আয়োজন পূর্ব্বক তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হইবে।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের জয়-পরাজয় শুধু সামরিক বিক্রম কৌশল ও একনিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে নাই; বরঞ্চ উহাতে বিজ্ঞানের বিশেষতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহারই বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত সংবাদ পত্রে পড়িয়া থাকিবেন, যে, জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের যাবতীয় রাসায়নিক কারখানা-সমূহে যুদ্ধের আবশ্যকীয় নানা গোলাগুলি, বারুদ ও অন্যান্য ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতে রত ছিলেন; এই কারণে মহাযুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্ম্মান সৈন্যের বিজয়িনী শক্তির মুখে যুক্ত-শক্তিকে হটিয়া আসিতে হইয়াছিল। জার্ম্মান সৈন্যেরা যে কত প্রকার বিষাক্ত বায়ু, তরল ও কঠিন পদার্থ বিপক্ষ সৈন্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা যাহারা রীতিমত যুদ্ধের বিবরণাদি পাঠ করিয়াছেন তাহাদের অবিদিত নাই। ইহার প্রতিবিধান-কল্পে যুক্ত-শক্তিরাও আপনাপন রাসায়নিক কারখানা-সমূহে ও রসায়নাগারে শত-শহস্র বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ্‌কে যুদ্ধের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে যুক্তশক্তিরা এতই উন্নতি লাভ করিয়াছেন যে, এমন কি জার্ম্মানিকেও নতজানু হইয়া তাঁহাদের নিকট অচিরে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ফলে এই নৃশংস ও বীভৎস হত্যা-কাণ্ডের বিপুল আয়োজনের মধ্য হইতে কত নব নব অত্যাশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে, এবং কি পরিমাণ অধ্যবসায়, ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে নানাবিধ যুদ্ধের সরঞ্জাম তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল তাহা কয়েকটি মাত্র উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। ইংলণ্ডে প্রতি সপ্তাহে ১৫০০ টন (এক টন=২৮ মণ Trinitrotoluene (ট্রিনিট্রো-টোলুয়েন) ৩০০ টন Picric acid (পিক্‌রিক্ এ্যাসিড) ৩০০০ টন Ammonium nitrate (এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট্) এবং ২০০০ টন Cordite (কর্ডাইট) প্রস্তুত হইত। এই সমস্ত বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য প্রতি সপ্তাহে নিম্নলিখিত দ্রব্য-সমূহের আবশ্যক হইত;

৬০০০টন Pyrites (পাইরাইট্‌স্‌) ২৭০০০ টন Sulphur (সাল্‌ফার বা গন্ধক) ৮৩০০ টন Chili Saltpetre (চিলি সল্ট্‌পিটার্‌), ৭২০ টন Toluene (টোলুয়েন, ৬০০,০০০ কয়লা হইতে প্রস্তুত) ১৬২ টন Phenol (ফেনোল ;—কার্ব্বলিক এ্যাসিড্‌ যাহা ১,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে উৎপন্ন হয়—বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত) ৭০০ টন Ammonia (এ্যামোনিয়া ; ২৫০, ০০০ টন কয়লা হইতে) ৩৭৪ টন Glycerine (গ্লীসেরিন্‌ ২৭০০ টন চর্ব্বি হইতে), ৭০০টন Cotton Cellulose (কটন সেলুলোজ্‌ ১০৬০ টন আবর্জ্জনা হইতে) এবং ১২০০ টন Alcohol ও Ether (এ্যাল্‌কহল ও ইথর ; ৪২০০ টন শস্য হইতে)।

আরও কয়েকটি বর্ত্তমানযুগের আশ্চর্য্যকর রাসায়নিক আবিষ্কারের কথা এখানে বলিব, এই-সমস্ত নূতন আবিষ্কার শিল্প-জগতে এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, যে মানুষ এখন আর পূর্ব্বের মতন প্রকৃতির উপর তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনের জন্য একান্ত নির্ভরশীল নহে। যেখানে প্রকৃতি বিরূপ, সেখানে মানুষ তাহার শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার আবশ্যকীয় কাজ জোর করিয়া আদায় করিতেছে।

রক্তমাংস গঠনের ও উদ্ভিদ্‌-দেহের একটি প্রধান সারবান উপাদান হইতেছে নাইট্রোজেন। মানুষ ও জীব-জন্তু এই নাইট্রোজেনটি উদ্ভিজ্জ-খাদ্য হইতে গ্রহণ করে, উদ্ভিদ্‌ পুনরায় ইহা প্রধানতঃ মাটী হইতে সাররূপে গ্রহণ করে। সত্য বটে নাইট্রোজেন আমাদের বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তু তাহাদের শরীর-পোষণের জন্য ইহা বায়ু হইতে সোজাসুজি বা সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদেরাও বেশীর ভাগ তাহাদের এই খাদ্য মৃত্তিকা-মিশ্রিত সার হইতে গ্রহণ করে। সোরা, সোডিয়াম্‌ নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ, এই কয়টি সারই সাধারণতঃ মৃত্তিকায় বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদের জীবন ও পরিপুষ্টি ইহাদের উপর নির্ভর করে। একই জমির উপর বারংবার কৃষিকার্য্যের দরুণ এই প্রকৃতিগত মৃত্তিকার সারের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, এই হ্রাস পরিপূরণের জন্য মাটিতে কৃত্রিম সার দেওয়ার প্রথা সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। চিল্লিদেশ জাত সোডিয়াম নাইট্রেট ও কয়লা হইতে প্রস্তুত এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ—এই দুইই বহুকাল হইতে কৃত্রিম সাররূপে সর্ব্বদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। চিল্লির সমুদ্রতীরে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই সোডিয়াম্‌ নাইট্রেটের স্তর পড়িয়া আছে। ক্রমশঃ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু ও বর্ত্তমান সভ্যযুগে বিলাস-ভোগের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য দ্রব্যের অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতরাং অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সোডিয়াম নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়া ঘটিত লবণরূপ কৃত্রিম সারের ব্যবহার ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, জমিতে রীতিমত সার দিয়া তাহার উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে চিল্লি হইতে মাত্র ৯৩৫ টন নাইট্রেট্‌ রপ্তানি হইয়াছিল, ১৯১২ সালে

২,৪৭৮,০০০ টন রপ্তানি হইয়াছে। সুতরাং চিল্লির লবণস্তরে অপর্য্যাপ্ত নাইট্রেট্ থাকিলেও উহা অসীম নহে, এবং যে হারে এই নাইট্রেটের ব্যবহার বৎসর বৎসর বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে বিশেষজ্ঞদের হিসাব-মতে আগামী ২০ কিম্বা ২৫ বৎসরের মধ্যে চিল্লিস্তর নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কয়লা হইতে উৎপন্ন এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণের পরিমাণ বড় অধিক নহে। ১৯১০ সালে পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ১,১০,০০০ টন মাত্র এ্যামোনিয়া ও এ্যামোনিয়াঘটিত লবণ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং এই সভ্যতার যুগে কয়লার ক্ষয় যেরূপ ক্রমশঃই বাড়িতেছে তাহাতে ধরিত্রীর কয়লার ভাণ্ডারও নিঃশেষ হইতে বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যদি বিশ বৎসর পরে চিল্লির লবণস্তর নিঃশেষ হইয়া যায় তবে পৃথিবীর যে সে কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সারের অভাবে খাদ্যের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, দেশে দেশে খাদ্যের অভাব ও ভীষণ সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন এবং উহার প্রতীকার সাধন কল্পে গত ২০।২৫ বৎসর হইতে তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। ইতিমধ্যেই এই অক্লান্ত পরিশ্রমের আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, আমাদের বায়ু-মণ্ডল নাইট্রোজেনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার; বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২১ ভাগ পরিমাণ অক্সিজেন আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বায়ুমণ্ডল প্রায় ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক বর্গমাইলের উপরিস্থ বায়ুতে ২০,০০০,০০০ টন নাইট্রোজেন বর্ত্তমান। বৈজ্ঞানিক-গণ তাঁহাদের অক্লান্ত ও বহু-বৎসর-ব্যাপী চেষ্টায় বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে সারে ও শিল্পে ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নাইট্রোজেনকে তাঁহারা নাইট্রিক এসিড্ ও তৎঘটিত লবণে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য ও কৃষিকার্য্যে সারের জন্য ইহাদের প্রচুর ব্যবহার হইতেছে। এই নাইট্রোজেনকে আবার তাঁহারা এ্যামোনিয়া ও তৎঘটিত লবণেও পরিণত করিয়াছেন। এ্যামোনিয়া-ঘটিত লবণ একটী প্রধান সার ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রকৃতিদেবী আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া তাহার খনির ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া দেন বা তাহা শূন্য হইয়া পড়ে তখন এই বৈজ্ঞানিকগণের কৃপায় নিরাশ্রয়ভাবে আর আমাদের ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মরিতে হইবে না।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন অবরোধের (Blockade) দরুণ চিল্লি হইতে জার্ম্মানীতে সোডিয়াম নাইট্রেটের রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল তখন জার্ম্মানগণ তাঁহাদের কারখানা সমূহে কৃত্রিম উপায়ে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে তাঁহাদের যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থসমূহের উপাদান প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রায় ৪ বৎসরের উপর জার্ম্মানগণ অবরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধ পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক এসিড্ ও তৎঘটিত লবণ এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে যে

বাজারে ঐ-সব জিনিষের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। জার্ম্মানীতে Badische Anilin und Soda Fabrik কোম্পানীর বিরাট রাসায়নিক কারখানা রহিয়াছে। নূতন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের জন্য তাহাদের বিভিন্ন কারখানায় বহুসংখ্যক বিখ্যাত রাসায়নিক অবিরাম নিযুক্ত রহিয়াছেন। এই কোম্পানী এতই ধনশালী ও তাহাদের কারখানা-সমূহ এতই প্রকাণ্ড যে তাহা অনুমান করিতেও আমরা অসমর্থ।

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে জার্ম্মানীর উন্নতির ও যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন অর্থ-বাহুল্যের মূলীভূত কারণ হইতেছে তাহার এই বিশাল রাসায়নিক কারখানা-সমূহ।

রঞ্জন-শিল্পের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী একমাত্র জার্ম্মান কারখানা-সমূহের নিকট পরিজ্ঞাত। ইহা যুদ্ধের সময়ে সকলেই অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় যখন জার্ম্মানদেশীয় দ্রব্যাদির রপ্তানি এক প্রকার বন্ধ করা হইয়াছিল তখন কাপড় রং করিবার রংএর অভাব, এমন কি লিখিবার কালীর উপাদানের অভাব পর্য্যন্ত সকলকেই অনুভব করিতে হইয়াছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, বর্ত্তমান সভ্যজগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সমকক্ষ হইতে হইলে, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনা করিয়া যাবতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন ভিন্ন অন্য পথ নাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চাই জাতিগঠনের এক প্রধান উপাদান, যতদিন পর্য্যন্ত এই পথে আমরা বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে না পারিব, ততদিন আমাদের জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার জন্মিবে না।

সত্য বটে, বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মানুষ পরস্পরের ধ্বংসের জন্য নানাবিধ নূতন নূতন শক্তিশালী উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। গত ইউরোপীয় মহাসমরে বিমান-পোত (উড়ো-জাহাজ) ও বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির ব্যবহারেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিকগণ এই সমস্ত বিষাক্ত বায়ু প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর অনুসন্ধানের ফলে Lewsite (লিউসাইট) নামক এমন একটি বিষাক্ত বায়ুর আবিষ্কার করিয়াছেন যে তাহা যদি উপর হইতে উড়ো-জাহাজের সাহায্যে নিম্নে পৃথিবীর লোকের উপর বর্ষণ করা হয় তাহা হইলে বড় বড় সহরগুলিকে তাহাদের যাবতীয় অধি-বাসী সহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভাবিলে সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের এই সংহার-শক্তিকে মানুষের ধ্বংসে নিযুক্ত না করিয়া বিশেষ হিতকর কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেমন ডিনামাইটের সাহায্যে লোক ধ্বংস না করিয়া পাহাড়-পর্ব্বত ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া মানুষের গতিবিধির জন্য রাস্তা ও রেল-লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে।

ক্লোরোফরম্ নামক পদার্থটি বেদনাহীন অস্ত্র-প্রয়োগের জন্য চিকিৎসা-কার্য্যে যে কিপ্রকার ব্যবহৃত হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অনেকদিনের আগেকার কথা মনে পড়ে যখন আমাদেরই এই মেডিকেল কলেজে ইঙ্গিতমাত্রেই যমদূতের মত কয়জন ডোম, রোগীকে জোর-জবরদস্তি করিয়া চাপিয়া ধরিত এবং ডাক্তার তাঁহার শানিত

করাত দিয়া হাত কাটিয়া অঙ্গচ্ছেদ করিতেন, রোগী তখন অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিত। বর্ত্তমানে ক্লোরোফরমের কৃপায় যে কোন কঠোর ও নিদারুণ অস্ত্রচিকিৎসা বিনা কষ্টে ও সহজে সম্পাদিত হইতেছে। রোগী এমন অচৈতন্য হইয়া থাকে যে সে জানিতেও পারে না, যে, কখন তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। চোখের অস্ত্র-চিকিৎসায় ও দাঁত উৎপাটন ব্যাপারে "কোকেন" নামক জিনিষটিও সেইরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এখানে আরও কয়েকটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত রোগের ঔষধ উল্লেখযোগ্য মনে করি। ইহাদের আবিষ্কারে মানবজাতির যে কি পরিমাণ কষ্টের লাঘব হইয়াছে ও মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে তাহা সকলেই অল্প-বিস্তার অবগত আছেন। "স্যাল্ভার্সন্" নামক অব্যর্থ ঔষধটির বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা injection বা সূচীবিদ্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করান হয়; ইহা যে কত দুঃখের দুর্ব্বহ জীবনকে শান্তিময় করিয়াছে তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইহা ব্যতীত ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন্, ডিপথেরিয়ায় এন্টী-ডিপথেরিক্ সারাম্, আমাশয়ে এমেটীন্ ইত্যাদি আরও অনেক মহৌষধের নাম করা যাইতে পারে, যাহার আবিষ্কারে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ ও হিতসাধন হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে অস্ত্রচিকিৎসার দ্রুত ও অদ্ভুত উন্নতিও বিজ্ঞানের কল্যাণশক্তির একটি প্রধান উদাহরণ। কত অন্ধ ব্যক্তি চোখের (ক্যেটারাক্ট অপারেশনের) ছানি কাটাইবার পর পুনরায় কার্য্যকরী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে। তদুপরি বর্ত্তমানে যে কারণেই হউক বালক যুবক ও বৃদ্ধ সবাই ক্ষীণদৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছেন, চশ্‌মার অভাবে তাঁহাদের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, অন্ততঃ শতকরা ৩০জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হইত!

অন্যদিকে এই বিজ্ঞানের চর্চ্চাই আবার মানুষকে তাহার নানাবিধ সুখসম্ভোগের সামগ্রী জোগাইতেছে। কয়লা হইতে সঞ্জাত আল্‌কাতরা নামক কালো দুর্গন্ধ পদার্থটি হইতে এমন-সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে, যাহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের রং, নানাবিধ মহৌষধ, ফুল ও ফলের কৃত্রিম গন্ধ ও বহুবিধ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে। এই-সমস্ত জিনিষ জগতের বাজারে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়নের বিজয়-বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। নানাবিধ বিষাক্ত জিনিষ চিকিৎসা-কার্য্যে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রধান ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তবে মানুষ যখন সুবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে তখন ভাল জিনিষেরও প্রায় অপব্যবহার ঘটিয়া থাকে।

আরও-একটি বিষয় এখানে বলা আবশ্যক মনে করি। অনেক বিবেচক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ওয়াশিংটনে যতই বড় বড় শক্তিপুঞ্জের দরবার বসুক না কেন, প্যারিস্ লণ্ডন কিম্বা ভিনিসে যতই লীগ্ অব্ নেশন্‌সের অধিবেশন হউক না কেন, যুদ্ধ ব্যাপারটি পৃথিবী হইতে কিছুতেই লোপ পাইবার নহে। হইতে পারে, বর্ত্তমান গোলাগুলি, দুর্গ ও বড় বড় জাহাজের সংখ্যা, যাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, প্রত্যেক জাতির মধ্যে কমিয়া যাইবে; কিন্তু

তাহার পরিবর্ত্তে যে আরও অধিক শক্তিশালী নূতন যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে বা সময়মত প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, যুদ্ধ-লোপের এই যে আয়োজন আড়ম্বর ইহা শুধু ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুদ্ধের এই নূতন সরঞ্জামের মধ্যে বিষাক্ত বায়ু ও তরল পদার্থ একটি প্রধান জিনিস। বর্ত্তমানে আমেরিকায় এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা চলিতেছে। তাহাদের প্রস্তুত লিউসাইট বায়ু যে কিরূপ শক্তিশালী তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। গত যুদ্ধের প্রথমভাগে আমেরিকায় কোন বিষাক্ত রাসায়নিক যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা বা আয়োজন ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার অতি অল্প দিনের মধ্যে যাবতীয় আমেরিকান্ রাসায়নিকগণকে ( প্রায় সংখ্যায় ১১০০ ) দলবদ্ধ করিয়া বিষাক্ত বায়ু প্রস্তুতের জন্য আয়োজন করা হয়। কিরূপ দ্রুতভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার বিররণ পাঠ করিলে মনে হয় যে, এই অদ্ভুত কার্য্য-কুশলতাই এই জাতির জয়লাভের কারণ, এবং এখনও এই বিষয়ে তাঁহারা যে নূতন নূতন গবেষণা করিতেছেন লিউসাইটের আবিষ্কারই তাহার প্রধান প্রমাণ। ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনের ভার ও জাতির ভাগ্য-নির্ণয় যে একমাত্র রাসায়নিকগণের হাতেই ন্যস্ত হইবে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষভাবে চর্চ্চা করা শুধু জাতীয় ধনবৃদ্ধির হিসাবে যে একমাত্র প্রয়োজন তাহা নহে, জাতীর অস্তিত্ব-সংরক্ষণেও ইহা প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে রসায়ন-বিদ্যার চর্চ্চা এখনও পর্য্যন্ত বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই, এবং গভর্ণমেণ্টও দেশের রক্ষার জন্য রসায়নশাস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রচলিত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এমন কি যে কয়েকটি যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতের রাসায়নিক কারখানা ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেও ভারতবাসীর প্রবেশের দ্বার প্রায় একপ্রকার রুদ্ধ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা হইলে ভবিষ্যতে রাসায়নিকগণের সাহায্যই যে প্রধান অবলম্বন হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনেকের মতে আবার এই বিষাক্ত বায়ুরূপ রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে হতাহতের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, সুতরাং যুদ্ধের নৃশংসতা ও বিভীষিকাও কমিয়া যাইবে; কারণ বিষাক্ত বায়ুর সাহায্যে বিপক্ষীয় সৈনিকদলকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত ও জ্ঞানহীন করিয়া রাখা যাইবে মাত্র, তাহাতে তাহাদের কোন স্থায়ী অঙ্গহানি বা প্রাণহানির সম্ভাবনা কম। ইহা অমানুষিক হইলেও বর্ত্তমান গোলাগুলিরূপ পাশবিক প্রথা হইতে শ্রেয়তর হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতিসংগঠন কার্য্যে কিছুতেই ফললাভ করিতে পারিব না। চারিদিকের শক্তি-মূলক সভ্যতার জাগরণের মধ্যে আমরা কি নিষ্ক্রিয় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব—না ঐ শক্তির কঠোর পেষণে লুপ্ত হইয়া যাইব? শক্তিহীন দুর্ব্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। আজ যদি ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া

জগতের নিকট পরিচিত হইতে পরিত, তাহা হইলে আজ এই হীনতার দৈন্য তাহাকে বহন করিতে হইত না। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতি তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয় সম্মিলনে সসম্মানে আহ্বান করিত।

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩২৯

## অস্পৃশ্যতা ও জাতি-গঠনের অন্তরায় *

শ্রমবিমুখতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। কোন কাজ করিব না, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব বা আরাম-চেয়ারে শুইয়া কেবল অন্যের সমালোচনা করিব; অথচ দেশকে অগ্রসর করাইব! আমরা আজকাল 'বাঙ্গালী জাতি' বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু জাতি-গঠনের জন্য যে কত মালমসলা ও উপকরণ দরকার তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ বক্ষে ধারণ করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক্। বাঙ্গালার লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। যিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহাদের ধমনীতে হিন্দু-রক্ত প্রবাহিত। কেবল আমাদের অনুদারতা ও অস্পৃশ্যতারূপ পাপের ফলে আজ ইহাদিগকে আমরা হিন্দুসমাজ হইতে হারাইয়াছি। আড়াই শত—তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মুসলমান বীরগণ তাঁহাদের জয়-পতাকা তুলিয়া 'মানবের ভ্রাতৃত্ব ও একত্ব' ঘোষণা করিয়াছিলেন; তখন ঝাঁকে ঝাঁকে তথাকথিত 'নিম্নবর্ণের' হিন্দুগণ ইস্‌লামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখনও তাহার অবশেষ পল্লীসমাজে দেখা যায়। যে হিন্দু-নাপিত কায়স্থ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতিকে ক্ষৌরি করে, সে নমঃশূদ্রকে কি ভূঁইমালীকে ক্ষৌরি করিতে চায় না; অথচ মুসলমানকে অনায়াসে ক্ষৌরি করে। ইহার কারণ মুসলমান রাজত্বের সময়, কোন মুসলমান কাজীর কাছে গিয়া নাপিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, তখনই তাহার সমুচিত শাস্তি হইত। আমরা পরাধীন জাতি—চিরকাল শক্তের ভক্ত। আজও আমরা নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী—যাহারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ, বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ,—তাহাদিগকেই অনা-চরণীয় করিয়া রাখিয়াছি এবং কর্ত্তৃপক্ষ-দিগকে ভেদনীতি অবলম্বনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি। আজ তাঁহারা আমাদের উপর খড়্গহস্ত। কেনই বা হইবেন না? ব্রিটিশ উপনিবেশে আমরা ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে সাম্যনীতির দাবী করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভাই-দের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করি।

মাদ্রাজে পারিয়া, পঞ্চমা ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের প্রতি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে যে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তায় চলিতে হইলে, উচ্চজাতি হইতে কে কতটা দূরে চলিবে, তাহা মাপা-জোঁকা আছে। অনেক 'নিম্নবর্ণ' রাস্তায় চীৎকার করিতে করিতে বলে—'অধম যাইতেছে, আপনারা সরিয়া যান'। ভয়, পাছে কোন উচ্চজাতি

* "বিকাশ"—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিয়া অপবিত্র ও নরকগামী হয়। আবার যদি কোন উচ্চ-জাতির ভোজনকালে কোন নিম্নবর্ণের লোক দূর হইতেও দেখে, তবে খাদ্যদ্রব্য দৃষ্টিদোষে দূষিত হয়, এবং উহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

যখন আমরা আমাদের স্বজাতি ও স্বধর্ম্মী লোককে শৃগাল-কুক্কুর অপেক্ষাও অধম জ্ঞান করি, তখন কোন্ মুখে আমরা জাতীয়তার দাবী করি—বুঝিতে পারি না। এই পাপের ফলে আমরা কি জাতীয়তার দাবী করিবার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হই নাই ?

বিশেষতঃ আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী। যখন দেশের ভাবী আশা-ভরসা শিক্ষা-ভিমানী যুবকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহারা হয়তঃ গড়গড় করিয়া 'মিলের' স্বাধীনতা-বাদ ও 'কোমতের' মানবধর্ম্মবাদ আওড়ান, কিন্তু যখন বলি—"তুমি দক্ষিণ রাঢ়ী ফুলের মেল, বারেন্দ্রর কন্যাকে বিবাহ কর।" তখনই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলেন—"মশায়! আপনার কথা শুনিয়া কি জাত খোয়াইব ?" কাজের বেলায় তাঁহার যত সৎসাহস ও নৈতিক বল সব কর্পূরের মত উবিয়া যায়।

ফল কথা, চরিত্রগত দুর্ব্বলতাই হিন্দু-জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ।

আমাদের অনুদারতার ফলে মাদ্রাজের পঞ্চমা, পারিয়া প্রভৃতি এবং বাঙ্গালার-সাঁওতাল, নমঃশূদ্রাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণ, এখনও দলে দলে সাম্যবাদী মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। কেনই বা করিবে না ? একজন পারিয়া বা পঞ্চমাকে দেখিলে হয়তঃ একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ঘৃণায় সাত হাত দূর দিয়া যান, কিন্তু সেই যখন খৃষ্টান হইয়া হ্যাটকোট পরে, তখন ঐ ব্রাহ্মণই যাইয়া আগে তাহার হ্যাণ্ড-সেক্ করে এবং চেয়ারে বসাইয়া অভ্যর্থনা করে।

অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দ আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সমাজের নিয়ম যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ দেবপূজা করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিক অথবা অন্য কোন জল-অনাচরণীয় জাতির দেবপূজা করে, তবে তাহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। 'বর্ণের ব্রাহ্মণ' হেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয়। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে ? ইহার অর্থ কি ইহাই নয় যে, নিম্নজাতিকে আমরা দেবপূজার অধিকার হইতে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি ?

আমি একথা বলি না যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে নির্ব্বিচারে বিবাহের আদান-প্রদান এখনই আরম্ভ হউক। কিন্তু হিন্দুসমাজের কোন জাতিকেই অপাঙ্‌ক্তেয় ও জল-অনাচরণীয় করিয়া রাখা উচিত নয়। তোমরা যে আর্য্য-শোণিতের গর্ব্ব কর—কতটুকু আর্য্য-শোণিত তোমাদের দেহে আছে, বলিতে পার ? যদি এক ডজন নমঃশূদ্রের ছেলে ও এক ডজন ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছেলেকে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে আকারে, ইঙ্গিতে ও অবয়বসৌষ্টবে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য পরি-লক্ষিত

হয় কি? কোন আর্য্য কখনও বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন কিনা জানি না। আসিয়া থাকিলেও এই শত শত বৎসর ধরিয়া রক্ত-মিশ্রণের ফলে, বাঙ্গালীর ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত অণুবীক্ষণ দিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অতএব 'আর্য্য-অনার্য্য' এই সব বৃথা গর্ব্বমূলক ভাব ত্যাগ করিয়া উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সকলে মিলিয়া এক বাঙ্গালী জাতি গঠিত হউক; তবেই জাতির কল্যাণ হইবে।

## প্রবাসী বাঙ্গালীর পত্র

### ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চা

#### রয়াল ইনষ্টিটিউশন (The Royal Institution) এর উৎপত্তি ও কার্য্যকারিতা

সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে এখানে আসিয়া পৌঁছি। তখন এখানে গ্রীষ্মের ছুটি; বৈজ্ঞানিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—কেহ সমুদ্রবক্ষে, কেহ বা আলস্ পর্ব্বতোপরি, আবার কেহ বা আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেমিক্যাল সোসাইটীর (রাসায়নিক সভার) পুস্তকাগার খোলা ছিল। এই স্থানে রসায়ন শাস্ত্রবিষয়ক নানা ভাষায় লিখিত বহুমূল্য গ্রন্থনিচয় সংগৃহীত আছে। বিশেষতঃ এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আছে, যাহা কলিকাতায় পাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং চাতকের ন্যায় তৃষ্ণানিবারণ করিতে লাগিলাম, এবং হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক উপকরণ সংকলন করিতে সক্ষম হইলাম। এই প্রকারে এক মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু আমি চঞ্চল চিত্ত হইয়া পড়িলাম। যাঁহারা সর্ব্বদা রাসায়নিক গবেষণা গৃহে (Laboratory) কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর। বিশেষতঃ এই শীত প্রধান দেশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লণ্ডনে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ইঁহার খোঁজ করি; কিন্তু তখন ইনি ফ্রান্সে ছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে রয়্যাল ইনষ্টিটিউশন্ (The Royal Institution) দেখাইবার নিমিত্ত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। বলাবাহুল্য বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন ও তত্রস্থ উপাসক ও পুরোহিতদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও চিন্তাবিনিময় করিবার জন্য আমি ইউরোপে আসিয়াছি। বলিতে কি, রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের বাহ্য ও আভ্যান্তরিক দৃশ্য দেখিয়া প্রথমতঃ আমার মনে বড় একটা সম্ভ্রমের উদয় হইল না। আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ ইহা অপেক্ষা বিশাল এবং মনের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু শীঘ্রই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি তীর্থযাত্রী—যখন আমার পাণ্ডা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একে একে সমস্ত দেখাইয়া বলিলেন—এই দেখুন কাঁচের আধারের (glass case) মধ্যে যত্নে সংরক্ষিত যে সমস্ত যন্ত্র রহিয়াছে, তদ্দারা ডেভী ও ফ্যারাডে অনেকগুলি যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন ইত্যাদি, তখন আর ভক্ত প্রকৃতিস্থ

থাকিতে পারিলেন না। ভাবে গদ গদ হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক যখন তীর্থযাত্রী শ্রীক্ষেত্রে গিয়া জগন্নাথের দর্শন লাভ করেন, তখন কি মূর্ত্তি কদাকার বলিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিন্দা করিতে বসেন? না, ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে থাকেন? বিখ্যাত রাসায়নিক ডাক্তার থর্প ( Thorpe ) যথার্থই বলিয়াছেন:—

"রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের রসায়নাগার চিরদিন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পবিত্র ভূমি বলিয়া গণিত হইবে। এখানেই ডেভী সেই সকল আবিষ্ক্রিয়া করেন, যদ্দ্বারা জড় বিজ্ঞানে যুগান্তর সংঘটিত হইয়াছে। রসায়নের ভক্তেরা রয়াল ইনষ্টিটিউশন অপেক্ষা সুরম্য ও সুসজ্জিত বিজ্ঞান মন্দিরে আজ কাল নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু মুসলমানের পক্ষে মক্কাধামের 'কাবা' যেরূপ, রাসায়নিকের পক্ষে এই স্থানটিও তদ্রূপ। ডেভী ও ফ্যারাডের প্রতিজ্ঞা ও কার্য্য পরম্পরা দ্বারা পবিত্রীকৃত এই গৃহে আসিয়া যে বিদ্যার্থীর উৎসাহ বাড়িবে না, বা অনুরাগ প্রগাঢ়তর হইবে না, তিনি সত্যই কৃপার পাত্র।

আপনার পাঠক পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য এই রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের উৎপত্তির বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। গরীব লোকদের উপকারের জন্য ইহা স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কাউণ্ট রম্‌ফোর্ড ইহা স্থাপন করেন। তিনি ১৭৯৯ সালের প্রথমাংশে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার নাম "Proposals for forming by subscription in the metropolis of the British Empire, a Public Institution for diffusing the knowledge and facilitating the general introduction of useful mechanical inventions and improvements and for teaching by courses of philosophical lectures and experiments, the application of Science to the common purposes of life." ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগসাধন, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের সহযোগিতায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতিসাধন এবং জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি রম্‌ফোর্ডের উদ্দেশ্যে ছিল। প্রস্তাবিকাতে সভার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত আছে:—"The speedy and general diffusion of the knowledge of all new and useful improvement and teaching the application of scientific discoveries to the improvement of arts and manufactures in this country, and to the increase of domestic comfort and convalescence."

১৮০২ খৃষ্টাব্দে রম্‌ফোর্ডের সহিত এই সভার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর হইতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া সকল কিরূপে মনুষ্যের ধনবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধির সহায় হইবে, মনুষ্যের কাজে লাগিবে, রয়াল ইনষ্টিটিউশন্ সে চিন্তা আর করে না। এখন খাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তার ইহার কার্য্য। ডাক্তার গার্ণেট ইহার প্রথম অধ্যাপক বা আচার্য্য নিযুক্ত হন। তাঁহার পর ডেভী এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে,

যখন কোন দেশে বা যুগে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তখন মঙ্গলময় বিধাতা যেন তাঁহার বিধান সংসিদ্ধ করিবার জন্য এক একজন মহাপুরুষকে আনিয়া উপস্থিত করেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে, ধর্ম্মজগতে, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গীতাকারোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বচন সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশে প্রযোজ্য। অবশ্য কথাগুলি বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝিয়া লইতে হয়। নতুবা ধর্ম্মের, শিল্পের, সাহিত্যের, বিজ্ঞানের নানাবিভাগে যুগ প্রবর্ত্তকগণের প্রত্যেককেই অবতার বলিতে হয়। তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যখন যেমন লোকের প্রয়োজন হয়, তখন সেইরূপ লোকেরই আবির্ভাব হয়। রয়াল ইনষ্টিটিউশন ত এইরূপে স্থাপিত হইল। ডাক্তার গার্ণেটের পর উপযুক্ত একজন রাসায়নিকের বিশেষ প্রয়োজন হইল। এমন সময় বিধাতা যেন ডেভীকে হাতে করিয়া আনিয়া বলিলেন—"এই লও"। বাস্তবিক যাহারা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চায়, ঈশ্বর তাহাদের সহায় হন। এখন ভারতে স্বর্গীয় টাটার প্রস্তাবিত গবেষণা মহাবিদ্যালয়ের মত একটি বিজ্ঞান মন্দিরের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা স্থাপিত হইবার পরেও হয়তঃ ইহাকে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, কাজ করিবার জন্য, সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু যথাকালে যে ইহার উপযুক্ত একজন চালকের আবির্ভাব হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে রম্‌ফোর্ডের ঐকান্তিক যত্নে এই পীঠস্থান স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও প্রতিভার যশোভাগী ডেভী। তিনি দরিদ্রের সন্তান; বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে। এক ডাক্তারখানায় তিনি এপ্রেন্টিস্ নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়কার ডাক্তারখানা, আর এখনকার ঔষধালয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ সময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা ( experiment ) দেন নাই। এমন কি, রাসায়নিক যন্ত্র সকলের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। তাঁহার যন্ত্রের মধ্যে ছিল শিশি, মদের গেলাস, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল এবং কখন কখন ধাতু গলাইবার মাটির মূচি। আমাদের দেশে যুবকগণ অনেক সময় কেবল গবর্ণমেন্টের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন—রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে হইলে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই, অজস্র টাকা চাই।—আমি ইহার উত্তরে ক্রমান্বয়ে ডেভী, ফ্যারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা হইতে দেখ—যে ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়—Where there is a will, there is a way.

যত কিছু বড় বড় আবিষ্কার, তাহা অনেক সময় ক্ষেপা বা মাথা পাগলা লোকের খেয়াল হইতে উদ্ভূত। যখন মহামতি প্রীষ্টলী, লাভোয়াসিয়ে প্রভৃতি দেখাইলেন যে, সচরাচর যাহাকে দাহ ( combustion ) ও শ্বাসগ্রহণ ( respiration ) বলে, তাহাতে বায়ুর উপকরণ অম্লজানেরই ( oxygen ) কাজ বেশী, এবং সেই সময়ে ক্যাভেণ্ডিস্ প্রমাণ করিলেন যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়—উদ্‌জান ও অম্লজান নামক দুই বিভিন্ন বায়ুর (gas)রাসায়নিক সংযোগে

এই যৌগিক (compound) পদার্থ উৎপন্ন। তখন এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই সময়ের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ও গ্রীক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত বা মৌলিক পদার্থের সমবায়ে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। হিন্দুগণ মৃত্যুকে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বলেন। ইহার মূলে এই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে—অর্থাৎ মানুষ যখন মরে, তখন তাহার শরীরের উপাদানগুলি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। কিন্তু যখন ক্যাভেণ্ডিস্ দেখাইলেন যে, 'অপ্' (জল) ভূত বা মৌলিক পদার্থ নয়। তখন বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। দিন দিন নূতন নূতন বায়ুর ( gas ) আবিষ্কার হইতে লাগিল; যথা—যবক্ষারজান, ক্লোরিন ইত্যাদি।

পূর্ব্বে 'ক্ষেপা' লোকের কথা বলিয়াছি। ডাক্তার বেডোজ্ ( Beddoes ) এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার এক খেয়াল হইল যে, যখন উদ্ভিজ্জ ও খনিজ নানাবিধ কঠিন ও তরল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগের আরোগ্য হয়, তখন এইসকল নব আবিষ্কৃত বায়ু সেবন করাইতে পারিলেও তদ্রূপ ফললাভ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ( Pneumatic Institution ) অর্থাৎ বায়বীয় হাঁসপাতাল স্থাপন করিলেন। অনেক রোগীও এই হুজুকে পড়িয়া এখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। রাসায়নিক পরীক্ষা-কার্য্যে দক্ষতার জন্য ডেভী ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে যবক্ষারজান ( Nitrogen ) ও অম্লজান সংযোগে প্রস্তুত ( Nitrous acid ) এক বায়ু আবিষ্কৃত হয়। ডেভী পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, এই বায়ু সেবন করিলে যে কেবল জীবনধারণ করা যায়, তাহা নয়। ইহাতে নাড়ী দ্রুততর হয়, মানুষকে ক্ষিপ্তের মত নাচায় এবং চিত্ত প্রফুল্ল রাখে। ইহার নাম সেই সময় হইতে হাসিবার ( laughing ), ঠিক বলিতে গেলে ( laughter-causing gas ) অর্থাৎ হাস্যোৎপাদক বায়ু হইল। চারিদিকে এক 'হৈ চৈ' পড়িয়া গেল। মদিরা ( a liquid ), আফিং ( a solid ) সেবন করিলে মনে কত রকম ভাবের উদয় হয়; দুঃখের বিষয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম! পাঠকগণ ডিকুইন্‌সি বা কমলাকান্তের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন!

ডেভীর খ্যাতি তাঁহাকে রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের সংশ্রবে আনয়ন করিল। সে সময় তিনি তরুণ বয়স্ক যুবক মাত্র। তাঁহার বয়স তখন তেইশ পূর্ণ হয় নাই। রমফোর্ড প্রথমতঃ চেহারা দেখিয়া ভাবিলেন, এ ছেলেমানুষ আবার লেক্‌চার দিবে কি? এইজন্য রমফোর্ড তাঁহাকে প্রথমে এক ক্ষুদ্র সহরে বক্তৃতা দেওয়াইয়া তাঁহার ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইয়া পরে তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দেন।

কিছুদিনের মধ্যে ডেভী রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এই সভা লণ্ডনের ধনী ও সৌখিন লোকদের চাঁদা দ্বারা চলে। ডেভীর অপূর্ব্ব কবিত্ব ও বাগ্মিতার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল; এবং ইঁহার প্রতি লোকের অনুরাগ প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। ডেভীও সর্ব্বত্র ধনী ও বিলাসীদের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। দিনে

বিজ্ঞানানুশীলন ও রাত্রিতে সামাজিক আমোদ প্রমোদে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সৌখিন লোকদের বাড়ীতে খাইতে যাইবার সময় তাড়াতাড়ি ময়লা কামিজ ও মোজা খুলিতে ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহারই উপর আবার পরিষ্কার কামিজ ও মোজা পরিতেন। এইরূপে তিনি কখন কখন পাঁচটি কামিজ ও পাঁচ জোড়া মোজা পরিয়া অজ্ঞাতসারে সং সাজিতেন। এই রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার কিছু পরেই ডেভী কয়েকটী নূতন আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে নবযুগের আবির্ভাব হইল, এবং তাঁহার যশঃসৌরভও দিকদিগন্তে পরিব্যপ্ত হইল। এই বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও অন্যান্য পার্থিব পদার্থের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক গূঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুরা বলেন—এই নশ্বর দেহ ভস্ম হইয়া গেলে দেহের যে অংশটুকু বায়ু ( মরুৎ ) হইতে উৎপন্ন, তাহা বায়ুসাৎ হয়; যাহা জল হইতে উদ্ভূত, তাহা জলে পুনরায় মিশিয়া-যায়; যাহা মৃত্তিকা ( ক্ষিতি ) হইতে গঠিত, তাহা মাটি হইয়া যায় ইত্যাদি। ক্যাভেণ্ডিস্ ও ল্যাভোয়াসিয়ের সময় পর্য্যন্ত মোটামুটি বলিতে গেলে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। সাদৃশ্যমূলক অনুমান হইতে প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে, যেমন দেহ ভস্মীভূত হইলে কেবল মৃত্তিকার ভাগ ( যথা অস্থিভস্ম ইত্যাদি ) পড়িয়া থাকে, আর সমস্ত উপকরণ অন্যান্য ভূতের সহিত মিশিয়া যায়, তেমন শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম হইলেও ঐ প্রকার হয়; অর্থাৎ কেবল ভস্ম ( ছাই ) অবশিষ্ট থাকে। তেমনি, প্রধান পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন ধাতুও পঞ্চভূতাত্মক।* সুতরাং লৌহ, তাম্র প্রভৃতি অগ্নিদগ্ধ করিলে অপরাপর উপাদান ( বায়ু, জল ইত্যাদি ) চলিয়া যায়, কেবল মৃত্তিকার অংশ পড়িয়া থাকে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রোক্ত এই সমস্ত ধাতুভস্ম এখনও ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাছপালা পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে ( বৃক্ষক্ষার ), তাহাও মাটির সামিল গণ্য হয়। অতি পুরাকাল হইতেই এই গাছপালার ছাই ( বিশেষতঃ কলার 'বাসনার' ) কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার ক্ষার আমাদের দেশে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা সাজিমাটি নামে পরিচিত। চরক ও সুশ্রুতে এই দুই ক্ষারের উল্লেখ আছে—যথা বৃক্ষক্ষার, প্রধানতঃ যবক্ষার (literally the ash obtained by burning the spikes of barley ) ও সর্জ্জিকাক্ষার। সস্তা বিলাতী সাবানের উৎপাতে কলার বাসনার ছাই এখন আর কাপড় সাফ করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু যাঁহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, এবং ৪০।৫০ বৎসর বয়স্ক, তাঁহারা স্মরণ করিতে পারেন দরিদ্র লোক এই 'সাবানই' ব্যবহার করিত এবং এই ক্ষারকে একটু 'তীব্র' করিবার জন্য ইহার জলের সহিত একটু

* যথা—পারদ সম্বন্ধে রসার্ণব বলেন "পঞ্চভূতাত্মকঃ সূতঃ"—XII. 50. Vide "Hindu chemistry" Sanskrit Text. Page 10.

চূণ মিশাইত।* প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ জানিতেন যে, যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষার বিভিন্ন। কিন্তু ইয়োরোপে গ্রীক দার্শনিকগণ এই দুয়ের প্রভেদ বড় একটা বুঝিতেন না; গোলমাল করিয়া ফেলিতেন। ডেভী স্বয়ং বলিতেছেন—"The ancients do not seem to have distinguished between the two alkalis"। তাঁহার সময় অবধি ধারণা ছিল যে, পূর্ব্বোক্ত এই দুই ক্ষারাত্মক মৃত্তিকা (Alkaline earths) ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ মাত্র (Elements)। ক্যাভেণ্ডিস্ প্রথমতঃ দেখান যে, অম্লজান ও উদ্‌জান মিশাইয়া তাহার মধ্যে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চালাইবামাত্র ভয়ানক আওয়াজ হয়—যেন তোপধ্বনি। আর এই দুই বায়ুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, জল আর ভৌতিক বা মৌলিক পদার্থ নহে। এই প্রকার দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ সংযোগে যৌগিক (Compound) পদার্থে প্রস্তুত করণকে সংশ্লেষণ (Synthesis) কহে। ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার প্রায় ১৫ বৎসর পরে (১৮০০ খৃঃ অঃ) কার্লাইল এবং নিকলসন্ নামক দুই বৈজ্ঞানিক জলের ভিতর তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া অম্লজান ও উদ্‌জান নামক বায়ুকে পৃথক করিয়া ফেলিলেন। ইহাকে বিশ্লেষণ (Analysis) কহে। ১৮০৭ খৃঃ অব্দে ডেভী এই প্রকারে 'তীব্র' ও 'তীক্ষ্ণ' যবক্ষার ও সর্জ্জিকাক্ষারের ভিতর এই তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া দেখাইলেন যে, ইহাদের প্রত্যেকে মৌলিক না হইয়া অম্লজান, উদ্‌জান ও দুই নব ধাতুর সংযোগে গঠিত। এই দুই ধাতু রৌপ্যের ন্যায় সাদা ও চক্‌চকে—নাম পোটাসিয়ম্ ও সোডিয়ম্। ডেভী যখন প্রথমে এই দুই ধাতু পৃথক করিলেন, তখন তিনি এই অদ্ভুত আবিষ্কারে 'মাতোয়ারা' হইয়া হর্ষে গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তবে আবার গবেষণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রসায়নশাস্ত্রে নবযুগের আবির্ভাব হইল। ডেভী কর্ত্তৃক পোটাসিয়ম্ ও সোডিয়ম্ আবিষ্কারের পর আরও অনেক 'ভূত' আবিষ্কৃত হইতে লাগিল—আজকাল প্রায় ৭০টি ভৌতিক পদার্থ জানা গিয়াছে।

ডেভীর যশঃসৌরভ দিক্ দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। দরিদ্র সন্তান ডেভীর মাথা ঘুরিয়া গেল। ধনী ও বিলাসী সমাজে তাঁহার আদর আমন্ত্রণাদির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে, তাঁহার অনেক শক্তিক্ষয় হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে আর্য্যঋষিগণের আদর্শ ই অনুকরণীয়। চাল চলন সাদাসিদে ও তপস্বীর মত হইবে, এবং মন উচ্চচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

ডেভীর সহিত ফ্যারাডের মিলনকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা যাইতে পারে। ফ্যারাডে এক দপ্তরীর দোকানে শিক্ষানবিশ ছিলেন। তাঁহার মনিবের মিষ্টার ড্যান্স্ (Dance) নামক এক খরিদদার ছিলেন। তিনি বালক ফ্যারাডের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে ডেভীর শেষ চারিটি বক্তৃতা শুনিবার জন্য একখানি টিকিট দিয়াছিলেন। ফ্যারাডে

* হিন্দুরসায়নের ইতিহাস ১৬ হইতে ২২ পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন।

কেবল যে বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন তাহা নয়; সমস্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম যন্ত্রাদির চিত্রসহ একটি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলেন। এই খাতাটি ৩৮৬ পৃষ্ঠা পরিমিত, ফ্যারাডের নিজের হাতে বাঁধা। ইহা ভক্তিসহকারে রয়্যাল ইনিষ্টিটিউশনে সংরক্ষিত আছে। যত সামান্যই হউক না কেন, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক কাজে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছায় ফ্যারাডে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি সার জোসেফ ব্যাঙ্কসের নিকট একটি দরখাস্ত করেন। ব্যাঙ্কস্ সাহেব দারোয়ানের নিকট—কোন জবাব নাই ( No answers ), এই নির্ম্মম উত্তর রাখিয়া যান। ইহার পর ড্যান্স্ সাহেব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া ফ্যারাডে নিজের খাতাখানি ডেভীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ডেভী তাঁহাকে সৌজন্যপূর্ণ উত্তর দেন। ১৮১৩ সালে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। শীঘ্রই বিজ্ঞানাগারের সহকারীর পদ খালি হওয়ায় ফ্যারাডেকে এই পদ দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক জগতে বালক দপ্তরীর কিরূপ প্রতিষ্ঠালাভ হয়, তাহা শিক্ষিত লোকদের অজ্ঞাত নহে। রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের সহিত আরও অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম সংসৃষ্ট আছে; যথা—অধ্যাপক লর্ড রেলী, অধ্যাপক টিণ্ড্যাল, অধ্যাপক ডিওয়ার ইত্যাদি।

বহু বৎসর পরে আবার ইউরোপে আসিয়াছি। এখানকার বিজ্ঞানমন্দির ও কলকারখানা দেখিয়া সার্ হামফ্রী ডেভীর একটি বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে খুব খাঁটি কথা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। স্বদেশবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া ডেভী বলিতেছেন—

"The progression of physical science is much more connected with your prosperity than is usually imagined. You owe to your experimental philosophy some of the most important and peculiar of your advantages. It is not by foreign conquests chiefly that you are become great, but by a conquest of nature in your own country. It is not so much by colonisation that you have attained your pre-eminence or wealth, but by the cultivation of the riches of your own soil. Why at this moment are you able to supply the world with a thousand articles of iron and steel necessary for the purposes of life? It is by arts derived from chemistry and mechanics and founded purely upon experiments. Why is the steam engine now carrying on operations which formerly employed, in painful and humiliating labour, thousands of our robust peasantry, who are now more nobly or more usefully serving their country either with the sword or with the plough? It was in consequence of experiments upon the nature of heat and pure investigations.

In every part of the world manufactures made from the mere clay and pebbles of your soil may be found; and to what is this owing? To chemical arts and experiments. You have excelled all other people in the products of industry. But why? Because you have assisted industry by science. Do not regard as indifferent what is your true and

greatest glory. Except in these respects and in the light of a pure system of faith, in what are you superior to Athens or to Rome? Do you carry away from them the palm in literature and the fine arts? Do you not rather glory, and justly too, in being, in these respects, their imitators? Is it not demonstrated by the nature of your system of public education, and by your popular amusements? In what, then, are you their superiors? In everything connected with physical science; with the experimental arts. These are your characteristics. Do not neglect them. You have a Newton, who is the glory, not only of your own country, but of the human race. You have a Bacon, whose precepts may still be attended to with advantage. Shall Englishmen slumber in that path which these great men have opened, and be overtaken by their neighbours? Say, rather, that all assistance shall be given to their efforts; that they shall be attended to, encouraged and supported."

অর্থাৎ ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি যে বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে তাহা অনেকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। যুদ্ধজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য এত বাড়ে নাই, যতটা হইয়াছে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারের ফলে। আজ যে পৃথিবীর বাজার ইংলণ্ডের পণ্য সম্ভারে পূর্ণ তাহার কারণ এই—বিজ্ঞান। আজ যে সহস্র সহস্র লোক নিকৃষ্ট শ্রমিকবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সৈনিক ও কৃষকের জীবন যাপন করিতেছে তাহা এই বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায়। বাষ্পীয় যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ইংলণ্ড—রোম বা এথেন্সের উপর প্রধান্যের দাবী করিতে পারে না। তাহার যত কিছু দাবী এই বিজ্ঞানের কল্যাণে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে। জগদ্‌বরেণ্য নিউটন ও বেকন তাহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, ইংলণ্ডের লোকেরা কি সেই পথ অনুসরণ না করিয়া ঘুমাইয়া থাকিবে?

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। আমার প্রিয় দেশবাসীদিগকে বলি—হে ভ্রাতৃগণ! এখনও সময় আছে; একবার উঠিয়া, জাগিয়া, চোখ মেলিয়া দেখ, বিজ্ঞানবলে জগতের কত জাতি কত উন্নতি করিতেছে। এখনও না জাগিলে চিরকাল অধঃপতিত হইয়া থাকিতে হইবে। ইউরোপের একটি জাতিকে পরাস্ত করায় ইউরোপীয়েরা এখন জাপানকে সভ্য বলিয়া মানিতেছেন বটে; কিন্তু নিশ্চয় জানিও জাপানী যুদ্ধ করিয়া সভ্য হন নাই, বিজ্ঞান বলে পূর্ব্ব হইতেই উন্নত, সভ্য, বলিয়ান হইয়াছিলেন। ভারত সত্য সত্যই সোনার ভারত। ইহার উদ্ভিদজ, খনিজ ও প্রাণীজ নানা পদার্থ হইতে বিদেশীয়েরা প্রভূত অর্থশালী হইয়া উঠিতেছে। আমরা কেবল তাঁহাদের কুলি মজুরের কাজ করিতেছি। মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের চেয়ে বড় কে?

মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানব মন বিজ্ঞান বলে মার্জ্জিত, উন্নত ও শক্তি-শালী হয়। সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমস্তই নানা প্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি—বাঁচিতে চাও, সভ্য মানব মণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।

## প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র

### জার্ম্মানী—রসায়ন চর্চ্চার আকর-স্থান

রসায়ন শাস্ত্র অর্থকরী বিদ্যাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলকেই মানিতে হইবে। কেন না সকল প্রকার ব্যবসার মূলে রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত আছে। রাসায়নিক বিজ্ঞানে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে এতগুলি টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। ইউরোপের সকল দেশ অপেক্ষা জার্ম্মানীতে রসায়ন বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে মৌলিক গবেষণা দ্বারা রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সব নূতন আবিষ্কার হইতেছে, তাহার দশ আনা রকম জার্ম্মান-পণ্ডিতদিগের পরিশ্রম দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাহারই ফলে জার্ম্মানী আজ ব্যবসায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কোন্ ঐন্দ্রজালিক উপায়ে জার্ম্মানী এইরূপে ধূলিমুষ্টি হইতে স্বর্ণমুষ্টি প্রস্তুত করিতেছে, তাহা জানিতে কার না বাসনা হয়? লীবিগ্ ( Liebig ), ওহ্লার (Wholer), বুন্‌সেন্ (Bunsen), হফ্‌ম্যান ( Hofman ) প্রমুখ পরলোকগত মনীষীগণের প্রতিভাবলে জার্ম্মানী উন্নতির সোপানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। ফিসার ( Fisher ), বেয়ার (Baeyer), ভ্যাণ্টহফ্ ( Vant Hoff ) প্রভৃতি সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। বস্তুতঃ জার্ম্মান ভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা বাদ দিলে রসায়নের সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সমস্ত কারণে জার্ম্মানীকে রসায়ন বিদ্যার আকর স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণ যেরূপ শিক্ষাসমাপ্তি করিবার অভিলাষে মিথিলা ও বারাণসীতে গমন করিতেন, তদ্রূপ আমেরিকা হইতে জাপান পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের ছাত্রেরা রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য জার্ম্মান বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। এক বার্লিনেই রসায়নশিক্ষার্থী বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা সার্দ্ধ দুইশত। আমি সম্প্রতি জার্ম্মান দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই পূণ্য ভূমির অপরূপ কথা সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন করিতে কার না অভিলাষ হয়? এই প্রবন্ধে উপরি লিখিত কতিপয় মহাপুরুষের-সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও জার্ম্মান দেশের রসায়নমূলক ব্যবসার ক্রমোন্নতির বিষয় আলোচনা করিব।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে জেনা ( Jena ) বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিদ্যা অধীত হইতেছে। খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ গন্ধকদ্রাবক ( Sulphuric Acid ) এবং সোডা প্রভৃতির ব্যবসায় অন্যদেশ অপেক্ষা জার্ম্মানীতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্যারাসেল্কস্, ষ্টাল্ ( Stahl ) প্রভৃতি পুরাতন আমলের অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণ জার্ম্মান দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু লীবিগের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে রসায়ন শিক্ষার উপায় কোন স্থানেই ছিল না। নব্য রসায়নের সৃষ্টির পর সর্ব্বপ্রথমে ( ১৭২৭ অব্দে ) জিসেন্‌স্থিত তাঁহার গবেষণা-মন্দিরে সাধারণ ছাত্রদিগকে কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি নূতন পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণও ছাত্রদিগকে এইরূপ অধিকার প্রদান করেন। যে সকল শাস্ত্র পরীক্ষা-মূলক ( experimental ), কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তাহা আয়ত্ত করা অসম্ভব। এই জন্য লীবিগের ব্যবস্থা রসায়ন শিক্ষার পক্ষে প্রভূত মঙ্গলদায়ক হইয়াছে।

লীবিগের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কখনও এক বিষয় লইয়া স্থির থাকিত না। অঙ্গার মূলক পদার্থের নূতন প্রকার বিশ্লেষণ প্রণালী আবিষ্কার করিয়া তিনি জৈব পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় অল্পায়াসসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। শারীরবিজ্ঞান ( Physiology ), উৎসেচন প্রক্রিয়া ( Fermentation ), কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি রাসায়নিক প্রণালী দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেক নূতন তথ্য উদ্ভাবন করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Chemistry in its relation to Agriculture' নামক পুস্তকে সার দিবার উপকারিতা তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শন করেন। অনেক বৃক্ষ জমি হইতে বিভিন্ন প্রকারের লবণ আকর্ষণ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টি সাধন করে। এই সকল লবণের অভাবে জমির উর্ব্বরতা হ্রাস পায়, তাহা লীবিগ প্রথম প্রমাণ করেন। তিনি গণনা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, আলু চাষ করিতে প্রত্যেক একরে ৯০ পাউণ্ড ও বীট চাষ করিতে ১৫০ পাউণ্ড যবক্ষার ঘটিত লবণ ( Potassium salt ) আবশ্যক হয়। আজকাল বীট হইতে উৎপন্ন শর্করা যে এত সুলভ হইয়াছে, রাসায়নিক প্রণালীমতে চাষ করাই তার একমাত্র কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎপাদিত বীটমূলে শতকরা ছয়ভাগ করিয়া শর্করা থাকিত। কিন্তু লবণ মূলক সার দিবার গুণে আজকাল তাহা ১৪ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। ইক্ষুতে শর্করা শতকরা ১৮ ভাগ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাবে ইক্ষু হইতে উৎপাদিত শর্করা নিজের জন্মভূমিতেও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিল না। শর্করা বিক্রয় করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানী ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছিল।

যবক্ষার ঘটিত লবণের যখন উপকারিতা সপ্রমাণ হইল, তখন চারিদিকে ইহার খনির অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। ষ্টাস্‌ফর্ট্ ( Stassfurt) নামক নগরীতে সৈন্ধবলবণের খনি ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ ভূগর্ভস্থ স্তর প্রদর্শন করিয়া দেখাইলেন যে,আরও নিম্নে সৈন্ধব লবণ ও যবক্ষার ঘটিত লবণ প্রচুর পরিমাণে প্রোথিত থাকিবার সম্ভাবনা আছে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম স্তরে ম্যাগ্নেসিয়াম ঘটিত

তিক্তলবণ পাওয়া গেল। তখন ইহা কোন কাজে আসিত না। সুতরাং রাজপুরুষগণ অনর্থক প্রচুর ব্যয় করাইবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকদিগকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু আরও নিম্নে খনন করিয়া যখন উৎকৃষ্ট লবণের স্তর পাওয়া গেল, তখন বৈজ্ঞানিকদিগের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইল। ত্রিশ বৎসরের ভিতর ১ কোটি ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের লবণ খনি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভূগর্ভ প্রোথিত এই রত্ন উদ্ধারের নিমিত্ত জার্ম্মানীর তাহার রাসায়নিকদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস ঘটিত পদার্থের সার প্রয়োগের ব্যবহারও লীবিগ প্রথমে আবিষ্কার করেন। পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় যে অ্যামোনিয়া যুক্ত তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে অ্যামোনিয়ামূলক লবণের প্রস্তুতকরণ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। চিলি এবং ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের সোরাও কৃষি-কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে পুরাকাল হইতে পচা জৈব পদার্থ হইতে সোরা স্বতঃই উৎপাদিত হইত। বারুদ প্রস্তুতের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত বলিয়া চিলির সোরা অপেক্ষা এই সোরারই বেশী আদর ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ অব্দে দেখা গেল যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে চিলি-সোরাকে ভারতীয় সোরাতে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। সেই সময় হইতে ভারতীয় সোরার রপ্তানি অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। শারীর বিজ্ঞান বিষয়েও লীবিগ্‌ অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি "Organic Chemistry in its relations to Psychology and Pathology" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে কেহই শারীর-বিজ্ঞানে রসায়ন শাস্ত্র অনুপ্রবিষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। লীবিগ্‌ প্রথমে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। শ্বেতসার (Starch) ও অ্যালবুমেন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যে আমাদের শরীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় তাহা তিনি প্রতিপাদিত করেন। রক্ত, পিত্ত, মূত্রমাংস নিষ্পেষিত রস হইতে তিনি অনেকপ্রকার অঙ্গার মূলক যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। অসংখ্য রোগী লীবিগ্‌ কর্ত্তৃক প্রস্তুত সুরুয়া, শিশুর খাদ্য ও মাংস নির্য্যাস সেবন করিয়া উপকার পাইয়াছেন। একজন লোকের আড়ম্বরহীন পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে জগতের কতদূর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে লীবিগ্‌ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান বসুমতীকে শোণিত ধারায় প্লাবিত করিয়া কত রাজ্যস্থাপন, কত রাজ্য বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ সে সব রাজত্বের অস্তিত্ব কোথায়? মহাপুরুষেরা মানসিক জগতে রাজত্ব স্থাপন করিয়া যে মহামুকুট পরিধান করেন, তাহা অবিনশ্বর ; মৃত্যুও তাহা অপহরণ করিতে পারে না।

লীবিগের নামের সহিত আর একটি ক্ষণজন্মা বৈজ্ঞানিকের নাম চিরকাল সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ওহ্‌লার ( Wholer ) তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। ইঁহাদিগকে হরি-হর-আত্মা বলা যাইতে পারে এবং ইঁহারা একত্রে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। ওহ্‌লার বাল্যকাল হইতে জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। যখন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভগিনীর সহযোগিতায় পোটাসিয়ম্ ধাতু রন্ধনগৃহের অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত হাপর চালাইতেন। কিশোর বয়সে কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শে তিনি সুইডেনদেশবাসী রসায়নাচার্য্য স্বনামধন্য বার্জেলিয়সের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গমন করেন। গুরুগৃহে তিনি কিরূপে প্রবেশ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। ষ্টকহল্‌মে বার্জেলিয়সের গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বারবানের মত সামান্য বেশধারী একজন লোক দ্বার খুলিয়া দিল। ওহ্‌লার প্রথমে তাঁহাকে দ্বারবান বলিয়াই অনুমান করিয়া ছিলেন; কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে ইনি স্বয়ং বার্জেলিয়স। বার্জেলিয়সের নিজের বাটীতেই তাঁহার গবেষণা-গৃহ ছিল। গৃহগুলি আজকালকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির তুলনায় অতি সামান্য উপকরণে সজ্জিত ছিল। আনা নাম্নী একজন পরিচারিকা রন্ধনগৃহের তত্ত্বাবধান করিত এবং পরীক্ষা শেষে তাঁহাদের পাত্রাদিও ধৌত করিয়া দিত। ওহ্‌লার এখানে প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। গুরুর সহিত ইহার পর তাঁহার আর কখন সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই; কিন্তু তিনি চিরকালই বার্জেলিয়সের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিয়দ্দিন পরে তিনি গটিঞ্জেনের অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থানেই ১৮২৮ অব্দে কৃত্রিম উপায়ে জৈব পদার্থ নির্ম্মাণের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ যুগান্ত সংঘটনকারী আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। মূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ দানা যুক্ত ইউরিয়া নামক এক পদার্থ পৃথকীভূত করা যাইতে পারে। একজন সুস্থকায় যুবাপুরুষের শরীর হইতে প্রতি দিবস মূত্রের সহিত প্রায় এক ছটাক ইউরিয়া নির্গত হইয়া যায়। প্রাণিশরীর হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা একটি আদর্শ জৈব পদার্থ। ওহ্‌লার অ্যামোনিয়ম সায়ানেটে উত্তাপ প্রদান করিয়া অল্পায়াসে দেখাইলেন যে, ইহা ইউরিয়াতে পরিণত হয়। চারিদিকে এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। আমাদের সময়ে স্বতঃজননবাদ লইয়া যেরূপ তীব্র বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, সেইরূপ একটী গণ্ডগোল হইল। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, জৈব পদার্থ প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তি দ্বারা গঠিত; কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে ইহাদের নির্ম্মাণ অসম্ভব। এখন সে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে রূঢ় আঘাত লাগিল। মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে জীবনদান করা যেরূপ অসম্ভব, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করিল, কেহ বা অস্বীকার করিল। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইল। বহুসংখ্যক মিশ্র জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত হইতে লাগিল। লীবিগ্‌ এবং ওহ্‌লার মূত্রোদ্ভূত অম্লের (Uric acid) বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছিলেন যে, আশা করি শর্করা, ইউরিক য়্যাসিড প্রভৃতি জৈব পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী অদূর ভবিষ্যতে অবগত হইতে পারা যাইবে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক এমিল ফিশার তাঁহাদের আশা সফলীভূত করিয়াছেন। ওহ্‌লারের কথা এই প্রবন্ধের স্বল্প আয়তনের ভিতর বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে,

আমরা বিবাহ ও অন্যান্য মঙ্গলোৎসবে যে সকল এসিটেলীন ল্যাম্প (Acetyline lamp) ব্যবহার করি, তাহার উপাদানীভূত ক্যাল্‌সিয়ম কারবাইড (Calcium carbide) ওহ্‌লার কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মৃত্তিকা হইতে উৎপাদিত লঘুভারবিশিষ্ট রজতসন্নিভ অ্যালুমিনিয়ম্‌ ধাতুর পাত্রাদি আজকাল সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তিনিই এই ধাতুর প্রথম আবিষ্কর্ত্তা।

ইউরিক য়্যাসিড প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমিল ফিশারের নাম উল্লেখ করিয়াছি। ইহার গবেষণাগুলি আলোচনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যে বিষয়ে ইনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যতই কঠিন হউক না কেন তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রথমে অটো ফিসারের সহযোগিতায় ইনি ম্যাজেণ্টা এবং তৎসদৃশ কতকগুলি পদার্থের বিষয় গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহাদের মূল পদার্থ নীল হইতে অধঃপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন করা যায় বলিয়া ইহা এনীলিন নামে খ্যাত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে পাকিন্‌ অশোধিত এনিলিনের সহিত অক্সিজেন সংযোগ (Oxidation) করিয়া ম্যাজেণ্টা উপাদান করেন; কিন্তু কিরূপ প্রণালীতে এই সকল বর্ণোৎপাদক বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে ১৮৭৮ অব্দে এমিল এবং অটো ফিসার ম্যাজেণ্টা প্রভৃতির আণবিকগঠন (Molecular constitution) প্রমাণীকৃত করিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ তিরোহিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ইউরিক য়্যাসিড এবং তৎসদৃশ আণবিক-গঠন বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থগুলি অধ্যাপক ফিশারের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই পদার্থটি মূত্রের সহিত সুস্থ অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। বাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগে ইহা শরীরের স্থানে স্থানে জমিয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অ্যাল্‌বুমেন্‌ প্রভৃতিই শরীরস্থ পদার্থ সকল ইহাতে পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াও শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের পক্ষেও ইহা কৌতূহলোদ্দীপক। লীবিগ্‌, ওহ্‌লার, বেয়ার প্রভৃতি মনীষীগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াও ইহার আণবিকগঠন প্রমাণ করিতে পারেন নাই। বিংশ বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া ফিশার ইহার আণবিকগঠন প্রমাণ ও কৃত্রিম উপায়ে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় ১৪৬টি সদৃশ-গঠনবিশিষ্ট পদার্থ নিজ রসায়নাগারে উৎপন্ন করিয়াছেন। চা ও কাফির প্রধান উদ্ভিজ্জ উপদান কেফিন, ইউরিক এসিডের ন্যায় গঠন বিশিষ্ট। নরমূত্রের সার ইউরিক এসিডের সহিত চা ও কাফি বীর্য্যের সম্বন্ধ যে এত নিকট তাহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন। অনেকে বোধ হয় এই সকল সুখসেব্য পানীয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেও পারেন।

শর্করা, শ্বেতসার, তুলা প্রভৃতি পদার্থ কার্ব্বোহাইড্রেট্‌ নাম গ্রহণপূর্ব্বক অঙ্গারক রসায়নে এক প্রধান স্থান অধিকার-লাভ করিয়াছে। প্রাণীগণ ও উদ্ভিদগণ এই শ্রেণীর পদার্থকে খাদ্য ও শরীরাংশ (tissues) নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করে। অপর কোন ব্যবসায় অপেক্ষা এইসকল বস্তুর ব্যবসায়ে অনেক অধিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হয়। ইক্ষু-শর্করা, বীট-শর্করা, শ্বেতসার, শ্বেতসার ও অন্যান্য পদার্থ হইতে উৎসেচিত মদ্য, কাগজ প্রভৃতির

ব্যবসায়ের উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এত অত্যাবশ্যক নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুগুলির আণবিক গঠনের বিষয় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কিছুই জানা ছিল না। ফিশার যখন এই কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন কিলানি এ বিষয়ে অল্প কার্য্য করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। স্বল্প দিনের মধ্যে ফিশার দেখাইলেন যে, দ্রাক্ষা-শর্করা শ্রেণীতে ২৪টী বিভিন্ন প্রকারের শর্করা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ১৬টি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন। ফল-শর্করার আণবিক গঠন ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হইয়া গেল, কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন ও স্বল্পায়াসে সাধিত হইল। ইক্ষু, যব ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন শর্করাদিগের আণবিক গঠন এখন আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। তিন হইতে নবম সংখ্যক অঙ্গারান্দুবিশিষ্ট অনেকগুলি নূতন শর্করা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে সব বস্তুর অস্তিত্ব নাই, তাহাদের নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতিকে হার মানাইয়া ফিশার প্রভৃত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আরও অদ্ভুত। আণবিক সংস্থান ( space arrangement ) দ্বারা যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সকল পরিচালিত হয়, তাহা তিনি বিভিন্ন প্রকার শর্করার উপর ভিন্ন প্রকার ঈষ্টের (yeast) ক্রিয়ার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করেন। আণবিক গঠন সমান হইলেও সকল প্রকার শর্করার উপর একই জাতীয় ঈষ্টের (yeast) সমান ক্রিয়া হয় না। যেমন সকল চাবিতে সকল কুলুপ খোলে না সেইরূপ সামঞ্জস্য না হইলে ঈষ্ট ( yeast ) শর্করার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না। সম্প্রতি ফিশার জীবশরীরস্থ ) albumen ) ডিমের লালা সদৃশ বস্তুর প্রস্তুত প্রণালী পরীক্ষা করিতেছেন। ইহা সংসাধিত হইলে বিজ্ঞানের যে জয়লাভ হইবে, তাহা বর্ণনার অতীত।

পূর্ব্বে যে এনিলিনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা বর্ণোৎপাদক বস্তু সকলের প্রধান উপাদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৩৫ অব্দে রুণা নামক জার্ম্মান পণ্ডিত বার্লিন নগরীতে ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু নীল হইতে ইহা উৎপাদন করা আয়াসসাধ্য ছিল, এবং বহু দুর্মূল্য বলিয়াও ইহার বহুল প্রচারের বিশেষ বাধা ছিল। হফ্‌ম্যান ( Hofman ), ম্যানস্‌ফীল্ড, ( Mansfield ), মিট্‌সালিক, ( Mitscherlich ), জিনিন ( Zinin ) প্রভৃতি রাসায়নিকগণ বহু সাধনার ফলে আলকাতরা হইতে সুলভ মূল্যে এনিলিন প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন। ম্যান্‌সফীল্ড আলকাতরাকে অধঃপাতন প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন প্রকার পদার্থে বিশ্লিষ্ট করিবার প্রণালী যতদূর সম্ভব উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় অকাল মৃত্যুতেই এই ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

হফ্‌ম্যান্‌ এবং তাঁহার ছাত্রেরা এনিলিন হইতে উৎপন্ন বিবিধ রংয়ের স্রষ্টিকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত আছেন। হফ্‌ম্যান্‌ যদিও জার্ম্মান্‌ কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বিশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের 'Royal College of Chemistry'র অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। আবেল (Abel), আর্মষ্ট্রঙ্গ্‌ ( Armstrong ), ক্রুক্‌স্‌ ( Crookes ), ডিলারু ( Delarue ),

ম্যানস্‌ফীল্ড ( Mansfield ), নিকলসন্ ( Nicholson ), পার্কিন ( Perkin ), রেনল্ডস্ ( Reynolds ) প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ ইঁহার ছাত্র ছিলেন। হফ্‌ম্যান বিদেশী হইয়াও ছাত্রদিগের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণার্থ লণ্ডনস্থ রাসায়নিক সভায় যে সব বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই অনুমান করা যায়। সার ফ্রেড্‌রিক আবেল, যখন তিনি হফ্‌ম্যানের সহকারী ছিলেন সেই সময়কার কার্য্যপ্রণালী এই উপলক্ষে বর্ণনা করেন। দুই ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে নয়টার সময় তাঁহাকে কলেজে আসিতে হইত। বৈকালে ৫ টার সময় বিদায় পাইতেন। বাটিতে ফিরিতে সাড়ে ছয়টা বাজিত; কিন্তু তবুও তিনি সন্ধ্যার সময় অদম্য উৎসাহে কলেজে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্য করিতেন। এত পরিশ্রম করিয়াও কখনও ক্লান্তিবোধ তিনি করিতেন না। "But the life, although somewhat arduous, was a thoroughly happy one; who would not work and even slave for Hofman? To be his pupil was to become attached to him."

গ্রীজ ( Griess ) ও মার্সিয়স্ ( Martius ) নামে দুই জন জার্ম্মান পণ্ডিত Hofmanএর সহকারীরূপে Royal College of Chemistry-তে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশেষতঃ গ্রীজ, বর্ণোৎপাদক বস্তুর রসায়নে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদিও ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম এইরূপে বর্ণোৎপাদক বস্তু সমূহের আবিষ্কার হয়, ইংলণ্ড বহু দিন এই ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারিল না। পার্কিন ও নিকলসনের মত লোক আর জন্মিল না, এবং ব্যবসায়িগণ স্বেচ্ছানুসারে অনুমান করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন, ইংরাজ রাসায়নিকদিগকে কোন উৎসাহ দিলেন না। ১৮৯৮ অব্দে জার্ম্মানি হইতে উৎপাদিত বর্ণোৎপাদক অঙ্গারক বস্তুর মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। আমাদের দরিদ্রা ভারতজননী ইহা হইতে প্রায় ৫ পাচ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ প্রতি বৎসর ক্রয় করিতেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে উৎপন্ন বিবিধ রংয়ের নয় দশমাংশ জার্ম্মানিতে প্রস্তুত হয়। ইংলণ্ড আজও ইহা লইয়া আক্ষেপ ও হা হুতাশ করিতেছেন। কত রিপোর্ট, কমিশন বসাইতেছেন। কিন্তু জার্ম্মানি যে অর্থ একবার গ্রাস করিয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার করা বড়ই দুঃসাধ্য।

জৈব রসায়ন শাস্ত্রে অধুনা প্রায় ৬০।৭০ হাজার যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকেই মনে করিবেন—এত বিপুল পরিশ্রম ভূতের বেগার বই আর কিছু নয়। যেগুলি কোন কার্য্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, সেই বিষয় গুলিই গবেষণা করিলে হইত। অবশিষ্টগুলি কেবল অভিধান ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নকারীদিগের ব্যতীত অন্য কাহারও কাজে আসে না। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৩৫ অব্দ হইতে ইউরোপে নীলের আণবিক গঠনের বিষয়ে সমালোচনা চলিতেছে। আডল্‌ফ ভন বেয়ার (Adolf Von Baeyer) নামক প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত নীলের আণবিক গঠন ও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতিকরণ বিষয়ে কিছুমাত্র অর্থের সাহায্য না পাইয়া এবং

অর্থসাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া ত্রিশ বৎসরকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রথমে যখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইনি নীলের আণবিক গঠন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেন, তখন কলবে (Kolbe) ইহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারস্থ নীলকরদিগের নিকট ইহা এখন আর উপহাসের বিষয় নয়। ইক্ষুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এখন কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা দেখিতেছেন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনও কৃত্রিম উপায়ে নীলের উৎপাদনকে নীল আকাশ হইতে বজ্র পতনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মোটে ৪।৫ বৎসর হইল এইরূপে সুলভ মূল্যে কৃত্রিম উপায়ে জার্ম্মানিতে নীলের প্রস্তুতীকরণ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে নীলের রপ্তানি অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মঞ্জিষ্ঠা (madder)-ও নীলের মত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরবী azara ( নিস্পেষণ ) ধাতু হইতে ইহার নাম alizarin হইয়াছে। বহু পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষ ও মিশরে ইহা দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হইত। এক ফ্রান্সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ২।৩ লক্ষ টন মঞ্জিষ্ঠা প্রস্তুত হইত। প্রথম নেপোলিয়ন ফরাসি পদাতিকের পাজামার জন্য এই রং পছন্দ করিতেন বলিয়া ইহার চাষের উন্নতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ অব্দে গ্রাবে এবং লীবারম্যান্ আলকাতরা হইতে উদ্ভূত anthracene দ্বারা alizarin কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে পার্কিন এবং কারো (Caro) মহাদ্রাবকের সাহায্যে এই রং সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে বৃক্ষোৎপন্ন আলিজারিন অন্তর্হিত হইল। অধ্যাপক শর্লেমার গল্প করেন যে, তাঁহার এক বন্ধু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স পরিভ্রমণের সময় মঞ্জিষ্ঠা বৃক্ষের চাষ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অজ্ঞ কৃষকেরা বলিল যে, ইহার এখন চাষ হয় না, কলেতে প্রস্তুত হয়। এই ব্যবসায় উঠিয়া যাওয়াতে ফ্রান্সের প্রায় প্রতি বৎসর ১৭লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইতেছে। ফরাসি পদাতিকেরা এখনও লাল পাজামা ব্যবহার করে বটে; কিন্তু তাহা জার্ম্মানি হইতে আনীত alizarin কর্তৃক রঞ্জিত হয়।

উপরে কয়েকটী ব্যবসায়ে জার্ম্মানি কত লাভ করেন, তাহার একটী হিসাব দিবার চেষ্টা করিয়াছি। জার্ম্মানি যেমন সকল দেশ অপেক্ষা বেশী লাভ করে, শিক্ষাবিভাগের নিমিত্ত জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টকে সকল দেশ অপেক্ষা সেইরূপে মুক্তহস্তে খরচ করিতে হয়। জার্ম্মানির রাজকোষ হইতে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১০।১১টী উচ্চশ্রেণীর শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য বৎসরে গড়ে প্রত্যেকের নিমিত্ত ৩০।৪০ হাজার পাউণ্ড খরচ করিতে হয়। ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের বিস্তার প্রভৃতি নানা কারণে অনেক খরচ পড়ে। ২০ বৎসরে বার্লিন শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য ৫ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছিল। সমস্ত খরচ যত হয় তাহাকে ছাত্রসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি কত খরচ পড়ে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৯৯ অব্দে এইরূপ হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ২৩ পাউণ্ড করিয়া খরচ পড়িয়াছিল। এতন্মধ্যে ১২ পাউণ্ড বা অর্দ্ধেক ব্যয় রাজকোষ বহন করে।

জার্ম্মানিস্থ শিল্প বিদ্যালয়সমূহের ১১,৩১১ জন ছাত্রের ভিতর ২,০১৭(বা শতকরা ১৭জন) বিদেশী ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। উপরে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ১২ পাউণ্ড করিয়া বৎসরে রাজকোষ ব্যয় করে। অতএব সমস্ত বিদেশী ছাত্রের জন্য ২৪, ২০৪ পাউণ্ড বৎসরে ব্যয় হয়। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট বিদেশী ছাত্রদিগের জন্য এতটা অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছে।

আমরা বিদেশী রাজার প্রজা। আমাদের রাজা যে আমাদের জন্য এতটা করিবেন, তাহা আশা করা যায় না। বহুদিন পূর্ব্বে হাম্‌বোলট (Humboldt) তাঁহার Cosmos নামক পুস্তকে বলিয়া গিয়াছেন :—

"Those states which remain behind in general industrial activity in the selection and preparation of natural substances in the application of mechanics and chemistry, and in which a due appreciation of such activity fails to pervade all classes must see their prosperity diminish and that the more rapidly the neighbouring states are meanwhile advancing both in science and in the industrial arts, with, as it were, renewed and youthful vigour."

বিজ্ঞানশিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জাতীয় জীবন মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা কবে উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ইহলোকে দশজন নিরন্নকে প্রতিপালন পূর্ব্বক অপার কীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন ?

* প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩১২

# রজনীকান্ত স্মৃতি

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথমে যে দিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেইদিন হইতেই গীতরচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। পরে রাজসাহী সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে রজনী কান্তের সহিত প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তখন হইতেই তাঁহার চিত্র আমার মানস পটে অঙ্কিত হইয়া গেল। তাঁহার অমায়িকতা ও প্রফুল্লতা আমাকে মুগ্ধ করিল। প্রথম হইতেই বুঝিলাম, রজনীকান্ত অদ্ভুত উপাদানে নির্ম্মিত মানুষ। আমাদের রাজসাহী প্রবাসের কয়দিন রজনীকান্তের কল্যাণে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন সভারম্ভের সময় তাঁহার সঙ্গীত যেন আমাদের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ আনিয়া দিত। সভারম্ভের পরেও তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিত। শেষদিন সভাবসানের সময়,

প্রসাদী সুরে তিনি যে গান রচনা করিয়া আমাদিগকে বিদায় দেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। গানের শেষ ছত্রটী যেন এখনও আমার কানে মাঝে মাঝে বাজিতে থাকে—

"( মোদের ) প্রাণের ব্যাকুলতা বুঝে,
ক্ষমা ক'রো সবাই মিলে।
কি দিয়ে আর রাখব বেঁধে,
রইবে না হাজার কাঁদিলে।
( শুধু ) এই প্রবোধ যে, হর্ষ বিষাদ
চির-প্রথা এই নিখিলে।"

সান্ধ্যসমিতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রণ সভায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কখনও তীব্র ব্যঙ্গ ও রহস্যের গানে সভামণ্ডল হাসির হিল্লোলে পূর্ণ করিয়া দিত। কখনও বা ব্যাকুল ভগবদ্‌ভক্তিপূর্ণ আশাময়ী গীতিকার আবাহনে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় করুণায় পূর্ণ করিয়া দিত। নিজের ক্লেশের দিকে দৃষ্টি নাই—পরকে তুষ্ট করাই যেন তাঁহার ব্রত। এ প্রকার লোকের যে আইনের দুয়ারে পশার হইবে না তাহার আর বিচিত্রতা কি? Lomboroso যথার্থই দেখাইয়াছেন যে, প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী ও উন্মাদের মধ্যে ক্রমবিভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কবিও বলিয়াছেন,—

"The lunatic, the lover and the poet,
Are of imagination all compact:

The poet's eye in a firm frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven;
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

রজনীকান্ত যখন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে দিন কাটাইতে ছিলেন, তখন আমি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কণ্ঠনালী ছিদ্র করিয়া রবারের নল পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—খাতায় লিখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হইতেছে—এমন অবস্থাতেও যদি কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত, অমনিই নিজের দুঃসহ কষ্ট ভুলিয়া সাক্ষাৎকারীকে তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কবি প্রথমে আমায় যে মনের ভাব জানাইলেন, তাহাতে তাঁহার বড়ই দুঃখ হইতেছে বোধ হইল। "সকলই অন্ধকার, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ফেলিয়া

কোথায় যাইতেছি বুঝি না!" Hamlet এর উক্তি স্বতঃই আমার স্মৃতিপথে আসিল—

"That, undiscovered country
From whose bourne no traveller returns
Puzzles the will and makes us rather bear
Those ills we have than fly to others that
We know not of!"

কিন্তু এ প্রথম দিনের কথা বলিতেছি। তারপর বুঝিলাম কবি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতে পৌছিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি যতবারই সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, ততবারই তাঁহার আত্মসংযম ও বিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু দ্বিরুক্তি মাত্র নাই। কিসে আমাকে আপ্যায়িত করিবেন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কুমার শরৎকুমার রায় ও শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ রাজসাহীর বন্ধুবর্গ যে তাঁহার সর্ব্বদা তত্ত্বতল্লাস লইতেছেন, ইহাতে তিনি ভাবে বিগলিত হইয়া পড়িতেন। যেন তিনি তাঁহাদের স্নেহ ও সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্রই নহেন। যেমন অবসন্ন রোগীও উত্তেজক ঔষধ প্রভাবে ক্ষণেক সবল হয়, আমার উপস্থিতিতেও দেখিতাম তিনি সেইরূপ সবল হইয়া উঠিতেন। তিনি উঠিয়া উপাধানে ঠেস দিয়া খাতায় লিখিয়া অনেক প্রকার ভাব ও সংবাদ আমাকে জ্ঞাপন করিতেন। এমন কি নিজে হার্ম্মোনিয়ম্ ধরিতেন এবং পুত্র কন্যাদিগকে ডাকাইয়া স্বরচিত গান শুনাইয়া আমার চিত্ত বিনোদন করিতেন। এরূপ নিদারুণ যাতনার মধ্যে পড়িয়াও কবির কবিত্ব উৎস শুকাইয়া যায় নাই। যেন আবার নূতন উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা যে অসাধারণ, তাহাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। "অমৃত", "আনন্দময়ী" "বিশ্রাম" "অভয়া" প্রভৃতি ভাব-স্রোতস্বিনীগুলি এই উৎস হইতেই উদ্ভূত। তাই যেন বলিতে ইচ্ছা হয় "sweet are the uses of adversity" কবি যে দিন "তাঁহার দয়ার বিচার" গান করাইয়া শুনাইলেন সে দিনের কথা এ জীবনে ভুলিব না।

তাঁহার কবিতার সমালোচনা আমার সাধ্যাতীত। যোগ্যতর ব্যক্তি সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ধর্ম্মভাবপ্রবণতার বিষয়ে কিছু না বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিতের এক স্থানে বলিয়াছেন,—তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝাইয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র, তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি

গুণে—কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনা দত্ত প্রধান শিক্ষা এবং জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিম চন্দ্রের এই ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই কবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

এক কথায় বলিতে হইলে—রজনীকান্ত সাধক ছিলেন বলিলে যথেষ্ট হইল। কবিতা-পুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপ ধূনাতে আমোদিত করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধনা উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতর পবিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—উহা বঙ্গবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া সরল সাধনার একটি যুগ আনয়ন করিয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে; কেন না পাঠক হয়তো এতাদৃশ প্রশংসাবাদকে কোনরূপ অপকৃষ্ট আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে পারেন। রজনীকান্ত ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, অথচ নব্যবঙ্গে সরল সাধনার যুগ আনয়ন করিয়াছেন। শুনিলে স্বতঃই মনে সংশয় ও সন্দেহের উদয় হইতে পারে। কিন্তু কথাটার মীমাংসা করিতে হইলে রজনীকান্ত কোন্ শ্রেণীর সাধক তাহা সম্যক বুঝিতে হইবে। বঙ্গের এমন কোন সন্তান নাই যিনি সঙ্গীতজ্ঞ সাধু রামপ্রসাদকে সাধক বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন—বরং সাধক রামপ্রসাদ, ইহাই বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে রামপ্রসাদের আখ্যা। তাঁহার সাধনার উপকরণ সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহা আর কিছুই নহে—গভীর আবেগপূর্ণ সঙ্গীতই তাঁহার ফুল-বিল্বপত্র, প্রেমাশ্রু তাঁহার গঙ্গোদক, তন্ময়তা তাঁহার 'আনন্দম্'। কবি রজনীকান্তও এই শ্রেণীর সাধক। যাঁহারা এই সাধু ও সদ্‌জন কবিবরকে দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার জীবনের সুখদুঃখ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আর্থিক, নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অবস্থা জ্ঞাত; যাঁহারা এই বিনীত উদার ধর্ম্মপ্রাণ কবি প্রবরের দয়াদাক্ষিণ্য সরলতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত, তাঁহারা একবাক্যে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, রজনীকান্ত প্রকৃত সাধক ছিলেন। সংসারে থাকিয়া ধন-রত্ন স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শিক্ষা-জ্ঞান সমাজ সংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায়—রজনীকান্ত তাহারই উদাহরণ। যিনি পরের মুখে সুখ্যাতি, বাহবা শুনিবার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মী হইতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মযোগী নহেন।

সঙ্গীত সাধনার উপায়—সঙ্গীত ভাবের পরিচায়ক—সঙ্গীত প্রাণের সরল প্রস্রবণ—সঙ্গীত প্রাণের ক্লান্তি ক্লেদ অপনয়নকারী—এই সঙ্গীতই রজনীকান্তের সাধনার পথ, তিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় যখন তখন আপন মনে ভাবের বন্যায় নাচিতেন, গাহিতেন। প্রাণের ব্যাকুলতা, সর্ব্ববিধ অবসাদ—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা—অবিরাম তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। শিশু যেমন আবদার করিয়া—মায়ের অবাধ্য হইয়া—পীড়িত হইয়া পুনরায় মায়ের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হয়, রজনীকান্তের পারমার্থিক

কবিতাগুলিতে এই একই ভাব প্রবাহিত দেখিতে পাই। কবির সরল প্রাণের নিভৃততম প্রদেশে কি যেন এক অতৃপ্ত বাসনার ঢেউ হৃদয়টাকে বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে—কি যেন পৃথিবীর পাপ ও তজ্জনিত অনুশোচনা হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তরল অয়ঃস্রোত ঢালিতেছে,—তাই কবি রহিয়া রহিয়া আকুল প্রাণে সেই একই তান ধরিয়াছেন। মানুষের, পৃথিবীর, সমাজের গভীর পঙ্কিলতা, কপটতা, পার্থিব নৈরাশ্যের বিষম প্রবাহ দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাই যেন কবি সরল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহারই চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—

"আমি শুনেছি হে তৃষা হারি!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।"

এই ভাব লহরী যখন কবি তাঁহার স্বীয় সুমিষ্টকণ্ঠে গায়িতেন, মনে হইত যেন কোথায় আসিয়াছি—মুহূর্তের জন্য যেন পার্থিব ক্ষুৎপিপাসা ভুলিতে সমর্থ হইয়াছি! কি যেন এক গভীর বিশ্বাস, কি যেন এক গভীর আনন্দ, আবার কি যেন এক সুখ-বিজড়িত প্রীতিপ্রদ অবসাদ—যাহা ভাষায় প্রকাশ অসাধ্য তাহাই—আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে! কি গভীর ভাব! কি গভীর ব্যাকুল বিশ্বাস!! কি সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী কল্পনা!!! পাঠক, কল্পনার দ্বার উদ্ঘাটিত কর, যদি কখনও, পথের ধূলায় অন্ধ হইয়া প্রশান্ত দিগন্ত বিস্তারিত জলধির কূলে আসিয়া দেখ যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, উৎকট বাত্যাতাড়িত হইয়া উর্ম্মিরাশি প্রণয়ালিঙ্গনের ভাব পরিহার করিয়া ক্রোধে ভীমরবে গর্জন করিতেছে, নীল জল গভীর কৃষ্ণাভ হইয়া ভীতি সঞ্চার করিতেছে,—জড় প্রকৃতির সেই উলঙ্গ-উন্মত্ত নর্ত্তনের সময় যদি তুমি কূলে "খেয়ার" প্রত্যাশায় আসিয়া দেখ "খেয়াবন্ধ"—খেয়া নাই, হায়, জানিনা সে অবস্থায় কাহার না হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়! আবার ততোধিক শোক তাপ, বিরহ বিচ্ছেদ ধূলিতে আচ্ছন্ন সংসারের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যদি ক্লিষ্ট পান্থ ভবজলধি-তটে আসিয়া দেখে যে, কাণ্ডারী হীন খেয়া কালের ফেনিল নর্ত্তনে মগ্নপ্রায়—যদি সেই ঘোর আবর্ত্তে আশার ক্ষীণ রেখা মাত্র দেখিতে না পায়—জানি না এ বিষম সংঘাতে বিশ্বাসের দৃঢ় যষ্টি ভিন্ন কে তাহাকে তুলিয়া ধরিবে! তাই যেন কবি গাহিয়াছেন—

"হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ
এসে দেখিছ কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে বসে পার কর বলে
(পাপী) ডাকে কেন দীন শরণে!"

এই প্রশান্ত ভাব কবির প্রত্যেক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কবিতাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান —এইভাব প্রত্যেকের হৃদয়স্পর্শী প্রত্যেকের অনুকরণার্হ।*

* শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' গ্রন্থের জন্য লিখিত ভূমিকা। ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩২০।

# চরকা ও বস্ত্রসমস্যায় বঙ্গমহিলার কর্ত্তব্য*

মাতৃপূজার বিপুল যজ্ঞের হোতা কর্ম্মবীর মহাত্মা গান্ধী কারাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে পত্রখানি আমাকে লিখিয়াছিলেন হয়ত অনেকে তাহা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধিস্থলে দিগদিগন্ত হইতে জাগরণের সাড়া ভারতের নব ইতিহাস নিয়তই রচনা করিতেছে। বাংলা দেশের গৃহলক্ষ্মীগণের জাগরণ এই তরঙ্গকে নবধারা প্রদান করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাই তিনি আজ আমাদের মাতৃজাতির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছেন। যে বিখ্যাত মস্‌লীন একদিন সূক্ষ্মশিল্পের নিদর্শন হিসাবে জগতে এক আশ্চর্য্য দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা এই বাংলাদেশেরই মায়েদের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরী। তাই আজ আমাদের নারীজাতির দিকে সমস্ত ভারতের বিশেষ দৃষ্টি।

চরকা প্রচলনের প্রথম চেষ্টায় অন্যান্য দশজনের মত আমিও সন্দিহান হইয়া বিদ্রূপ করিয়াছি। এই রেল, ষ্টীমার কলকব্জার ও কারখানার দিনে হাতে ঘোরা কাঠের চরকার প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঁশের চরকার পশ্চাতে যে প্রাণশক্তির আবেগময় স্পন্দন রহিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার নয়। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাতীয় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আনয়ন করিতেছে তাহাই পরম সম্পদ। আজ আমি আপনাদের নিকট আমার স্বগ্রামবাসীদের উপহার দেওয়া খদ্দর পরিধান করিয়া আসিয়াছি। তাই আজ আমার হৃদয় দেশ-মাতৃকার স্বহস্তের স্নেহের দান লাভ করিয়া কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে। আজ উচ্ছ্বসিত হৃদয় কান্ত কবির ভাষায় আপনিই বলিয়া উঠিতেছে—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"। আজ আমার পরিধানের কাপড়, গায়ের জামা ও চাদর যে শুচিতা আনিয়া দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এই সভাস্থানে আসিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডাকে আসামবাসী জনৈক ব্যক্তি এই যে সুতো আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা ৬০ নম্বরের সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্মতায় হীন নহে।

আজ সুজলা সুফলা বাংলা দেশের চারিদিকে যে অন্ন-বস্ত্রের মহা হাহাকার উঠিয়াছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে দরিদ্রতার যে রুদ্র সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া আজ দেশবাসী আর্ত্ত, সেই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে দেশবাসীর ধনাগমের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। যে দেশে জনপ্রতি গড়ে দৈনিক এক আনা আয়, সে দেশে যে-কোন প্রকারেই ধনবর্দ্ধনের পথ মুক্তির পথেরই মতো অসঙ্কোচে অবলম্বনীয়। সমগ্র ভারতের জনপ্রতি গড়ে দৈনিক আয় এক আনা। ইহাতে বর্দ্ধমানাধিপ ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার ন্যায় বিত্তশালী ব্যক্তিগণের আয়ও

* ভবানীপুর পদ্মপুকুর চড়ক মেলার শিল্পপ্রদর্শনীতে মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস্‌সি কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রবাসী-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

যোগ করা হইয়াছে। অতএব এই হতভাগ্য দেশ যে কি প্রকার নির্ধন তাহা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং চরকা কাটিয়া যদি কেহ দৈনিক আয় এক আনাও করিতে পারে, তাহা হইলে দেশের বিত্ত দ্বিগুণিত হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চরকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তি ভিত্তিহীন।

চাই প্রাণ। অসাড় নিষ্পন্দ হৃদয় সরস করিতে মহাপ্রাণতা চাই। বাংলা দেশে বরিশালের মাটি মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রেরণায় আজ উর্ব্বর। তাই বরিশাল আজ খদ্দর-প্রচলনে অগ্রণী। ঊষর পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম খদ্দর বয়ন করিয়া আজ সরস হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়িয়া ও ভদ্রলোকদের মধ্যে কার্পাস চাষ ও খদ্দর বুনন এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে। তাই সেখানে সহজেই কৃতকার্য্যতা আসিয়াছে। কিন্তু বরিশালের নূতন অধ্যবসায় আরো প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যে আটশত চরকা ও একশত তাঁত চলিতেছে। সপ্তাহে পাঁচ মন এবং মাসে কুড়ি মন সূতা কাটা হইতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেরা এই-সমস্ত করিতেছেন। মা-বোনদের সাহায্য লইয়া একজন যুবক অনায়াসে চরকা ও তাঁতে দৈনিক পাঁচসিকা রোজগার করিতে পারেন। আজকাল বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া চাকরী লাভের জন্য যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহাতে স্বাধীনভাবে ঘরে থাইয়া, দৈনিক পাঁচসিকা রোজ্‌গার নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি দিবানিদ্রা, পরচর্চ্চা ইত্যাদি একটু ছাড়িয়া এ বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে এই আয় ঘরে ঘরে হইতে পারে এবং দেশের শোচনীয় বস্ত্রসমস্যার সমাধানও যুগপৎ হয়।

বাংলাদেশে প্রতিবৎসর অন্যূন ২০।২৫ কোটী টাকার বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হয়। যিনি একজোড়া বস্ত্র ক্রয় করিলেন তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি তাহাতে বিদেশে ৩।৪।৫ টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। এই প্রকারে বিত্তহীন দরিদ্র দেশ হইতে বস্ত্রের জন্য আমরা সম্বৎসর ২২৷৷০ কোটী টাকা যেন বিদেশে হেলায় নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছি। সহরে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মানুষের সরল জীবনগতি ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে। অর্থাগমের অপেক্ষাকৃত সুবিধা বশতঃ বিলাসিতাও সহরে অধিক। সহরে স্বামী ও পুত্রগণ বেশী অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরাং সহরের রমণীগণের আলস্য ও বিলাসিতা বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আমি গ্রামে গ্রামে মা-লক্ষ্মীগণের নিকট চরকার বার্ত্তা প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি মোটা কাপড় পরিয়া অগ্রসর হইয়া স্বামী ও পুত্রগণকে লজ্জা দেন, তবে এ স্রোত ফিরাইতে বেগ পাইতে হইবে না। কলিকাতা বাংলা দেশের রুচি ও শিক্ষার আদর্শস্থান। কলিকাতা-বাসিনীগণের দায়িত্ব কত গুরুতর, তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেননা তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত ফ্যাশান সুদূর পল্লীপ্রান্তে প্রভাব বিস্তার করিবে।

মানুষের স্বভাবই গতানুগতিকতা। তাই ফ্যাশানের প্রতাপ এত বেশী। সেদিন মফঃস্বলে এক ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে চায়ের সঙ্গে হাণ্ট্‌লী পামারের বিস্কুট দেখিয়া প্রশ্ন

করিয়া জানিলাম চৌদ্দ-ছটাকী এক কৌটার তিন টাকার উপর মূল্য লাগিয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি, এই বিস্কুট আমাদের মুড়ি অপেক্ষা খাদ্যগুণে কোন রকমেই শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু কি আমাদের সংস্কার এবং বিকৃত রুচি! মুড়ি এবং নোলেন গুড় দিয়া কে আজ অতিথি সৎকার করিতে সাহসী হইবেন? বাহিরের চাকচিক্যের মোহে, আমরা ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন হইলেও বাহিরে কোঁচার পত্তন করিতেছি। সকলেরই স্বামী এমন অনেক কিছু রোজ্‌গার করেন না। সীমন্তিনীগণ "মিহির উপর থাপী" না হইলে বস্ত্র পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে বিলাতী সূতায় প্রস্তুত সূক্ষ্ম দেশী ধুতি স্বদেশীবস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

বঙ্গললনাগণ কি ওজনে ভারী বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কাররাশি ফেলিয়া দেন? সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ভার বহন করা যদি ক্লেশকর না হয়, তবে মোটা খদ্দর বসন পরিধানে কেন কষ্ট হইবে? এই-সমস্তেরই মূলে দেখি ফ্যাশান্। তাই বলিতেছি, আপনারা পুরবাসিনীগণ, আপনারা পথ প্রদর্শন করুন। এ দায়িত্বভার আপনাদের। উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্নগণই সমাজের সর্ব্ববিধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধারম্ভে ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বাগ্রে কেম্ব্রিজ অক্স্‌ফোর্ডের বনিয়াদী আভিজাত্যাভিমানী ঘরের পুত্রগণই রণক্ষেত্রে জীবন দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী কিম্বা অন্য সম্প্রদায় হইতে এ আন্দোলন উত্থিত হয় নাই। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর আন্দোলন সমাজের উচ্চস্তর হইতেই নিম্নস্তরে আসিয়াছে। তাই কলিকাতাবাসী সমবেত মহিলাবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এ দিকে একটু মনোযোগ প্রদান করেন। কেননা তাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীগ্রামের ভগিনীগণ তাঁহাদিগকেই অনুকরণ করিবেন।

আজ আমি সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি যখন প্রতি পল্লীতে তাঁত চলিবে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের সন্তানগণ বৃথা আত্মমর্য্যাদার মোহে জীবনে শ্রেয়কে বরণ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। গৃহের আনন্দ বালক-বালিকাগণই বর্দ্ধন করে। ছোট ছোট বালিকাগণের নিপুণ নিষ্ঠায় যখন চর্‌কার সূতা প্রতি গৃহে তৈরী হইতে থাকিবে তখন সে সৌন্দর্য্য কি অনুপমই না হইবে! গৃহিণীকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়; কিন্তু কন্যাগণ প্রত্যেকে ঘণ্টায় ১।৷০ তোলা সূতা কাটিতে পারেন। প্রতিদিনে মাত্র এক ঘণ্টার উৎপন্ন ১।৷০ তোলা করিয়া ধরিলে বৎসরে ৪৫০ তোলা অর্থাৎ ৫।৷০ সের সূতা হওয়া বিচিত্র নয়। ১০।১২ নং সূতার ১২ ছটাকে একখানি বস্ত্র হইতে পারে। তাহা হইলে বৎসরে ১০।১২ খানি বস্ত্র তৈয়ার করা কষ্টসাধ্য নহে। বস্ত্র বুননের মজুরি অতি নামমাত্রই দিতে হয়। জোড়া-প্রতি পাঁচসিকা। কাজেই প্রতি সংসারে দৈনিক ১।৷০ তোলা সূতা প্রস্তুত হইলে বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিতে গৃহের উপার্জ্জকদিগকে এত বেগ পাইতে হইবে না। আপাততঃ তুলা খরিদ করিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু

মফঃস্বলবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এমন কে আছেন যিনি বলিতে পারেন তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে ১০।১৫টি রাম-কাপাসের বা গাছ-কাপাসের গাছ করিবার জমির অকুলান ? এই ভবানীপুর অঞ্চলেও অনেকেরই বাড়ীতে ১০।১২টী কাপাসের গাছের উপযুক্ত জমির অভাব নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মনোযোগের অভাব যথেষ্টই। আর কতদিন উদাসীন হইয়া থাকিব ? দেশে যে ভাত কাপড়ের শনি পড়িয়াছে তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না ? আজ দেশের জোলা তাঁতি লুপ্ত ব্যবসায় হইয়া ধ্বংসোন্মুখ।

এই মৃত বাংলায় প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আজ দেশের এই সঙ্কটে আমি মাতৃজাতিকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা হস্তে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। ইংলণ্ডের মহা সঙ্কট ও পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আগুয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নারী জাতির প্রেরণায় আবার আমাদের সাধনা সফল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কবি বলিয়াছেন—

"তোরা না করিলে এ মহা সাধনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলাকবি লিখিয়াছেন—

"রমণী-শকতি অসুর-দলনী,
তোরা নিরমিত কোন ধাতু দিয়া ?"

আজ হীনবীর্য্য দুর্ব্বল অসহায় বাঙালী জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মন বিষাদিত হয়। এই মরুভূমির আবার উর্ব্বরতা সাধন করিতে হইবে। মাতৃশক্তি জাগ্রত হইয়া দেশের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও আকাঙ্খা লইয়া বাংলা দেশের শক্তিস্বরূপিণী মাতৃজাতির প্রতি আমার নিবেদন যে তাঁহারা একবার জাগ্রত হউন। নিজের গৃহে ও পরিবারে তাঁহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সৃজন করুন। বেশীদিন নয়, ছয় মাসের সাধনাই এই ক্লান্তি দূর করিয়া নবজীবন আনয়ন করিবে। প্রতি গৃহে চরকা গৃহ দেবতার আসন গ্রহণ করিলে আবার আমরা বাঁচিব। যিনি অদৃষ্টে কত জাতির অভ্যুদয় ও পতন সাধন করাইলেন, তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ইতিহাসের বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যেন আমরা দেখিতে পাই। তিনি কঠিন বিচারকের নির্ম্মম ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে আমাদের সাধনানুরূপ সফলতাই প্রদান করিবেন। অল্পায়াসে অধিক লাভের দুরাকাঙ্খা আমরা করিব না, অকুতোভয় হইয়া কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি আমাদের আসিবেই। অন্তঃকরণে বিশ্বাস ও আশা লইয়া আমরা এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

# শ্রমের মর্য্যাদা বোধ

## বাঙ্গালীর পরাজয়

### ( ১ )

গত ৩০ বৎসর যাবত সর্ব্বসাধারণের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর ক্রমাগত ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। দেখিতেছি, বাঙ্গালী যুবক সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, পশ্চিমা, মাদ্রাজী বন্যাস্রোতের মত কলিকাতা সহর দখল করিতেছে, এমন কি সুদূর মফঃস্বল পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালী আজ সত্যসত্যই 'নিজবাসভূমে পরবাসী হবে।'

আনুপূর্ব্বিক কয়েকটি প্রবন্ধে * ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতেছি। প্রথমতঃ যাহা চোখের উপর প্রতীয়মান তাহারই দৃষ্টান্ত দিব

বর্ত্তমান জগতে রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে তিন চারি জন মহাশক্তিশালী পুরুষকে সমগ্র পৃথিবীর ভাগ্য বিধাতারূপে গণ্য করা যাইতে পারে—পর পর তাঁহাদের জীবন কাহিনী হইতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের বাল্য জীবনের সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা 'With a silver spoon in the mouth' লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, নিজের পুরুষকার এবং কর্ম্মবলেই পৃথিবীতে উচ্চপদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা তাঁহাদের বাল্যজীবনের কঠোর দারিদ্র্য এবং ভীষণ জীবন সংগ্রামের কথা লোক সমক্ষে বর্ণনা করিতে কখনও কোন প্রকার লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে বলেন "আমি জীবনে আজ সফলকাম হইয়াছি—অনেক দুঃখ কষ্ট এবং বিরুদ্ধ স্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করিয়াছি। কিন্তু এক দিনের তরেও আমার বাল্য জীবনের কথা ভুলিয়া যাই নাই। পরম সুখের দিনে সেই সকল কথাই আমার বেশী করিয়া মনে পড়ে। একদিনের কথা বলি—খুব ভোরে উঠিয়া আলুর ক্ষেত্রে ঝুড়ি লইয়া আলু তুলিতে গিয়াছি। সেদিন দারুণ শীত, চারিদিকে ভীষণ তুষারপাত হইতেছে। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় মুখ, হাত পা জ্বালা করিতেছে। কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, চোখ দিয়া প্রায় জল পড়িবার মত অবস্থা। কাজে একটু বোধ হয় ঢিলা পড়িয়াছে—এমন সময় পরিদর্শক আমার গালে ভীষণভাবে এক চড় মারিল। আমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এখনও আমার সেই দিনের কথা মনে হইলে বেদনা অনুভব করি। পার্লামেণ্ট হাউসে বসিয়াও আমার এই দিনের কথা প্রায়ই মনে হয়—সেই প্রহারের বেদনা যেন নূতন করিয়া অনুভব

---

* এই সম্বন্ধে অন্য দুইটি প্রবন্ধ অন্যত্র ছাপা হইয়াছে।

করি। এই সময়ের সুখের স্মৃতিও আমার আছে। দিনের কাজ শেষ করিয়া যখন দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম তখন আমাদের সঙ্গে রঙিন কাপড়ের পোষাক পরিয়া একটি মেয়ে ৩.৪ বৎসরের একটি ছেলের হাত ধরিয়া যাইত—তাহার কথাও আজ বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।"

"আমার বাল্যকালের আর একটি ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। কোন কারণ বশতঃ পাদরীগিরির চেষ্টা ছাড়িয়া এক ব্যক্তি লসিমাথের রাস্তায় ঠেলাগাড়ী লইয়া ছেঁড়া নেকড়া এবং হাড় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত ( বিক্রয়ের জন্য )—তাহার ঠেলাগাড়ীর সামনে একটি ফ্রেমে বই পাতা-খোলা-অবস্থায় পড়িবার মত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। হাড় গোড় বিক্রী, ছেঁড়া ন্যাকড়া বিক্রী হাকিতে হাকিতে সে পথ চলিত এবং সামান্য একটু অবসর পাইলেই বই পড়িত। ইহার কথা এত করিয়া মনে থাকিবার কারণ এই যে—সে আমার হাতে একদিন একটি বিশেষ বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে,—তুমি এই সব বই পড়তে ভালবাস নাকি?—আমি 'হা' বলাতে সে আমাকে একখণ্ড গ্রীক ভাষায় লিখিত হেরোডোটাসের ইতিহাস পড়িতে দিল। ইহার পর সে বেশ কয়মাস আমাকে নানা প্রকার পুস্তক দিয়া বহু সাহায্য করে। এই ব্যক্তি অবস্থার বৈগুণ্য জন্য বিদ্যালয় ছাড়িয়া ঠেলা-গাড়ী ঠেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, কিন্তু এই ভীষণ দারিদ্র্য এবং দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের পড়িবার অদম্য উৎসাহ দমন করিতে পারে নাই। অতি হীন কাজের মধ্যেও নিজের পড়িবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল।

ইটালীর বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা কর্ম্মবীর মুসোলিনীর দিন এক সময় কঠিন দারিদ্র্য এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে—এমন গিয়াছে যে ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পাগলের মত হইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল স্থির—লক্ষ্য ছিল ধ্রুব, তাই সকল কষ্ট, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আজ একটি প্রকাণ্ড রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। দেশের রাজাকেও আজ মুসোলিনীর কথা-মত চলিতে ফিরিতে হয়।

জীবনে মুসোলিনীকে কি প্রকার কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় তাহার দু-একটির দৃষ্টান্ত এই স্থানে দেওয়া হইল।

"মুসোলিনী" লোজানে আসিয়া প্রথমে কোন কাজই পান নাই; এবং জীবনধারণ করিবার মত কোন কাজের জন্য তাঁহাকে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল। কাজ পাইবার পূর্ব্বে তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এমনও হয় যে একবার পয়সার অভাবে তাঁহাকে অনেকের নিকট সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল, এবং আর একবার ৩৬ ঘণ্টা অনশনে থাকিবার পর তিনি সামান্য এক টুকরা রুটি পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়াছিলেন। রোসাটে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন রাত্রে মুসোলিনী এক বাড়িতে কয়েক জনকে অঙ্গনে বসিয়া খাইতে দেখিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর, সাহস করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের আর রুটি আছে কি?" হঠাৎ এইরূপ

একজন লোকের আবির্ভাবে সকলেই অবাক হইয়া গেল। মুসোলিনী বলিলেন, 'আমাকে এক টুকরা রুটি দিন।" কোন উত্তর নাই। অবশেষে গৃহকর্ত্তা এক টুকরা রুটি মুসোলিনীকে দান করিলেন। তিনি ধন্যবাদ দিয়া বাহিরে গেলেন। কেহ কোন কথা না বলিয়া কেবল এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দিতে দেখিয়া মুসোলিনী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন—তিনি এই রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য হাত উঠাইলেন, কিন্তু দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় তাঁহার উত্তোলিত হস্ত মুখে আসিয়া ঠেকিল! শেষকালে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সেই রুটি পথ চলিতে চলিতে খাইয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে ইটালীর অনেক সংবাদ পত্রে মুসোলিনীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি পিয়োত্রোনাভে নামে বের্গামোবাসী একজন গৃহনির্ম্মাতা লিখিয়াছেন।

"এই সময়ে মুসোলিনী কাজের অন্বেষণে লোজানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন একদিন সকালে আমার স্ত্রী বাজার হইতে কিছু জিনিষপত্র কিনিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় একটি পুলের উপরে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত এক যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি ইটালিয়ান?' আমার স্ত্রী বলিলেন, 'না আমি বের্গামাস্কা।' এই কথা শুনিয়া যুবকটি অল্প হাসিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমি কাজ খুঁজছি, আপনি কি আমায় এমন কোন লোকের কাছে পাঠাতে পারেন, যিনি আমায় কোন কাজ দিতে পারেন?' এই কথা শুনিয়া যুবকটিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; আমি তখনই তাহাকে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিয়া পরদিন হইতে আসিতে বলিলাম"।

সুইটজারলাণ্ডে শীত খুব বেশী বলিয়া শীতকালে সেখানে গৃহ নির্ম্মাণ কাজ বন্ধ থাকে। মুসোলিনী এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ক্লাসে যাইতেন, কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের কাজ একেবারে ছাড়িতেন না। তিনি কোনও দোকানদারের অধীনে কুলির কাজ লইয়া মালপত্র খরিদ্দারের বাড়ীতে বহন করিতেন; ইহাতে তাঁহার যে আয় হইত তাহা হইতে তিনি খাবার খরচ ও পড়াশুনার খরচ চালাইতেন।

রুসিয়ার রাষ্ট্র অধিনায়ক ও সর্ব্বেসর্ব্বা ষ্টালিন ( Stalin ) বাল্যকালে তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসায়—জুতা-সেলাই অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। কিন্তু অবসর পাইলেই পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। আমেরিকার ভূতপুর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট হুভারও বাল্য-জীবনে ঘোড়ার সহিসগিরি করিয়া দিন গুজরাণ করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-পাঠে দেখা যায়—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে সকল মহামানব সামান্য অবস্থা হইতে সংগ্রামের পর সংগ্রাম করিয়া জীবনে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অতি অসম্ভব দুঃখ কষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজের পথ হারান নাই—সকল অবস্থাতেই তাঁহারা পূর্ণ আশা ও উদ্যম লইয়া কাজ করিয়াছেন। সামান্য বাধাবিপত্তিতে যাহারা নিরাশ হইয়া স্রোতে গা ভাসায়, তাহারা জীবনে কখনও সাফল্যলাভ করে না। উপরে

যে কয়জন কর্ম্মবীরের কথা লেখা হইল তাঁহারা যদি সংগ্রামে পশ্চাদপদ হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদের নাম, আমরা দূরের কথা, তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের লোকেরাও শুনিতে পাইত না। যুগের পর যুগ ধরিয়া যে বিস্মৃতির পথে অগণিত মানব-স্রোত চলিয়া গিয়াছে—তাঁহারাও সেই স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন।

বাঙ্গালীকে যদি আজ দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে 'বাংলা দেশে বাঙ্গালীর স্থান যে কোথায় তাহা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। আজ সকল রকম ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলা দেশে অবাঙ্গালীর হাতে—বাঙ্গালী আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র। বাঙ্গালী আজ 'বাবু' বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙ্গালী অপমান বোধ করে। কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙ্গালী ভয় পায়। ইহার ফলে বাংলা দেশে আজ বাঙ্গালী কুলী, মজুর, কারিগর, রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্রি, কলের কুলী, ইত্যাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই সমস্ত কাজে বাংলা দেশে এখন শত করা ৯০ জন অবাঙ্গালী বাংলার টাকা নিজের দেশে লইয়া যাইতেছে। আর বাঙ্গালী বিনা অন্নে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলা দেশে জনকয়েক উকীল মোক্তার ও জন কয়েক আপিসের বাবু ছাড়া আর অন্ততঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রবাসী—মাঘ—১৩৩৯

## শ্রমের মর্য্যাদাবোধ

### বাঙ্গালীর অন্নসমস্যায় পরাজয়

### ( ২ )

বিখ্যাত ধন কুবের ও দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগীর কথা আমি অনেকবার সাময়িক প৹ বিবৃতি করিয়াছি। তিনি বাল্যকালে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করেন এবং নিজে চেষ্টায় পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহকারখানার মালিক হন। তাঁহার জীব সংগ্রামের ইতিহাস পড়িলে কৌতূহলাবিষ্ট হইতে হয়। কোনরকমে অনেক চেষ্টার প তিনি একটি এঞ্জিন্ চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে যে কেবল 'ফায়ারম্যান'এ কাজ করিতে হইত তাহা নয়,—নেকড়া ও তৈল দিয়া পিতলের অংশগুলি পরিষ্কার করিতে হইত। বলা বাহুল্য, তিনি সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন বাড়ী ফিরি আসিতেন তখন চেহারা ভূতের মত কালো। সাবান দিয়া পরিষ্কৃত হইলেও খাইবা সময়ে পিতল-মিশ্রিত তেলের গন্ধে তাঁহার বমি আসিত। প্রথম সপ্তাহে যখন মা তিনি-চার টাকা মজুরী পাইলেন তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আত্ম চরিতে বলিতেছেন, "আমি ভাবী জীবনে তাহার পর বহু কোটী টাকা রোজগা

করিয়াছি? কিন্তু সেদিন আমার পিতার হাতে প্রথম সপ্তাহের রোজগার স্বরূপ উপরি-লিখিত পারিশ্রমিক অর্পণ করিতে পারিলাম, সেই দিন স্বতঃই আমার মনে হইল যে, এখন আর আমার দরিদ্র মা-বাপের উপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ভরণ-পোষণের ভার এখন আমি নিজেই গ্রহণ করিতে সক্ষম।" ইহাই প্রকৃত পুরুষকারের লক্ষণ। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রমজীবিদিগের পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের শিক্ষার জন্য কার্নেগী প্রায় দেড়শত কোটী টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার নাম The **Empire of Business** অর্থাৎ "ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য"। তাহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম:–
"It is well that young men should begin at the beginning and occupy the most subordinate positions. Many of the leading businessmen of Pittsburg had a serious responsibility thrust upon them at the very threshold of their career. They were introduced to the broom, and spent the first hours of their business lives sweeping out the office."

—"নিম্নতম অবস্থা বা চাকরী হইতে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করা সাধারণ যুবকদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। Pittsburg এর অনেক প্রধান ব্যবসায়ী লোককে তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রাক্কালেই গুরুতর দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল। তাহাদিগকে ঝাড়ুদারের কাজ করিতে হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী জীবনের দৈনিক প্রথম কয়েক ঘণ্টা আফিস ঘর সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইত।"

আর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করিতেছি। ইনি নিগ্রোজাতীর কর্ম্মবীর বিখ্যাত বুকার-টি ওয়াসিংটন। আমেরিকায় নিয়ম আছে, যদি কোন ছাত্র গ্রীষ্মকালে, যখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে তখন, সম্মার্জ্জনী হস্তে সমস্ত ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে তাহা হইলে মজুরী স্বরূপ অবকাশের পর বিনাবেতনে সেখানে পড়িতে পায়। দারিদ্র্য-নিপীড়িত বুকারের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি কপর্দ্দকশূন্য। একদিন তিনি হাম্পটনের বিদ্যামন্দিরে সেখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া হাজির হইলেন। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ—"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাদের যোগ্য ছাত্র বলিয়া বিবেচনা করিলেন বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন—এ একটা সং—ছেলেখেলা করিতে আসিয়াছে। আমি তাঁহার আশেপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল আমাকে ভর্ত্তি করিলে ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না।

কয়েক ঘণ্টা পরে শিক্ষয়িত্রী আমার পরে সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওখানে ঝাঁটা আছে, ওটা লইয়া পাশের ঘর পরিষ্কার কর ত।"

"আমি বুঝিলাম, ইহাই আমার পরীক্ষা। রাফ্‌নার পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা, আমি মহানন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম।"

'ঘরটা একবার, দুইবার, তিনবার ঝাড়িলাম। একটা নেকড়ার ঝাড়ন ছিল,—তাহা হইতে ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালে, আশেপাশে, অলিগলিতে যেখানে যেটুকু ময়লা জমিয়া ছিল সমস্তই পরিষ্কার করিলাম। বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আসবাবই ঝাড়িয়া চক্‌চকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম যে ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও 'ইয়াঙ্কি' ( আমেরিকান ) রমণী। তিনি খুঁটি-নাটি সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া দেখিলেন, ময়লা কিছুই নাই। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন—চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু বাহির হয় কিনা। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, ছোকরা বেশ কাজের।" আমি পাশ হইলাম।

হ্যাম্পটনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকর্ত্রীর নাম ছিল কুমারী মেরী এফ্‌ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটি খানসামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত। খুব সকালে উঠিয়া বাড়ির আগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। উনুন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম।

*"হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বহির্দৃশ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্ ম্যাকি আমার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও ও উৎসাহে আমি সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠনকর্ত্রী বিবেচনা করিয়া থাকি।"*

ইংলণ্ডের নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্ত্তা জোশিয়া চাইল্ড প্রথমে ঝাড়ুদার হইয়া একটি সওদাগরের হৌসে প্রবেশলাভ করেন এবং ক্রমশঃ নিজের প্রতিভাবলে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন। দরকার হইলে ঐ প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আজকাল জার্ম্মান দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা য়্যাডলফ হিটলার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। তাঁহার এক জীবনচরিতে পড়িতেছি যে, বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মিউনিক নগরে অন্ন চিন্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে একটি কাজ জুটিল।

"He became a builders' labourer. His function was to cart the rubbish away. He had to get up before the sun. When the whistle

signalled noon he dropped the wheel barrow, drank his bottle of milk and ate his black bread."—

"তিনি একটি রাজমিস্ত্রীর নিকট মজুরের চাকরি পাইলেন। তাঁহার কাজ ছিল ঠেলাগাড়ী করিয়া দূরে রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া। তাঁহাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে হইত। যখন বাঁশীর ধ্বনি জানাইয়া দিত যে, দুপুর হইয়াছে, তিনি তখন তাঁহার মাল-চালান হাত গাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া বোতল হইতে দুধ পান করিতেন এবং তাঁহার কাল রুটি খাইতেন।"

রামজে ম্যাকডেনাল্ড, মুসোলিনী, ষ্টালিন প্রভৃতির ন্যায় ইনিও পুস্তককীট ছিলেন। "Reading history was Adolf's great passion—he was a voracious reader of popular histories, when he was barely thirteen."

"ইতিহাস পাঠে য়্যাডল্‌ফের ভীষণ আসক্তি ছিল। মাত্র তের বছর বয়সের সময় হইতেই তিনি সাধারণের বোধগম্য ইতিহাসের বইগুলি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।"

আর একজন ঝাড়ুদারের কথা বলি। লর্ড রেডিং য়খন প্রথমবার কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি 'ক্যাবিন বয়' হইয়া আসেন। 'ক্যাবিন বয়' মানে এই যে, তাঁহাকে আরোহীগণের ভৃত্য হইয়া জাহাজের ক্যাবিন ( বৈঠকঘর ), সেলুন প্রভৃতি ঝাড়-পোঁছ এবং আরোহিগণের জুতা বুরুশ পর্য্যন্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য লর্ড রেডিং যখন দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন তখন আসিলেন রাজপ্রতিনিধি ( Viceroy ) হইয়া।

এখন আমাদের শ্রীমান্‌দের কথা বলিতেছি। তাঁহারা কলেজে এমন কি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়িলেই ঝাড়ু হাতে করা কিংবা হাটবাজার করা মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। কলেজের কোন যুবককে যদি বাজার হইতে হাতে তরিতরকারীপূর্ণ চুবড়ী ও খারাইতে মাছ আনিতে বলা হয়—অবশ্য সঙ্গে চাকর না থাকিলে—তাহা হইলে তিনি বিভ্রাটে পড়েন। পাড়াগাঁয়েও দেখা যায়, সাবেক কালের গৃহস্থগণ নিজেরাই হাটবাজার করেন—কারণ কয়জনের বাড়ীতে চাকর আছে? কিন্তু স্কুলের উচ্চশ্রেণীর শ্রীমানেরা তাঁহাদের বাপখুড়ার ন্যায় ঐ সকল কাজ করিতে নারাজ। আর কলেজের ছাত্রের ত কথাই নাই। আজকাল পাড়াগাঁয়ে শতকরা ৯৫ জন লোকের দুধ জোটা ভার। অবশ্য ইহার একটা কারণ এই যে, গোচারণের মাঠ নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাট আবাদের কল্যাণে সমস্ত পড়োজমি বিলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যে দুধের দুর্ভিক্ষ ইহার অপর একটি কারণ আছে। যাঁহারা সাবেক কালের লোক—বিশেষতঃ বৃদ্ধ মহিলা—তাঁহারা গো-সেবা হিন্দু ধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং নিয়মিত গোয়াল পরিষ্কার করা দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ মনে করিতেন। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার জ্ঞাতিসম্বন্ধে একজন ঠাকুরমা—যিনি তাঁহার বাস্তুভিটায় একমাত্র বাসিন্দা—প্রায়ই আমাকে সরসহ একবাটি দুধ আনিয়া উপহার দিতেন। আমাদের নিজ পৈতৃক বাটীতেঅনূ্যন পনের বিঘা ডাঙ্গা ফাঁকা জমি আছে।

কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায়ই দুগ্ধ পান করিতে পাইতেন না—নেহাৎ কোলের শিশুদের জন্য যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা ঠাকুরমা দুধ সরবরাহ করিতে পারিতেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি দিনের মধ্যে তাঁহার লম্বা দড়ি সংলগ্ন খোঁটা সরাইয়া নানাস্থানে বাঁধিয়া গাভীটি চরাইতেন। এতদ্ভিন্ন যত ভাতের ফেন, তরকারীর খোসা এবং ঢেঁকিশালে ধানভানা হইলে পরিত্যক্ত চাউলের কুঁড়া—এ সমস্ত তিনি যত্ন সহকারে গাভীটিকে খাওয়াইতেন। আমার আত্মচরিতে আমার মাতা ঠাকুরাণী কি প্রকারে গো-সেবা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছি। এখনও প্রাচীনরা এই প্রকার গো-সেবা করেন। কিন্তু যদি ঠাকুরমা বা দিদিমা পীড়িতা হইয়া পড়িলেন, তবে আর রক্ষা নাই। যদি বাড়ীর ছেলেকে বলিতেন—"বাবা, আমিত দেখিতেছ শয্যাশায়ী, গাইগরুর বড় দুর্দ্দশা, তুমি একটু গোয়ালের দিকে নজর দিও।" বলা বাহুল্য, শ্রীমান্ তাহা হইলে বোধ হয় বড়ই সঙ্কটাপন্ন ও কষ্টসাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যান। গোমূত্রাদিতে হাত দেওয়া তাঁহাদের নিকট অপমানজনক।

'কলেজ অব সায়েন্সে' আমার সঙ্গে নিয়তই আট দশজন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র অবস্থিতি করেন। চৌতালায় যে প্রকাণ্ড চিলের ঘর আছে, সেখানে হু হু করিয়া দক্ষিণে হাওয়া প্রবাহিত হয়। ঘরটি এমন প্রশস্ত যে, পাশাপাশি তিনখানা তক্তপোষ পড়ে। এখানে পাঁচ ছয়জন ছাত্র অবস্থান করেন এবং সিঁড়ির নীচে অপর অপর স্থানে দুই তিন জন থাকেন। ইঁহারা মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত; কেহ কেহ বা 'ডক্টর অব সায়ান্স'এর প্রয়াসী। একদিন ইঁহাদের মধ্যে একজনকে এণ্ড্ কার্ণেগীর উপরি লিখিত বিবরণটি পড়াইয়া শুনাইলাম, এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম "বাপু হে,—আমার নিজের ঘরটি তুমি এই প্রকার ঝাড় দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।' দেখিলাম শ্রীমান্ মুখ কাঁচুমাচু করিতেছেন। কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথম দিন কোন রকমে একটু ঝাঁটা বুলাইলেন। দ্বিতীয় দিন আরও অনিচ্ছার সহিত নিয়ম রক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিনও দেখিলাম যে ময়লা বাহির না করিয়া কোথাও বা আলমারীর নীচে, কোথাও বা তক্তপোষের পায়ার ফাঁকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বেগতিক দেখিয়া বলিলাম—"বাপু, আর দরকার নাই, এখন হইতে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।" শ্রীমানেরা যে চৌতালায় থাকেন সে তক্তপোষের নীচে এক পরদা ধূলা সর্ব্বদাই জমায়েত থাকে এবং খবরের কাগজগুলি সিঁড়ি ও ছাদের নীচের চারিদিকে বাতাসের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু তাই নয়, খাবার খাইয়া শালপাতাগুলি ছাদে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ তক্তপোষের এক হাত তফাতে আলিসা আছে—তাহার বাহিরে ফেলা ভয়ানক আয়াস-সাধ্য!—ঐটুকু ঘটিয়া ওঠে না। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে এই বিশাল-ছাদে আধ ঘণ্টা কাল বেড়াই। তখন আমার প্রধান কাজ হইতেছে ঐ কাগজ ও শালপাতাগুলি অপসারিত করা, কারণ ঐ গুলি নর্দ্দমার মুখে আটকায় এবং বৃষ্টির পর জল-নিকাষের পথ বন্ধ করে।

আমি ইদানীং 'প্রবাসী' ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় বাঙালীর অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছড়াইতেছি এবং গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর যাবত ছড়াইয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক এক সময়ে মনে হয় যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি।

অন্নসমস্যায় যে বাঙ্গালী অ-বাঙালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে, ইহার প্রধান কারণ এই—অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বাঙালীর যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি, অর্থনৈতিক হিসাবে বাঙালী যে মাড়োয়ারী দ্বারা পরাজিত হইয়াছে—তাহার প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা। এখনও শত শত মাড়োয়ারী প্রতি বৎসর লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এবং দিনান্তে প্রকৃতপক্ষে ছাতু খাইয়া সামান্য রকমে ব্যবসা স্থরু করে এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে নিজে দোকানদার, এমন কি গদিয়ানী হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে।

---

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৩০

# বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জ্জন

## ( আলোচনা )

বসন্ত-সংখ্যা 'প্রকৃতি' (১) পাইবামাত্র পাতা উল্‌টাইয়া গেলাম। শেষভাগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত (২) ঋষিপ্রতিম পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ কি প্রকারে বিহঙ্গজাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কিছু বিবরণ দিয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন, "কিন্তু বনের পাখীর সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের এই সখ্যভাবের তুলনা আর কোথায়ও মিলে কি? বাস্তবিক অকপট স্নেহ, যত্ন ও সৌজন্য দ্বারা পশু পক্ষীকে সহজেই বশীভূত করা যায়। ইতর প্রাণীর সহিত মানুষের যেন চির-বৈরীতা। বন-জঙ্গলের ভিতর মানুষ দেখিলেই পশুপক্ষীর মনে স্বভাব স্থলভ ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাহারা চারিদিকে উড়িয়া যায় বা ছুটাছুটি করে। অমর কবি কালিদাস তপোবনের যে অতুলনীয় চিত্র দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইতে দুই একটি দৃশ্য পাঠকগণের সমক্ষে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) প্রকৃতি—২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
(২) অধুনা পরলোকগত।

রাজা—সূত! চোদয়াশ্বান্। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনীমহে—

কিং ন পশ্যতি ভবান্ ইহহি
নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখাদ্‌ভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধা কচিদিঙ্গুদী-ফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

অর্থাৎ—তপোবনের বিশেষত্ব এই যে, মৃগগণ রথের শব্দ শুনিয়া ও বিশ্বাসভরে কেবল মাত্র কান পাতিয়া শব্দ শুনিতেছে, কিন্তু পলায়ন তৎপর হইতেছে না,—এবং

নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দং মন্দং চরন্তি।

তপোবনের সান্নিধ্যে আসিয়া রাজা দুষ্মন্ত পুনরায় সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

গাহন্তাং মহিষানিপান সলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং,
ছায়াবদ্ধ কদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিস্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে,
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ॥

বিখ্যাত মার্কিণ দেশীয় দার্শনিক ও প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ থোরো (Naturalist Thoreau) বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক (material) সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণ ও বীতস্পৃহ হইয়া সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জঙ্গলে বাস করিতেন। তিনি পশুপক্ষীর অভ্যাস রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্র, জীবন-যাপনের প্রথা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। কি প্রকারে তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইবেন ও তাহাদের আশঙ্কা দূর করিবেন, ইহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রনাথেরই পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শুকপক্ষী তাঁহাকে দেখিলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন তৎপর হইত। কিন্তু অসামান্য সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। তাহার এই নিস্পন্দ ও নিশ্চল অহিংসভাব দেখিয়া জীবগুলির কৌতূহল বাড়িতে লাগিল—প্রথমে একটু একটু কাছে আসিয়া পলাইত বা হটিয়া যাইত, ক্রমে তাহাদের সাহস জন্মিল। থোরোর বন্ধু বিখ্যাত মার্কিণ দেশীয় দার্শনিক Emerson লিখিতেছেন :—

"The other weapon with which he conquered all obstacles in science was patience. He knew how to sit immovable, a part of the rock he rested on, until the bird, reptile, the fish which had retired from him, should come back and resume his habits, nay, moved by curiosity, sh[illegible] come to him and watch him."

অর্থাৎ ভালবাসা, করুণা ও দাক্ষিণ্য ইতর প্রাণিগণকেও মুগ্ধ এবং বশীভূত [illegible]

---

* প্রকৃতি তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

# সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ

## ( আলোচনা )

বসন্ত সংখ্যার 'প্রকৃতিতে' জাভাগণ্ডারের বিলোপ পাঠ করিয়া আমার নিজের অভিজ্ঞতামূলক চোখের দেখা বাঙলা দেশ হইতে গণ্ডারের কি প্রকারে অস্তিত্ব বিলোপ হইল পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহার দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক—এই ধরণী পৃষ্ঠে যুগ-যুগান্তরে, এমন কি কোটী বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত জীব বিচরণ করিত, তাহাদের অখণ্ডনীয় নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। ভূবিদ্যার অন্তর্ভূত 'Palæontology' নামক শাস্ত্রে এই বিষয়ের অদ্ভুত রহস্য-চর্চ্চা হইয়া থাকে। মোটামুটি এক কথায় বলিতে গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে জীবের প্রাণধারণে বাধা পড়ে—কখনও কখনও বা ঋতুর হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ঐ সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব হওয়ায় জীবের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়।

বড় বেশী দিনের কথা নয়—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলিতেছি। সাইবেরিয়া দেশে ম্যামথ্ (Mammoth) নামক এক প্রকার লোমশ হস্তী ছিল, যাহাদের গজদন্ত দুইটি সম্মুখে বক্রভাবে প্রসারিত। ইহারা দলে দলে গভীর জঙ্গলে বিচরণ করিত। হঠাৎ ঋতুর এমন পরিবর্ত্তন হইল যে, সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগ আলাস্কা পর্য্যন্ত গভীর তুষারাচ্ছন্ন হইল। এই অতর্কিত নৈসর্গিক উৎপাতে সমস্ত হাতীর পাল বরফে চাপা পড়িল। মাঝে মাঝে বরফ গলিয়া ইহাদের মৃতদেহ বাহির হয় এবং ইহাদের তাজা রক্তমাংস নেকুড়িয়া বাঘে খায় এবং গজদন্ত বহুল পরিমাণে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। কোন কোন জীববিৎ বলেন—Mammoth মানুষের সমসাময়িক (Co-eval with man)। যখন Pilgrim Fatherগণ আমেরিকায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে লাগিলেন, তখন সে মহাদেশ নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন ও হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ছিল। কেবলমাত্র রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ এই আবেষ্টনের ভিতর বাস করিতে পারিত। কিন্তু যেমন বিশাল বৃক্ষের আওতায়, তার ত্রিসীমানায় অন্য কোন ছোট গাছ জন্মিতে পারে না বা রোপিত হইলে শুকাইয়া যায়, সেই প্রকার সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে আমেরিকার আদিম বাসিগণ লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি জঙ্গল রক্ষা (Preserve) করিয়া নমুনাস্বরূপ ইহাদের কোন কোন জাতির অস্তিত্ব মাত্র বজায় রাখিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার সীমাস্থ New Zealand দ্বীপে Maori নামক অসভ্য জাতিরও এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। মাত্র আড়াইশত বৎসরের কথা বলিতেছি। মরিসস্ দ্বীপের জঙ্গলে Dodo নামক পারাবত জাতীয় একপ্রকার পাখী বহুল পরিমাণে ছিল; কিন্তু যেদিন ইউরোপীয়গণ তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে তাহাদের ধ্বংসের

পথ পরিষ্কার হইল। ইহারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, উড়িবার শক্তি ইহাদের বিশেষ ছিল না। ঘাসের ভিতর বাসা করিয়া মাত্র একটি ডিম পাড়িত। আরও অপরাধ ইহাদের মাংস অতি সুখাদ্য; কাজেই শিকারিগণ বন্দুক লইয়া ইহাদিগকে গুলি করিতে লাগিল। এইজন্য ইহাদের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইল।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—আমাদের বাড়ী খুলনা জেলায় সুন্দরবনের সন্নিকট ছিল। ছিল বলিতেছি—কেননা ক্রমান্বয় সুন্দরবন আবাদ হইয়া যাইতেছে। বাল্যকালে আমরা যখন কলিকাতার পথে হাসনাবাদের আবাদ অতিক্রম করিয়া সুলকুনির খালে প্রবেশ করিতাম, তখন পিতাঠাকুরের নিকট শুনিতাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে সেখানে বাদা ছিল এবং নৌকা হইতে সময় সময় বাঘ দৃষ্টিগোচর হইত। সুলকুনির খাল অতিক্রম করিয়া আবাদ ভবানীপুরে পড়িতাম এবং তাহার পরেই হেলেঙ্কার আবাদ। আমার বাল্যকালে যদিও সেখানে গুণ টানিবার রাস্তা ছিল, তথাপি মাঝি মাল্লারা অনেক সময় ভয়ে ডাঙ্গায় উঠিত না। সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং বানরগণ ঝাঁকে ঝাঁকে এক গাছ হইতে আর এক গাছে লাফালাফি করিত। সুদীর্ঘ তৃণগুলি বিনা বাতাসে নড়িতেছে—সময় সময় নৌকা হইতে দেখা যাইত, তখন মাঝি আমাদের কাণে চুপে চুপে বলিত—"বাবু, ঐ শেয়াল যায়।" এখানে বলা আবশ্যক যে, এখনও যাহারা সুন্দর বনে কাঠ কাটিতে যায় তাহাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন করিয়া "গুণী" থাকে; তাহারা মন্ত্র দিয়া বাঘ আসা বন্ধ করে। অবশ্য সময় সময় কাঠুরিয়াদিগকে ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয় মুখে করিয়া লইয়া যাইতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাহার এই সদুত্তর পাওয়া যায় যে, মন্ত্রপালনের জন্য যে যে নিয়ম রক্ষার দরকার তাহার ত্রুটি হইয়াছে। সে যাহাই হউক, বাদাবন অঞ্চলে বাঘ বলিলে লোকে বড়ই খাপ্পা হয়। তাহাদের মতে এই শব্দ উচ্চারণ করিলে অমঙ্গল হয় এবং ইহার পরিবর্ত্তে "বড় শিয়াল" ব্যবহার করা প্রথা। কিন্তু গত ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বেও হেলেঙ্কা হইতে সুন্দরবন এত তফাৎ পড়িয়া গিয়াছে যে, সেখানকার ত্রিসীমায়ও বাঘের গতিবিধি নাই। অবশ্য এখন সরকারি ফরেস্ট বিভাগ (Forest department) অনেক স্থান সংরক্ষণ করিতেছেন। উহাকে Reserved forest বলে। তাই সুঁদুরের গাছ এবং বাঘ এখন বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু গণ্ডারের সম্পর্কে এ নিয়ম খাটে না। বাঘ বিড়ালজাতীয় এবং "বিড়ালের মাসী" বাঘিনী মাত্র চৌদ্দ-পনর সপ্তাহ গর্ভধারণ করিয়া সচরাচর দু'টা হইতে পাচটা শাবক প্রসব করে; কখন কখন ছুইটা পর্য্যন্তও বাচ্ছা হও। ইহারা অতি সংকীর্ণ স্থানে ও সংগোপনে লুকাইয়া থাকিতে পারে ও অনেক দূর দৌড়াদৌড়ি করে এবং সন্তরণক্ষমও বটে। কিন্তু গণ্ডারের স্বভাব এই যে, ইহারা লুকোচুরি বোঝেনা। যখন একবার 'রোক' করিবে, কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া জিদ্ করিয়া অগ্রসর হইবে। গণ্ডারী আঠার মাস (কাহারও কাহারও মতে নয় মাস) গর্ভধারণ করিয়া মাত্র একটি শাবক প্রসব করে।

বাল্যকালে সুন্দরবনে শিকারীগণ প্রায়ই হরিণের মাংস এবং কদাচিৎ গণ্ডারের মাংস আনিয়া আমার পিতাকে উপহার দিত। আমার বেশ মনে আছে হরিণের মাংসের ন্যায় কোমল না হইয়া গণ্ডারের মাংস বড়ই শক্ত বোধ হইত। গণ্ডারের মাংস শাস্ত্রমতে পবিত্র এবং আমাদের বাড়ীতে গণ্ডারের খড়্গ পাথরে ঘষিয়া চন্দনের ন্যায় প্রলেপস্বরূপ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং গণ্ডারের চামড়ায় তৈয়ারী নানা রকমের ঢাল ছিল। কিন্তু এখন গণ্ডার সম্পর্কীয় কোন দ্রব্য প্রাচীন বনিয়াদী ঘরে কদাচিৎ মিলে। গণ্ডার এখন সুন্দরবনে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার অগ্রজ পরলোকগত নলিনীকান্ত রায় সুন্দরবন অঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই সাক্রেৎ সহ ৫।৭টা বন্দুক চড়াও করিয়া সুন্দরবনের ভিতর প্রবেশ করিয়া হরিণ এবং কখন কখনও বাঘ শিকারে শীতকালে যাইতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে এখন গণ্ডার লুপ্ত হইয়াছে। তিনি অনেকবার গণ্ডারের তল্লাস করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। *

# বিজ্ঞানসভা—পুরাতন ও নূতন

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় স্বাধীনচেতা, তেজস্বী, বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশ-বৎসল পুরুষ বাঙালীর মধ্যে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তাঁহার জীবনচরিত আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

বিজ্ঞান-সভার ইতিহাস বর্ণনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান-সভাটি বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহাই অনুরুদ্ধ হইয়া বিবৃত করিব মাত্র। যে উদ্দেশ্যে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা যে আংশিকভাবেও সফল হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। সভা সংস্থাপনের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সুলভ প্রচার, দ্বিতীয়তঃ—মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ প্রদান। দুই চারি জন অধ্যাপক স্ব স্ব বিদ্যালয়ে প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টাকাল শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রমক্লিষ্টদেহে ও মনে বিজ্ঞান-সভায় আসিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পুনরাবৃত্তি করিলে জন-সাধারণের যতদূর বিজ্ঞানানুরক্ত হওয়া সম্ভব তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

* "১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বেও গণ্ডার হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যে মারিয়াছে সে জীবিত নাই। তৎপরে আর গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঢাকী ফরেষ্ট ষ্টেশনের সন্নিকটে পালিয়ানের আবাদে কালাচাদ শিকারী ছিল। সে শেষ গণ্ডার হত্যা করিয়াছিল। তাহার পুত্র ওমর শিকারী জীবিত আছে। রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী ১৮৮৫ অব্দে শেষবার স্বচক্ষে গণ্ডারের পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন।" যশোহর-খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড, ৯৫।৯৬ পৃষ্ঠা)।

ইহাতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ আরম্ভ যে লঘুক্রিয়াতে পরিণত হইবে, তাহাতে কি আর বিচিত্রতা আছে? সভার প্রত্যেক বার্ষিক অধিবেশনে ডাক্তার সরকার দেশের ধনকুবেরগণের নিকট অর্থভিক্ষার জন্য ক্রন্দন করিতেন এবং অর্থাভাবে যে বিজ্ঞান-সভা ফলপ্রসূ হয় নাই তাহাই করুণকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। কিন্তু নিরর্থক শোক প্রকাশ না করিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত অর্থ কিরূপে নিয়োজিত হইলে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলে ভাল হইত। দেড়লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ হইতে প্রাপ্য সুদের টাকা এবং অন্যান্য প্রকারে সভার সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক আয় ৮০০০।৯০০০ হাজার টাকা—কার্য্যের গুরুত্ব হিসাবে বিজ্ঞান-সভার এই আয়—যে যৎসামান্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক মহৎকার্য্য এইরূপ সামান্য আরম্ভ হইতেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। সভাস্থাপনের প্রারম্ভ হইতেই যদি দুই একজন লোকও মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সভাস্থাপনের উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হইয়াছে, একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারিত?

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা কেবল উপাধিধারী মাত্র। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের স্ব স্ব বিভাগে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই পথ অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানশিক্ষা ফলপ্রসূ হয় নাই। আমাদের বিজ্ঞান-সভা দেশের বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চ উপাধিধারী যুবকদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া মাসিক দুইশত টাকা হিসাবে দুইবৎসর কাল প্রাপ্যবৃত্তি প্রত্যেক বৎসরের একটি করিয়া নিজ আয় হইতে অনায়াসে প্রদান করিতে পারিত। ইহাতে অন্য কোন ফল না হউক, এতদিনে এই সকল লোক প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথা উপযুক্ত দিকে চালিত করিতে পারিতেন। ইহাদের মধ্যে দুই একজনও বিজ্ঞানসভার কল্যাণে মৌলিক গবেষণায় বিশেষ ফললাভ করিতে পারিলে কি কম গৌরবের বিষয় হইত? দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকেরা যদি স্বদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় হইতে সামান্য রকমেরও গবেষণা কার্য্য করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ কি বিদেশীয়েরা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিত যে, বাঙালীর মৌলিক বিষয়ে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। আজকাল আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহাতে কে বলিতে পারে যে, ডাক্তার সরকার যে পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন পুনরায় সেই পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না? বিজ্ঞান-সভা এতদিনে যদি সামান্য রকমেরও কোন ক[illegible] দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে বাঙালী নামের গৌরবের জন্য অনেকেই অকাতরে [illegible] দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না হইয়া, ডাক্তার সরকার প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসভার দ্ব[illegible] বাঙালী যে সাধারণের হিতকর কার্য্যে অপটু এইরূপ অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মা[illegible]

আজকাল অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যেরূপ আন্দোলন চলিতে[illegible]

তাহাতে আশা করি পুরাতন ও নূতন বিজ্ঞান-সভা একমত হইয়া কার্য্য করিলে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র বক্তব্য যে, কার্য্যকরী সভা নির্ব্বাচনের সময় যাহাতে উহা দেশস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দুইটি পৃথক বিজ্ঞান-সভা হইলে অর্থ ও সামর্থ্যের যে অপচয় হইবে, তাহা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।

বিষয়টি বড় গুরুতর। আমরা সমালোচনায় বিশেষ পটু। কিন্তু কাজে নামিতে হইলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। ব্যবসায় বলুন, বাণিজ্য বলুন, সভা বলুন, আর সমিতি বলুন, যেখানে পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা প্রয়োজন, সেইখানেই আমাদের 'গলদ' বাহির হইয়া পড়ে। বিবাদ বিসম্বাদে সমস্ত বলক্ষয় হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। মহৎ কোন উদ্দেশ্যের জন্য আত্মপ্রাধান্য লোপ করিতে আমরা জানি না। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে আজ জাপান জগতের পূজ্য ও আদর্শস্বরূপ; কিন্তু ভারত সত্য সত্যই ঘুমায়ে রয়।*

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১১

## বঙ্গীয় কংসবণিক সম্মেলন

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, সর্ব্বাগ্রে পরম করুণাময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করি—যাঁহার কৃপা ব্যতীত জগতে কিছুই সমাধা হয় না। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। কংসবণিক ভ্রাতাগণ আমার মত অন্য শ্রেণীর লোককে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছেন—ইহা তাঁহাদেরই উদারতার পরিচয়। আপনাদের সম্প্রদায়ে রায় কালীচরণ দত্ত বাহাদুরের ন্যায় স্বজাতি কুলতিলক থাকিতেও আমার মত সম্প্রদায়ের বাহিরের একজনকে এ রকম কাজে বরণ করায়,—আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। ইহা দেশাত্মবোধের প্রধান পরিচায়ক।

বর্ত্তমানে বাঙালী হিন্দুর মহা জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত। কিছুদিন পূর্ব্বে Colonel U. N. Mookerjeeর 'Dying Race' (ধ্বংসোন্মুখ জাতি) নামক গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় সকলের প্রাণে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আপনারা অনেকে বোধ হয় Census Report দেখিয়া থাকিবেন—যত হিন্দু মরে, তত মুসলমান মরে না। নদীয়া, যশোহর ও বৰ্দ্ধমান জেলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশী। তাই মনে হয় আর ৫০ বৎসর পরে হিন্দুজাতি একেবারে লুপ্ত হইবে। ইহার হাত হইতে নিস্তারের উপায় কি?

* ১৩৩০—৪ঠা কার্ত্তিক তারিখে রাণাঘাটে নিখিলবঙ্গ কংসবণিক সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা (কংসবণিক, ১৩৩০, ৩য় সংখ্যা।)

তাহা করিতে হইলে আমাদের জাতির শাখা প্রশাখাগুলির উন্নতি করিতে হইবে। সমাজের শাখা প্রশাখার সহিত Æsop's Fablesএর The Belly and other Members of the Body—এর তুলনা করা যায়। যেমন মুখ, দাঁত ও অন্যান্য অবয়বের কার্য্য বন্ধ হইলে, দেহের সবলতা কিছুই থাকে না, সেইরূপ সমাজ—দেহরূপ বৃহত্তম হিন্দুসমাজের শত শাখা-প্রশাখা—যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কংসবণিক ইত্যাদি—প্রত্যেকেই নিজ নিজ মঙ্গল সাধন করিলে, সমাজ-দেহ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনার নমঃশূদ্রগণ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ আত্মকলহ যে এক রকম আত্মহত্যা! তাঁহারা বুঝেন না যে, গৃহ বিবাদে বলক্ষয় হয় মাত্র —দুর্দ্দিনের সময় বাঁচিবার উপায় হয় না। ভাগীরথী নানা শাখা প্রশাখায় জল আনিয়া তাহাদের প্রবাহ বৃদ্ধি করে, যাহাতে সমস্ত শাখা প্রশাখার বলবৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

আপনাদের উদারতায় আমি বড়ই আনন্দিত। আপনারা এতলোক যে ত্যাগ, ক্ষতি ও কষ্টস্বীকার করিয়া এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা বড়ই আশাপ্রদ। রেলওয়ে ও ষ্টীমার ভ্রমণ বর্ত্তমানে বড়ই ব্যয় ও শ্রমসাধ্য। আমি বিগত চৌদ্দমাসে বিশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি। তাই জানি—আজকাল মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উহা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা বলিবার নহে।

কংসবণিক সম্প্রদায়ের অনেক কথা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয় পিতার বন্ধু দাঁইহাটের ৺রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান কালে অবগত হইয়াছিলাম। সেখানে একমাস ছিলাম। ফিরিবার সময়ে নবদ্বীপে আপনাদের স্বজাতি-কুলতিলক স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দেখিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা সিমলানিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় তারকনাথ প্রামাণিক আপনাদের জাতির গৌরব। তিনি দীন দুঃখীকে যেরূপভাবে অর্থদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দান অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। গুরুদাস বাবুও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ ব্যয়ও করিয়াছেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ তাঁহার বংশধরগণের অবস্থা আর তেমন নাই। দাতাকর্ণ তারকনাথের বংশধর (শ্রীরাখালচন্দ্র প্রামাণিক) অদ্যকার সভায় উপস্থিত আছেন। তারকনাথের জীবনের একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন আমার বাল্যাবস্থা। সে সময় সিমলা কাঁসারীপাড়ার সং বাহির হইত। একবার পুলিশ কমিশনার তাহা বন্ধ করিতে গিয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণদাস পাল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তারক বাবুর হইয়া অনুমতি লইয়াছিলেন।

অভ্যর্থনাসমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী বা থাকগুলির উচ্ছেদ সাধন। আমি একজন কায়স্থ। আমাদের কায়স্থ সম্প্রদায় শিক্ষিত হইলেও আমাদের মধ্যেও উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী রহিয়াছে—যেমন আপনাদের মধ্যে সপ্তগ্রামী, মামুদপুরী ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত গণ্ডীর মূলে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে

না। নদী শুকাইয়া যাইলে পূর্ব্বপুরুষগণ পদ্মাপারে যাইলেন, তাই নাম হইল 'বঙ্গজ'। অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাহাতে পরস্পর সামাজিক আদান প্রদান হয়, ইহার বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। হিন্দু বাঙালী যে ধ্বংসের পথে যাইতেছে, তাহার কারণ "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি।" আপনাদের সকল প্রতিনিধিই যখন এখানে আসিয়াছেন এবং আপনারা আপনাদের দুর্ব্বলতা যখন লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন সকলে চেষ্টা করিলে এরূপ মিলন অসম্ভব হইবে না।

এইরূপ সম্মেলনকে আমি মিলন-মন্দির বলিয়া মনে করি। সারদাবাবু ( জষ্টিস্ সারদা চরণ মিত্র ) যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তিনি সকল শ্রেণীর কায়স্থ একত্রীভূত কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি উত্তর পশ্চিমের সামান্য কায়স্থকে পর্য্যন্ত মিলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পদে অভিষিক্ত হওয়ার মত কেহই নাই। এখন আপনাদের উচিত সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বৃহৎ কংসবণিক জাতি গঠন করা। যে সমস্ত স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমিক এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই কাজ হইবে। যদি কোন কোন স্বজাতি-প্রেমিক দুই চারিটি ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন সমাজে করেন, তাহা হইলেই সমাজ সমস্যা মীমাংসা হইতে পারে। তিলি জাতির মধ্যে উত্তরপশ্চিম সকল বেড়া ভাঙ্গিয়া সর্ব্বত্র ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে কাশীমবাজারের মহারাজা, দীঘাপতিয়ার রাজা, রাণাঘাটের পাল চৌধুরী, দে চৌধুরী এবং ভাগ্যকুলের রায় বংশের ন্যায় ধনী থাকায় পরস্পর মিলনের অনেক সুবিধা হইয়াছে, এবং তাঁহাদের কথাও সকলে মানিয়া লইতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে এমন কেহই নাই, যাহার কথা আপনারা সকলেই মানিয়া লইবেন। কিন্তু নেতারা যদি চেষ্টা করেন, তবে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

আমরা কায়স্থ, আমরাও ঘরাঘরি প্রভৃতির জন্য উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি। দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছি। তাহার উপর আমি মৌলিক কায়স্থ—মুখ্য কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কুলের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না ইত্যাদি—সমস্তই যেন অদ্ভুত। কুল-মর্য্যাদা একটা প্রথা-মাত্র। ইহাতে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। দেবীবর ঘটক মেল বাঁধিয়া গেলেন। তিনি না মনু, না পরাশর। এ মেল বন্ধন না উদ্বন্ধন—স্তরে স্তরে ভেদনীতি। উচ্চ কণ্ঠে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া অবশ্য আমার সাধ্য নাই। তবে সঙ্কীর্ণতা যে হিন্দু-সমাজের ভিতর একেবারে মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম্মের Brotherhood of man অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব, Christian-দিগের চেয়ে বেশী। Christian-দিগের গির্জ্জায় ছোট ও বড়'র মধ্যে ঢের পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু মসজিদে বাদসাহই হৌন, আর ফকিরই হৌন, সকলেই পাশাপাশি উপবিষ্ট হইয়া নামাজ করেন। তাই আজ কোথায় প্রশান্ত মহাসাগর আর কোথায় আটলাণ্টিক মহাসাগর সর্ব্বত্রই ইসলাম। তাঁহারাই বাড়িতে চলিয়াছেন, আর হিন্দুর আজ কি শোচনীয় অবস্থা! পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দুমহাসভা স্থাপন করিয়াছেন—

হিন্দুসংগঠন করিবার জন্য। কিন্তু ইহা সংগঠন নহে, সংরক্ষণের চেষ্টা মাত্র। সকল জাতিই অগ্রসর হইয়া চলেছেন, কিন্তু কবি যেমন বলেছেন—"ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।"

"প্রাচীন শিল্পের উদ্ধার"—এই প্রশ্নের উত্তর বিশ বৎসর আগে আমার 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থে দিয়াছি। উহাতে "Decline of Technical Arts" নামীয় অধ্যায়ে এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের শিল্পধ্বংসের কারণ আমরা সময়ের সঙ্গে চলিতে পারি না। "You must march with the time."—ইহা একটি মূল্যবান কথা।

জনৈক প্রবন্ধ পাঠক বলিয়াছেন—কংসবণিক জাতি কাঁসা ধাতুর আবিষ্কার করেছেন। হইতে পারে কংসবণিক জাতি কাঁসার আবিষ্কার কর্ত্তা; কিন্তু সেই গৌরব লইয়া থাকিলেই চলিবে না। এক সময়ে ইস্পাত ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইত। Damascus sword ভারত হইতেই আরবে যাইত। Hardening of steel আজও ভারতে আছে, এবং বহুকাল পূর্ব্বে সাঁওতাল পরগণায় কোল ভীলদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহারাও বাঁশের চোঙ্গার ভিতর দুই এক সের পরিমাণে লৌহ তৈয়ার করিত; কিন্তু এক্ষণে Electric Processএ অল্প সময়েই যে কত সহস্র মন লৌহ প্রস্তুত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকায় কত বড় বড় কারখানা রহিয়াছে—তাদের মালিকগণ বড় বড় ধনী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে Copper King বলে। They are multi-millionaires. অনেক মূলধন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভিন্ন তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা কখনই সম্ভবপর নহে। কাশীপুর Ammunition Factory যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের আধুনিক প্রক্রিয়া কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন। Germanyর Krupps Factory প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় বিশ্বকর্ম্মা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইউরোপকে আশ্রয় করিয়াছেন। তামা বলুন, রাং বলুন, সমস্তই বিদেশ হইতে আসিতেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা হিসাবে তাহারা আমাদের শত্রু। আমিও এক হিসাবে আপনাদের শত্রু। কেননা পল্‌তার Bengal Enamel Worksএর আমিও একজন Director. Aluminium অপবিত্র বলিয়া হিন্দুরা পূর্ব্বে কিনিত না; কিন্তু উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলিয়া এবং মূল্যও খুব সস্তা বলিয়া তাহারও কাট্‌তি হইয়াছে। আমেরিকার Niagara Falls-এর তড়িৎ দ্বারা এক প্রকার মাটি হইতে উহা তৈয়ারী হইয়া এদেশে আসিতেছে। কারবারটাও যদি আপনাদের হাতে থাকিত, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা হিসাবে আপনাদিগকে দুর্ব্বল হইতে হইত না। জীওনলাল ভাটিয়ার সুবিস্তৃত কারবার মুগিহাটা হইতে রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে ছাইয়া পড়িয়াছে। বন্যা-পীড়িতের সাহায্যের জন্য আহম্মদাবাদের ভাটিয়া সওদাগরগণ অনেক টাকা সাহায্য করায় আমি তাঁহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা বাঙালীর জন্য কেন এত টাকা দিতেছেন, তাঁহারা হাসিয়া উত্তর করিলেন আমরা বাঙালীর নিকট হইতে যাহা পাই তাহার সিকি অংশও ফেরত দিই না। আহম্মদাবাদের ঐশ্বর্য্যও বাঙালীর কৃপায়। ১৯০৫ সালে যখন স্বদেশীর হাওয়া বাঙলায়, খুব জেগেছিল তখন শোলাপুর মিল

শতকরা হাজার টাকা ডিভিডেণ্ডও দিয়াছিল। উহার একজন ডিরেক্টর আমায় বলিয়াছিলেন—আমাদের অর্থের অধিকাংশই বাঙলা হইতে আসে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সঙ্গে ব্যবসা বুদ্ধি চাই। যাঁহার যেরূপ পেশা তাহা ভিন্ন অন্য পেশা অবলম্বন না করিলে আধুনিক অন্ন-সমস্যার দিনে কষ্ট পাইতে হইবে। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি Cook কোম্পানীর কত বড় আড়গড়া ছিল। A. Milton কোম্পানীরও ঘোড়ার ব্যবসা ছিল—কিন্তু এক্ষণে মোটরের অত্যধিক চলন হওয়ায় তাঁহারা ঘোড়া ছাড়িয়া Motor Garage খুলিয়াছেন। দেখুন তাঁহাদের adaptability (পরিস্থিতি—পরিবর্ত্তনীয়তা), কালানুগতা—they can march with the time.

আসল কথা শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন। বাঙলা দেশে শিক্ষার কি দুরবস্থা। বোধ করি শতকরা ছয় সাতজন লোক লেখাপড়া জানেন। বিদ্যাশিক্ষা কোন জাতি-বিশেষের একচেটিয়া জিনিস নহে। সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রতিভাবান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ন্যায় অপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রতিভাবান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন আপনাদের মধ্যে রায় বাহাদুর আছেন, তেমনি তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যেও কৃষ্ণদাস পাল, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ রসিকলাল দত্ত, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই স্বীয় প্রতিভাবলে যশস্বী হইয়াছেন। Grey বলিয়াছেন—"Full many a gem of purest ray serene." ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"।

গুণ কখন বংশগত হয় না। বিদ্যাসাগরের ছেলে কখনও বিদ্যাসাগর হয় না, কেশব সেনের ছেলে কেশব সেনের মত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। নৈকষ্য কুলীনও বর্ণজ্ঞান শূন্য হতে পারেন। Emerson যেমন বলিয়াছেন—"The talent is the Calling"—"Knowledge is power" অর্থাৎ "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"। বিদ্যাবুদ্ধিবলেই আজ জগৎ চালিত হইতেছে। পার্শিজাতি কেমন বাণিজ্যকুশল। E. B. Ry এর (বর্ত্তমানে B. A. রেলের) সোরাবজীর হোটেলের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহাদের management (ব্যবস্থা কুশলতা) কেমন সুন্দর। টাটা কোম্পানী বুদ্ধিবলে কত বড় ব্যবসা চালাইতেছেন। তাঁহাদের organisationই বা কি সুন্দর! আমরা বাঙালী, আমাদের সে সব adventure নাই। তাহা না হইলে লোটাকম্বলধারী মাড়োয়ারী আজ বাঙলা জয় করিয়া বসিবে কেন? বাঙলাদেশ যদি কেউ জয় করে থাকে—সে ঐ মাড়োয়ারী। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উন্নতির পথ বলিয়া আমার মনে হয় না।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহযোগে মাত্র ১৫০০ শত টাকা মূলধন লইয়া বালিগঞ্জে একটি Sulphuric Acidএর কারখানা খুলিয়াছিলাম। পর বৎসর অনেক টাকা লোকসান যাওয়ায় চন্দ্রবাবুর পরামর্শমত তাহার কয়েক বৎসর পরে

অধিক টাকা Capital লইয়া Bengal Chemical and Pharmaceutical Works স্থাপন করি। উহার কার্য্য এক্ষণে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, উহার মূলধন এক্ষণে ১।৹ লক্ষ টাকার স্থলে ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। Co-operative Societyর কর্ত্তা রায় যামিনী মোহন মিত্র বাহাদুর এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি একটু চেষ্টা করিলে সিমলা ভবানীপুর, দাঁইহাট, লোহগঞ্জ, পালং, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের কংসবণিক শিল্পী ও শ্রমিকগণের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। Co-operative principlesএ পাইকারী খরিদ করিয়া যাহাতে জমা করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ভবানীপুর অঞ্চলের কংসবণিকগণ ভাল ভাল Surgical instruments প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমি ভূতনাথ বাবুর ( স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পালের পুত্র ) মুখে শুনিয়াছি বি. কে. পাল কোম্পানী অনেক টাকার জিনিস তাঁহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল স্থানে apprentice শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ফল বোধ হয় মন্দ হয় না। এখনও যথেষ্ট field আছে। এখনও চেষ্টা করিলে আপনাদের জাতীয় শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। এখনও আধুনিক প্রণালীতে কারখানা স্থাপন, Technical Scholarshipএর বন্দোবস্ত Apprentice শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এমন অনেক জিনিস প্রস্তুত হয়, যাহার একটু পরিবর্ত্তন করিলে অধিক কাট্‌তি হইতে পারে এবং এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত তাহার কাট্‌তি হইতে পারে। এই যে সম্প্রতি রায় বাহাদুর মিত্র বিলাত যাচ্ছেন, তিনি চেষ্টা করলে আপনাদের জিনিসের সে দেশেও কাটতি করিয়ে দিতে পারেন। হিন্দু সমাজ থাকিতে পিতল কাঁসার লোপ হইবে না।

এত বলিবার এবং ভাবিবার আছে যে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পরিশেষে আমি রায় বাহাদুর কালীচরণ দত্ত মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন বাস্তবিকই তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। পত্রিকায় গোপীনাথ নন্দী লিখিয়াছেন—নিজে বড় হইলেই বড় হওয়া যায় না—দশকে আশ্রয় করিয়া যে বড় হয় সেই প্রকৃত বড়। রায়-বাহাদুরও আজ সেই আদর্শে চালিত হইয়াছেন।

আমার শেষ বক্তব্য আমার মত অধমকে আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আপনারা অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে আমার প্রার্থনা আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বল সঞ্চয় করুন—তাহাতে বৃহত্তম হিন্দুসমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

# ডিগ্রীর অভিশাপ

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং ছাত্রগণ, আমার এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন,—একবার যেখানে গিয়াছেন, সেখানে আর যাইবেন না,—বার বার গেলে আদর থাকে না।" টাঙ্গাইলে আসিয়া যে আদর পাইলাম, তাহাতে আমার এই বান্ধবের যুক্তি কাজে লাগিল না। নয় বৎসর পরে দ্বিতীয়বার এখানে আসিয়াছি—এত আদর পাইয়াছি—আপনারা তুই দিনে আমাকে এত আপনার করিয়া লইয়াছেন যে, আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে।

## টাঙ্গাইলে আসিয়া কি দেখিলাম ?

টাঙ্গাইলের নানা প্রতিষ্ঠান দেখিলাম। আজ প্রাতে শক্তিচর্চ্চা দেখিয়াছি। বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। কলিকাতায় শতকরা ৫০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য ভাল নয়; কিন্তু এখানকার যুবকগণ আমার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। এখানে বৎসরের ৭।৮ মাস প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, ছাত্রগণও উৎসাহী—ইহাই টাঙ্গাইলের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের কারণ বলিয়া অনুমান করিতেছি।

নানাদিকে সমাজ সংস্কারের ধূয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে বহু বাক্য খোদিত হইয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কার্য্যের অভাবে বড়ই দুঃখ পাইতেছিলাম। বাল্য-বিবাহরোধ, বিধবাবিবাহ ও অনাচরণীয়দের জলচল বিষয়ে অগ্রসর টাঙ্গাইলকে দেখিলাম। এ বিষয়ে টাঙ্গাইল গৌরবের অধিকারী। এখানকার সম্প্রদায়গণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ।

এই কালীবাড়ীতে মুসলমান ভদ্রগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতেছি। ইহাতে পরম পুলকিত হইলাম। আমার মনে হইতেছে যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ সম্ভবে না।

এসিটেলিন্ ল্যাম্প জ্বলিতেছে দেখিতেছি Calcium Carbide হইতে এসিটেলিন্ গ্যাসের উৎপত্তি। ভারতবর্ষে এই পদার্থ বহু পরিমাণে খরচ হয়। আমি রাসায়নিক। এই এক পদার্থ লইয়াই আজ সমস্ত রাত্রি আপনাদের কিছু বলিতে পারি। কৃত্রিম হীরক তৈয়ারী করিবার চেষ্টার ফলে ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এমন যে, ইহা তৈয়ারী করা অসাধ্য নয়। কিন্তু বাঙলার যুবক সমাজের এদিকে মনোযোগের একান্ত অভাব।

নয় বৎসর পূর্ব্বে এই কালীবাড়ীতে অন্নসমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি, এবং যতই চিন্তা করি ততই আমার মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়।

বাঙালী আজ জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে। এই সোনার বাঙলায় আসিয়া য়ুরোপীয়গণের ত কথাই নাই, ভারতবর্ষীয় অবাঙালীগণও জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে; কিন্তু বাঙালী আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া রহিল।

## অন্নসমস্যার সমাধানে শিক্ষিত বাঙালীর অক্ষমতা

বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া এতকাল চলিয়াছে। আজও তাহার সে দোষ হইতে মুক্তি ঘটে নাই। সেকালে ন্যায়শাস্ত্রের ফলহীন আলোচনায় দিন যাপিত হইত, আর আজকাল B. A., B. Sc., M. A., M., Sc., D. Litt., D. Sc., ডিগ্রী গ্রহণ করিয়া শিক্ষাগর্ব্বে বাঙালী স্ফীত হইতেছে। কিন্তু অন্নাভাবে বুঝি বা ইহাদের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া গেল। যদি এই বিদ্যাশিক্ষায় জীবনধারণের কোন সুবিধা না জন্মে, বরং 'কেতাবী' হইয়া যদি জীবিকা অর্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, তবে এ শিক্ষায় কোন্ মঙ্গল সাধিত হইবে ?

বিলাতে শতকরা ৯৭ জন শিক্ষিত। Sadler কমিশন বলেন যে, সেখানে যতলোক কলেজে পড়ে, এদেশেও তাহাই। তবু আমাদের দেশের শতকরা ৫ জন মাত্র অক্ষর-পরিচয় সম্পন্ন হইয়া রহিল। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই আমাদের দেশের ছাত্র ও অভিভাবকগণ B. A., M. A.র স্বপ্ন দেখেন। তাই জীবনটা স্বপ্ন হইয়াই রহিল—কর্ম্মে নিয়োজিত হইল না।

## কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃত্তির অভাব

অন্য কথা ছাড়িয়া দিতেছি—College of Scienceএ বর্ত্তমানে এত সংখ্যক বেকার Doctor of Science তৈয়ারী হইয়াছে যে, তাহাদের লইয়া এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে।

## কেতাবী বাঙালী

ফলিতরসায়নের কথা শুনিয়াছেন। এ বিদ্যা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির উপায় শিক্ষাদান করে। কিন্তু এই বিদ্যার্জ্জন করিয়া যাহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলেন না। বাঙালী 'কেতাবী' হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার এ গতিরোধ করিতে হইবে।

বাঙালী চাকুরীর আশায় বিদ্যাশিক্ষা করে—জ্ঞান-অর্জ্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে তাহার বিদ্যার্জ্জন ও অর্থ-উপার্জ্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষাপাশ ও তাহারই ফলে চাকরিপ্রাপ্তি যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানলাভ আশা করা যায় না ; এবং চাকরির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ পাশকরা ছাত্রদেরও অন্ন-সমস্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

## প্রয়োজনাতিরিক্ত উকিলের সৃষ্টি

বাঙলা দেশের আইন-কলেজগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পড়ে। কিন্তু আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কোন স্থানে নূতন উকিল ভর্ত্তি না হইলে যে আইনের ছাত্রগণ বর্ত্তমান উকিলদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাটের বাজার যদি নরম

হয়, গুদামে যদি পাট পর পর দুই বৎসর বোঝাই থাকে, তবে কোন্ মূর্খ আরও পাট বোনে? উকিলের উপার্জ্জন নাই, প্রতি 'বার' উকিলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তবু কেন যে নূতন উকিল তৈয়ারী হইতেছে জানি না। আলিপুর কোর্টে ৮০০ শত উকিল—তবু প্রতি বৎসর সেখানে উকিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বগুড়ায় গিয়াছিলাম। পাটের ব্যবসায় সেখানকার এক মাড়োয়ারী এক বৎসরে ৫০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত বগুড়ায় উকিলগণ এক বৎসরে ইহার অর্দ্ধেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই সকল ব্যবসায় অবাঙালীর হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

## অবাঙালী ব্যবসায়ীর বাঙলায় জমিদারী লাভ

উত্তর-বঙ্গের বহু জমিদার মাড়োয়ারীদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র এমন দিন আসিতেছে যখন মাড়োয়ারীগণ এ দেশের জমিদারী আয়ত্ত করিয়া লইবেন।

## পাট আমাদের উপকার করে না

পাট বাঙলার শ্রেষ্ঠ পণ্য। ইহার যাবতীয় আয় যদি বাঙালীর হাতে আসিত তবে মঙ্গল হইত, সন্দেহ নাই। বৎসরে প্রায় ১০০ কোটী টাকার পাট ও তাহার তৈয়ারী থলে, হেসিয়ান ইত্যাদি রপ্তানি হয়। ইহার ৫০ কোটী আমরা পাই। পাট কম জন্মে বলিয়া উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়া দিতেছি, বাকী বাঙলা দেশে ৫ কোটী অধিবাসী। মাথাপিছু ১০৲ টাকা করিয়া আমাদের বাৎসরিক পাটের আয়। 'পাট আমাদের দেশের উপকার করিতেছে এ কথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে?

## পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাব্যবস্থা

উপার্জ্জনের অন্য সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চাকরির আশায় বাঙালী সন্তানদের B. A., M. A. পাশ করাইতেছে। ও-দেশের অনেক কুরীতি বাঙালী তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সুরীতির অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পিতামাতা পুত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করে। এই শিক্ষার কালে যে সকল ছেলে মেধাবী বলিয়া পরিগণিত হয়, কেবল বাছিয়া বাছিয়া তাহারাই উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এইরূপে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কালে তাঁহাদের অনেকে যশস্বী হইয়াছেন।

## কৃষির উন্নতিতে বাঙালীর অকর্ম্মণ্যতা

আমাদের দেশ, কৃষকের দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য বাঙালী এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করে নাই। গভর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া নিজ কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি পাইলে চলিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে এক চেষ্টা আছে তাহাতে আমরা কতটুকু

সাহায্য করিতে পারিয়াছি? সৈয়দ সাওখাত হোসেন, অম্বিকাচরণ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জ্জি প্রভৃতি বার জন গভর্ণমেণ্টের অর্থে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কৃষিকার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন না। Statutary Civilian ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হইল। এমনি আরও কতজন বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দেশে তাঁহারা বিশেষ কোন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এজন্য স্বতঃই মনে হয় যে, বিদেশী বিদ্যায় কোন ফললাভ হইতেছে না।

## বাঙলায় অবাঙালীর কৃষিকার্য্য

শিক্ষিতগণ এইরূপে কৃষিশিল্পে অকৃতকার্য্য হইলেন। অথচ ব্যারাকপুরে পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমানগণ তরকারীর ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। তাহারা তিন হাজার টাকা সেলামী দিয়া ব্যারাকপুরে জমি লইয়াছে এবং ময়লা সার পাইবার উদ্দেশ্যে তত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটিকে ১৩০০৲ টাকা খাজনা দিবার চুক্তি করিয়াছে। ইহারা ওখানে কোঠাবাড়ী করিয়াছে। তাহাদের প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দিকে বিলাত-ফেরৎ দল দেশের বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমানগণ এ দেশে আসিয়া তরকারীর ব্যবসায়ে কেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে তাহা বলিলাম। আমেরিকাবাসী একজন তরকারী ব্যবসায়ী বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা তরকারী বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার নাম সিক্রক চার্লি। তিনি ৫ বৎসর বয়সে ক্ষেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন—১৪ বৎসর বয়সে তিনি একজন পূর্ণ-বয়স্কের উপযুক্তকাজ করিতে পারিতেন। লেখাপড়া সামান্য শিখিয়াছিলেন এবং অর্থ হাতে পাইলেই কৃষিবিষয়ক পুস্তক কিনিয়া পাঠ করিতেন। তিনি শিখিলেন—ক্ষেত্রে জল সেচন ও সার প্রদান করিতে হইবে এবং সর্ব্বকার্য্যে নিজেকেই প্রধান ভাবে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু আমরা নিজ চেষ্টাকে সর্ব্বশেষে স্থান দিয়াছি।

## ইংলণ্ডের শিক্ষায় বাঙালীর লাভ নাই

আমি ৫ বার বিলাতে গিয়াছি। সেখানে যাইয়া এ দেশের ছাত্রগণ কি শিক্ষা করে তাহা দেখিয়াছি। বৎসর বৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া দেশের বহু টাকা মিথ্যা অপব্যয় হইতেছে। এ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে চলিতেছে না। প্রায় ২ হাজার ছাত্র সেখানে যায় —তাহাদের খরচের জন্য আমরা প্রায় ১ কোটী টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাই।

## Why Bad Boys Become Great Men

সেদিনের Statesmanএ বাহির হইয়াছে "Why bad boys become great men". আমাদের দেশে যাহারা পড়াশুনায় অপটু হয়, অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু Statesmanএর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এডিসন, বলডুইন

প্রভৃতি যশস্বিগণ প্রথমে স্কুলে মেধাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং এ জন্যই বেশী দিন তাঁহারা বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারেন নাই।

## উচ্চ শিক্ষা ও কর্ম্মশক্তি

প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, তাহারা কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একে দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য—তাহার উপর এই বিদেশী ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা অর্জ্জিত হয়, তাহাতে বাঙালী ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে। এজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত অপেক্ষা অল্প-শিক্ষিতগণ জীবন সংগ্রামে অধিক জয়ী হইয়াছে। Robert Clive দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন; সেজন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই প্রতিভায় ইংরাজ রাজত্বের মূল এ দেশে প্রোথিত হইয়াছিল।

## Scholarly China Have Failed To Make Modern Industries In China

চীনের কথা বলিতেছি। Scholarly China have failed to make modern industries in China—ইহাই তদ্দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের মত। চীনের বিদ্বান্‌গণ সে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক উন্নত অবস্থা গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ ছিল। সে দেশে লোক-সংখ্যার অনুপাতে জমি কম। কিন্তু চীনদেশবাসিগণ অপর দেশে যাইয়া স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। তাহারা California, মালয় প্রভৃতি স্থানে প্রথমে কুলীর সর্দ্দার রূপে কাজ করিয়া পরে সেখানকার বড় বড় রবার ক্ষেতের মালিক হইয়া কেহ লক্ষপতি কেহ বা ক্রোড়পতি হইয়াছে।

## জীবন-সংগ্রামে কুলীর সর্দ্দারের কৃতকার্য্যতা

কুলীর সর্দ্দার হইলেই যে সে ক্ষুদ্র হয় না, মস্তিষ্ক থাকিলে যে ক্রমে সে বড় হইয়া উঠিতে পারে, বর্ত্তমান আফগানরাজ বাচ্চাই-সাকো তাহার প্রমাণ। ইনি অল্প-শিক্ষিত, বোধ হয় এজন্যই তাঁহার এইরূপ কৃতকার্য্যতা সম্ভব হইয়াছে।

অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর হইয়া আমাদের দেশেও অনেকে যশস্বী হইয়াছেন। হায়দার আলী, শিবাজী, আকবর—ইঁহারা সকলে অশেষ গুণের আধার ছিলেন। নিরক্ষর আকবর সকল শাস্ত্রের পারদর্শীদের লইয়া নবরত্ন-সভা গড়িয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় গৌরব আর কোন সম্রাট অর্জ্জন করেন নাই। বাঙলা দেশের ব্রহ্ম-বান্ধব, কেশবচন্দ্র, পরিব্রাজক প্রতাপচন্দ্র অতি অল্প দিন বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই বলিয়া কি তাঁহারা বিদ্বান্ ছিলেন না?

## ডিগ্রী কর্ম্মশক্তির পরিমাপক নহে

এইগুলি কি কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই থাকিবে?—আর ডিগ্রীর লোভে অর্থ ও শক্তি সমুদায় নষ্ট করিয়া দেশে বেকার-সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলা হইবে?

চাকরি ছাড়া ডিগ্রী গ্রহণের যেন আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। এজন্য মনে হয় যে, সেদিন স্যার রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে যে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন—এবং Mr. J. C. Banerjee যে শিবপুর কলেজের apprenticeship হইতে রাষ্টিকেট হইয়া কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহা যেন বাঙালীর প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

যাহার চারিটি পুত্র তাহারও ইচ্ছা যেন চারিটিই Graduate হয়। যেন এ সংসারে উহাই একমাত্র কাম্য। জ্ঞান-অর্জ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয় তো বাংলা লেখাপড়া শিখিয়া মাতৃভাষায় লিখিত কাগজ পড়িয়া যেটুকু জ্ঞান-অর্জ্জন হয় তাহা সামান্য নয়।

## ডিগ্রীলাভ কি স্বর্গলাভ?

মেয়েরা ছাতে চুল শুকাইবার কালে পড়সীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে—"ছেলে আমার ফেল হইয়াছে।" যেন ইহার ন্যায় গুরুতর পাপ সংসারে দ্বিতীয় নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া অভিভাবকের তাড়নায় কত ছাত্র আত্মহত্যা করে। পরীক্ষা পাশের এ মোহ বাঙালীকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

## ডিগ্রী ও প্রতিভা

বিদ্যালাভ হয় না, কেবল পরীক্ষা-পাশই হইতেছে। ইহারই ফলে বিদ্যার সম্মানও বিনষ্ট হইবার পথে উঠিয়াছে। সেদিন রাজসাহী গিয়াছিলাম। ২০ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে যাইয়া সেখানে যে কয়জন কৃতী পুরুষ (অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, যদুনাথ) দেখিয়াছিলাম, আজ ২০ বৎসর পরে আর নূতন কাহাকেও দেখিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত মেধাবী, তীক্ষ্ণধী, প্রতিভাবান্ ছাত্র দেখিয়াছি। আর আজকাল একজনও তেমন ছাত্র দেখিতেছি না। পরীক্ষায় পাশ করাই আদর্শ হওয়াতে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সম্মুখে রাখিয়া ছাত্রগণ কেবল তাহার উত্তরগুলি পাঠে ব্যাপৃত আছে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানস্পৃহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষায় কি ফল হইবে? এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি যে ডিগ্রী বা উপাধি অজ্ঞতার আবরণ মাত্র, উহা জ্ঞানের পরিচায়ক নহে।

## ছাত্রগণের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৩০ হাজার ছাত্র পড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পর ইহারা ম্যাট্রিক পাশ পর্য্যন্ত একটা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কি করে? সময় ও শক্তির এই অপচয় জগতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ ইহাই লইয়া আমরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া আছি। এই ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া কলেজে গেলে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে, সর্ব্বপ্রকার ব্যসনে কালাতিপাত করে। ক্রমে ইহাদের বাসভূমি ও আত্মীয়স্বজন-সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইহারা গৃহকর্ম্মকে অপমানজনক

বলিয়া মনে করে। নিজ স্বার্থে মগ্ন হইয়া আশা করে যে, সে কলেজে পড়ে এই দাবীতে সমস্ত পরিবার তাহার সেবা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

## বিদ্যার্থীর ব্যসন

ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ও Moslem Hallএর অধ্যক্ষগণ গোপনে সকল ছাত্রের অভিভাবকের অর্থসঙ্গতির সংবাদ লইয়া ভয়াবহ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অর্থবল অনেক কম। অতি দুঃস্থ অভিভাবকের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে এই ছাত্রগণ বিলাসিতা করিয়া ক্রমে স্বজনগণের সকল সংস্রব পরিত্যাগে উৎসুক হয়। ইহা দেখিয়া কলেজের শিক্ষার প্রতি কেহ কেহ ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন! তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে, ছেলে কলেজে পড়িতেছে—কালে ম্যাজিষ্ট্রেট না হউক দারোগা হইবে, এই আশায় স্ফীত হইয়া অভিভাবকগণ এই ভবিষ্যৎ ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেবায়, আদরে অন্ধ করিয়া দিয়া নিজেরাই ইহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

## হাতের কাজে বাঙালীর আপত্তি

হাতে কাজ করিতে শিক্ষিত বাঙালীদের আপত্তি। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট Hoover সহিসের কাজ করিয়াছিলেন। এমনি কত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু উদাহরণে যদি বাঙালীর সংশোধন হইত, তবে তাহার এ দশা ঘটিত না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড অতি দারিদ্র্য হইতে এই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। অন্নাভাবের পীড়নে হাতের কাজের প্রতি শিক্ষিতদের ঘৃণা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু একেবারে মৃত্যুর পূর্ব্বে বুঝি বা আর চেতনা সঞ্চারিত হইবে না।

## ইংরাজী ভাষার চাপে আমাদের অবস্থা

একটি জেলায় একজন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরাজ হইয়া থাকেন। তাহারই জন্য সমস্ত জেলার শাসন-ব্যাপার ইংরাজীতে হইবে এবং আমরা জেলাশুদ্ধ লোক ইংরাজী শিখিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করিব কোন্ অনুশাসনে? একবার একটি মোকদ্দমার কথা মনে পড়িতেছে। হাইকোর্টের এক মোকদ্দমায় আমি ছিলাম জুরীর Headman. Interpreter বাঙলা ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্য ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া জজকে জানাইতে ছিলেন; জজ ইংরাজীতে উহা আমাকে জানাইলে আমি বাঙলায় ভাষান্তরিত করিয়া তাহা সহকর্ম্মী জুরীদের জ্ঞাপন করিতেছিলাম। এমনি করিয়া প্রয়োজনীয় সময়ের ৪ গুণ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। এমন অনাচার আর কোথাও দেখা যায় না।

## সাহেবিয়ানার প্রলোভন

ইহার জন্য আমরাই দায়ী। আমরাও সাহেব হইতে চাহিয়াছিলাম। Mr. W. C. Banerjee ইংরাজী পাড়ায় বাস করিয়া সাহেবী খানা, সাহেবী পোষাক ও সাহেবী বুলি

অবলম্বন করিয়া পুরা সাহেব হইয়াছিলেন। অপর একজন ব্যারিষ্টারের মুড়ি খাইবার সখ হইলে তাঁহার স্ত্রী চাপরাসীদের আড়াল করিয়া আচলে করিয়া মুড়ি লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার স্বামীকে খাওয়াইতেন। খাওয়া শেষ হইলে প্রত্যেকটি মুড়ি সংগ্রহ করিয়া গোপনে দূরে নিক্ষেপ করিতেন- পাছে আয়া, চাপরাসী ধরিয়া ফেলে, ইনি সাহেব নহেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হইবে?

### আদর্শ চীন

বর্ত্তমানে চীনদেশীয়গণ জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। নানা ব্যবসায়ে ইহারা লিপ্ত হইয়া জাতির ধন বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহারা নানা দেশে গমন করিয়া বিবাহ করিয়া জাতির শক্তি দৃঢ় করিয়াছেন—অপূর্ব্ব শক্তিতে এই জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা এই চীনদেশের অনুকরণ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ন করিব—ইহাই আমার আশা।

আমাকে আপনারা পরম সমাদর করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।*

## অন্নসমস্যা ও গোপালন

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান লইয়া আমি বিব্রত আছি। আমি বরাবর ভারতবর্ষময়—বাংলার ত কথাই নাই—ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, সেই অভিজ্ঞতার বলেই এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। চক্ষু বুজিয়া, আরাম কেদারায় বসিয়া, ভাবুকের ন্যায় এই সব প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী হই নাই। হাতে কলমে কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করি। এই অন্নসমস্যার মূলে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে 'বেঙ্গল কেমিকেলের' পত্তন। বৎসর সাতেক পূর্ব্বে কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালায় যে গোশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থূল বিবরণ দিয়া গোপালনের ভিতর অন্নসমস্যার কতখানি সমাধানের পথ আছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সাইরেনসেষ্টার এ (Cirencester) কৃষি শিখিবার জন্য বৃত্তি দিয়া বাংলার যে সব সেরা

* টাঙ্গাইল ছাত্রসম্মিলনীর সভাপতি রূপে সেখানে জনসভায় যে মৌখিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত। (প্রবাসী,—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।)

পাঠান হয় সেই সম্পর্কে কিছু বলিতেছি। এই কথার উল্লেখ বহুস্থানে করিয়াছি, বুও উহার পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্যার অ্যাস্লি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন, তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড : করিয়া দুইটি কৃষিবৃত্তির প্রবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তিদ্বারা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হইত। এক একজন ছাত্রের পিছনে ২৫০ পাউণ্ড খরচ হইত। তখনকার দিনে একশত ণ্ডের মূল্য এখনকার তিনশত পাউণ্ডের সমান। প্রথম বারে যান একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু। মুসলমান ভদ্রলোকটি বিহারের সৈয়দ মহম্মৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকটির নাম অম্বিকাচরণ সেন। তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন াহাদের অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যা কোন কাজে লাগাইবার সুযোগ হইল না। তাঁহারা হইলেন ্যাটুটারি সিভিলিয়ান—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জজ। তারপর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল রায়, নৃত্যগোপাল খার্জি ও ভূপালচন্দ্র বসু প্রভৃতি। ইঁহারা আমার সমসাময়িক। ফিরিয়া আসিয়া হাদের অধিকাংশেরই করিতে হইল ডেপুটিগিরি। ব্যোমকেশ বাবু হইলেন ব্যারিষ্টার, ার গিরীশ বাবু স্কুলমাষ্টারির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের কৃষিশিক্ষা দেশের কোন কাজেই লাগিল না। এই প্রকারে দেশের কয়েক লক্ষ টাকা অকারণ অপচয় হইল। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া সেই শিক্ষার দ্বারা এদেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি করা লে না। বিলাতে ও আমেরিকায় প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিংবা ২০০ একর জমি াইয়া চাষবাস করেন? তাঁহারা শিক্ষিত, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষ রেন। তাঁহারা 'জেণ্টল্‌মেন ফার্ম্মার' বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ ভদ্র চাষী। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি। এক বা দেড় একরের বেশী হইবে না। অধিকন্তু চাষীরা নিরক্ষর, এই জন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান যায় না। দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করিলেই তাহা কদাচ ফলবতী হয় না। এই দেশের মধ্যেই যে সকল জায়গায় চাষ আবাদ উন্নত প্রণালীতে হইতেছে, সেই সকল জায়গা হইতে শিখিয়া আসিয়া কয়েকটি গ্রাম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র করিয়া সেই ভাবে ফসল উৎপাদন করিয়া আমাদের চাষীদের দেখাইতে পারিলেই দেশের কৃষিকার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে। আমাদের বঙ্গীয় রিলিফ-কমিটির আত্রাই কেন্দ্র হইতে এই প্রকার কৃষিকার্য্যের প্রচেষ্টা হইতেছে। বাংলার যুবকগণ উহা দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

এই কৃষিকার্য্যের সঙ্গে গোপালন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। গোধন কৃষকের প্রধান সহায় ও সম্পদ। বাংলার চাষীরা যে অনাহারে মরিতেছে, ইহার একটা প্রধান কারণ তাহাদের গো-সম্পদের হীন অবস্থা। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গো-পালন এবং দুধের ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইতেছে; বিশেষতঃ ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কে গো-

পালন এবং দুগ্ধের ব্যবসায় যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আদর্শস্থানীয়। বিলাতে অর্জ্জিত কৃষিবিদ্যার জ্ঞান এদেশে কার্য্যকরী না হইলেও গো-পালন সম্বন্ধে শিখিবার যথেষ্ট আছে, এবং উহা শিক্ষা করিয়া এদেশে হাতে কলমে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রও প্রচুর রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের Cirencester (সাইরানসেসষ্টার) বৃত্তিতে যে টাকা অপচয় হইয়াছে, উহা এদেশের যুবকদের বিলাতে গো-পালন শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে হয়ত অনেকটা কার্য্যকরী হইতে পারিত। প্রকৃত পথ জানা না থাকায়, বাঙালী যুবকেরা মাঝে মাঝে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-শালা (Dairy firm) খুলিয়াছেন, কিছুদিন বাদে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কলিকাতার এই দুধের ব্যবসায়ও প্রায় সমগ্রভাবে পশ্চিমাদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে।

৬৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন প্রায় সমস্ত গোয়ালাই বাঙালী ছিল। কিন্তু আজকাল বাঙালী গোয়ালা কলিকাতায় একরূপ অদৃশ্য হইয়াছে। অথচ পশ্চিমারা দুধের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। বাঙালী গোয়ালাদের এই অন্তর্ধানের হেতু কি? বারো-তের বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ॥০ মূল্যে একসের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া কঠিন হইত। তখন রাস্তায় মাঝে মাঝে খাবারওয়ালাদের দোকানে সাইনবোর্ড দেখিয়াছি—"জল মিশ্রিত দুগ্ধ প্রতিসের চারি আনা।" আজকাল এই প্রকার আছে কিনা জানি না। ১৯২৬—২৭ সালে বহুবাজারের 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন' মফঃস্বল হইতে দুধ আনাইয়া উহা 'পাস্তরাইজ' করিয়া পাঁচ-ছয় আনা সের দরে বিক্রয় করিতেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা তিন-চার আনা সের দরে বিক্রয় করিতেছেন। খাঁটি দুধ কলিকাতায় এখন যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং বেশ সস্তাদরেই পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ, কলিকাতার অলিগলিতে পশ্চিমা গোয়ালার আবির্ভাব। ইহারা কি ভাবে কলিকাতায় গো-পালন করে? ইহারা বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ গর্ভিনী গাভী, মহিষ লইয়া আসে। কলিকাতায় গোচারণের মাঠ নাই। এই গোয়ালারা গরু, মহিষকে বাঁধিয়া রাখিয়া খাওয়ায়। কিন্তু দুধের জন্য গরুর আবশ্যক খোরাক বিষয়ে পুরাপুরি তদ্বির করে, এবং গরু যাহাতে বেশী দুধ দেয়, সেইভাবেই উহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করে। স্থানাভাবে গরু চরানোর অসুবিধা হয় বলিয়া সকালে বিকালে গরু লইয়া ব্যায়াম হিসাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করায়। কিন্তু ইহারা যে-ভাবে গো-পালন করে তাহা কখনই আদর্শ এবং অনুকরণীয় নয়। যদিও ইহারা বাড়ী বাড়ী গরু লইয়া দুধ দুহিয়া সস্তাদরে খাঁটি দুধ দিয়া আসে, তবুও এই দুধের স্বাদ উত্তম হয় না। দুধ তেমন পুষ্টিকর হয় না। আমাদের সোদপুর 'খাদি প্রতিষ্ঠান গো-শালার' দুধ যাঁহারা ক্রয় করেন, সর্ব্বদাই তাঁহাদের এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, 'কলিকাতায় খাঁটি দুধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে, তবে এরূপ দুধ পাওয়া যায় না।' কলিকাতায় পশ্চিমা গোয়ালাদের দুধ উত্তম না হওয়ার কারণ, দুধের উৎকর্ষের প্রতি ইহাদের নজর থাকে না। কি করিয়া অধিক দুধ পাওয়া যাইতে পারে কেবল সেই

দিকেই নজর থাকে এবং সেই প্রকার খাদ্য গাভীদের খাওয়ায়। ইহাতে গাভীদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। দুই-তিন-চার বিয়ান দুধ দেওয়ার পরই তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন হিন্দু হইয়াও এই গোয়ালারা গাভীর অত্যন্ত অযত্ন করে, এবং শেষে কসাইদের নিকট বিক্রয় করে। গাভী হইতে অধিক পরিমাণে দুধ লওয়ার জন্য ইহারা বাছুরকে দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে, এবং তাহার ফলে এই গো-শিশু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শীর্ণকায় হইয়া অকালে মারা যায়। কিন্তু ইহাতে গোয়ালার কিছুই আসে যায় না, কারণ সেই এই মৃত বাছুরের চামড়া দিয়া কৃত্রিম বাছুর তৈরি করিয়া লয়, এবং গাভীর সামনে রাখে। গাভী এই কৃত্রিম বাছুরকেই তাহার আপন বৎস ভাবিয়া পরম স্নেহে চাটিতে থাকে, এবং ইহাতে তাহার পালানে দুধ আসে। গোয়ালা তখন সম্পূর্ণ দুধটাই দুহিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষে গাভীদের মধ্যে এই স্বাভাবিক সংস্কার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাছুর গাভীর সামনে না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পালান হইতে দুধ দোহা যায় না। এই জন্যই বাছুর মরিয়া গেলে কৃত্রিম বাছুর তৈরি করার রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু বিলাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরূপ ব্যবস্থা চলিত হইয়াছে যে, বাছুর ছাড়াই গাভী দুধ দিতে পারে। সেখানে বাছুর প্রসব হইবার পরই তাহাকে তৎক্ষণাৎ গাভী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়, এবং গাভীর সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রাখা হয় না। বাছুরকে তাহার মাতা হইতে বিযুক্ত করিয়া হাতে করিয়া দুধ খাওয়ানো হয় এবং ভালরূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে গাভী ও বাছুর একে অপরের উপর নির্ভরশীল না হইয়াই ভালরূপ থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে অবশ্য এই ব্যবস্থা কখনও কার্য্যকর হইবে না, এবং কেহই এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা তেমন আবশ্যক বোধ করে না।* যাহা হউক, কলিকাতার গোয়ালারা খাঁটি দুধ সস্তায় বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও উক্ত প্রকার গো-পালনের দ্বারা কখনও গোজাতির উন্নতি হইতে পারে না, এবং ঐ ভাবে গো-পালন দ্বারা ব্যবসাও প্রসার লাভ করিবে না ইহা ঠিক। অধিকন্তু এই ব্যবসায়ের জন্য গোয়ালাদের যে নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা উপরে বিবৃত করিলাম, তাহাতে এই খাঁটি দুধ খাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকার গো-পালনের দ্বারা ভাল ভাল গাভী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং গাভীটি মরিয়া গেলে বা কসাইয়ের হাতে পড়িলে, এই উত্তম শ্রেণীর গাভীর বংশটিও সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়া যায়। এই গোয়ালারা দুগ্ধশূন্য গাভীর

* "The English Method of handfeeding the calves is not ordinarily adopted by Indians ; moreover, the Indian cow will not allow her calf to be taken away from her. If it is done, she will never milk as well or for as long a period as she would if she was allowed her calf. English cows have generations of training at the back of them, and the separation from their calves does not injure them. It will take generation of training to make the Indian cow do without her calf. It is not advisable for any one to try it. If properly treated, the cow will give more milk, with her calf than she will do without it."—Tweed's Cowkeeping in India. pp. 137-38.

খোরাক যোগান ব্যয়সাধ্য বলিয়া উহার প্রতি যে অযত্ন করে, অথবা বাছুর প্রতিপালন ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহাকে যে অনাদরে মরিতে দেয়, বাস্তবিক পক্ষে আর্থিক দিক দিয়াও তাহা ক্ষতিজনক। ইহাতে ব্যবসায়ের লোকসানই হয়, লাভ হয় না, ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতে পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আট দশসের দুধ দেয় এরূপ একটি ভাল গাভীর হিসাব ধরুন। কলিকাতায় এইরূপ একটি গাভীর বর্ত্তমান ( ১৯৩৫ সালে ) মূল্য ২০০৲।২২৫৲ টাকা হইবে। গাভীটি অন্ততঃ তিন শতদিন দুধ দিবে। তিন শত দিনে সে গড়ে পাঁচসের হিসাবে দুধ দিবে। এই হিসাবে তিনশত দিনে ১,৫০০ সের দুধ দেয়। এই ১,৫০০ সের দুধের মূল্য টাকায় চার সের হিসাবে ৩৭৫৲ টাকা। গাভীটির জন্য দৈনিক খরচ পড়ে গড়ে ॥৵০ হিসাবে ১৮৭॥০ টাকা। এক্ষণে যদি গাভীটিকে ঠিকমত যত্ন করা হয়, তবে এই গাভী হইতে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার হিসাব নীচে দিতেছি ঃ—

১। দুধ দেওয়া বন্ধ করিলে যদি গাভী কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করা হয়—

| ব্যয় | | আয় | |
|---|---|---|---|
| গাভীর মূল্য | ২০০৲ | দুগ্ধের মূল্য | ৩৭৫৲ |
| গাভীর জন্য খাদ্য | | দশমাসের বাছুরের মূল্য | ১০৲ |
| খরচ ইত্যাদি | ১৮৭॥০ | দুগ্ধহীন গাভীর বিক্রয় মূল্য | ২০৲ |
| | | | ৪০৫৲ |
| | ৩৮৭॥০ | বাদ খরচ | ৩৮৭॥০ |
| | | লাভ | ১৭॥০ |

২। যদি পুনরায় দুগ্ধবতী হওয়া পর্য্যন্ত গাভী রাখা হয়—

| ব্যয় | | আয় | |
|---|---|---|---|
| গাভীর মূল্য | ২০০৲ | দুধের মূল্য | ৩৭৫৲ |
| দুধ-দেওয়াকালীন খাদ্য | | বাছুরের মূল্য | ১৪৲ |
| খরচ ইত্যাদি | ১৮৭॥০ | গাভী পুনঃ দুগ্ধবতী | |
| চারি মাস দুগ্ধহীন থাকা | | হইলে মূল্য | ২০০৲ |
| কালীন ব্যয় মাসিক | | | |
| ৭॥০ হিসাবে | ৩০৲ | | ৫৮৯৲ |
| | | বাদ খরচ | ৪১৭॥০ |
| | ৪১৭৲ | | |
| | | লাভ | ১৭১॥০ |

উপরিউক্ত হিসাব হইতেই দেখা যায় গাভী দুধ বন্ধ করা মাত্রই তাহাকে বিক্রয় করিলে বা অযত্ন করিলে তাহাতে লোকসান ছাড়া কোন লাভ নাই। আমাদের দেশে

—সহরে বা মফঃস্বলে দুগ্ধ-ব্যবসায় ভালরূপ না-চলার কারণ যে, গরুর অযত্ন এবং অব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহা খুবই সত্য।

## খাদিপ্রতিষ্ঠান—গোশালা

খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ যাহাতে মনে-প্রাণে কৃষকের সহিত এক হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রতিষ্ঠানে গোশালা ও কৃষির ব্যবস্থা অনুভূত হয় এবং তজ্জন্য ছোটখাট ভাবে একটি গোশালা স্থাপন করা ও সেই সঙ্গে কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠান-গোশালায় প্রাপ্তবয়স্কা তেরটি গাভী আছে; তাহার মধ্যে সাতটি সবৎসা এবং দুধ দিতেছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বলদ পাঁচটি, বক্‌না তিনটি; কৃষি ও গাড়ী টানার জন্য ষাঁড় ও বলদ পাঁচটি এবং 'ব্রিডিং বুল্' একটি, মোট পশু সংখ্যা ৩৪টি। প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব বুঝিবার জন্য এবং সম্যক্ পরিচয়ের সুবিধার জন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। গাভীগুলির নাম এই প্রকার—রেবা, চিত্রা, কৃষ্ণা, নীলা, শীলা, শুক্লা, ছায়া, গঙ্গা ইত্যাদি।

গোশালার মূলধনের সঠিক হিসাব করা কঠিন; কারণ ইহার আয় মূলধনের সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা ক্রমশঃই বাড়িয়াছে। তবে প্রথমে গোশালা আরম্ভের সময় মোটামুটি এই প্রকার ছিল—

| | |
|---|---|
| গাভী ও বলদের মূল্য | ১৮০০৲ |
| গোশালা নির্ম্মাণ, হাতে ঘাস-কাটা মেশিন ইত্যাদি | ৯৫০৲ |
| | ২৭৫০৲ |

ইহা ছাড়া গোশালার প্রায় দশ বিঘা জমি গরুর খাদ্য এবং কৃষির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উহার কোন মূল্য ধরা হয় নাই।

বাৎসরিক হিসাব অনুযায়ী মাসিক গড়ে মোটামুটি আয়ব্যয় যাহা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

| ব্যয় | | আয় | |
|---|---|---|---|
| খাদ্য | ১৭৫৲ | দুগ্ধ ২৬ মণ | ২৬০৲ |
| গোশালার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মী, শ্রমিক, দুগ্ধ-বিতরণ-কারী গোয়ালা ৬জন | ৯০৲ | পশুখাদ্য বিক্রয় ( নিজস্ব গোশালার জন্য ) এবং কৃষিজাত অন্যান্য সব্জী প্রভৃতি বিক্রয় | ৮০৲ |
| রেলভাড়া ও অন্যান্য | ৮৲ | গাড়ীভাড়া খাটান | ৫৫৲ |
| মজুর, কৃষক ও গাড়োয়ান ৫ জন | ৭৫৲ | | |
| | ৩৪৮৲ | | ৩৯৫৲ |
| উদ্‌বৃত্ত— | ৪৭৲ | | |
| | ৩৯৫৲ | | |

গরুর খাদ্য সাধারণতঃ কাঁচা ঘাস, চুনী ( কাঁচা ছোলার গুঁড়া ) বা কলাই, গমের ভূষি ও খইল। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কলাই-সিদ্ধ অথবা চুনী, তিসির খইল, গুড়, লবণ এবং ছাতু খাওয়ানো হয়; হজমী হিসাবে অল্প কিছু ( এক বা দেড় তোলা করিয়া ) গন্ধক-গুঁড়া গুড়ের সহিত খাওয়ানো হয়। প্রসব হওয়ার পর প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ গাভী দুধ কম দেয়; তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহ হইতেই দুধের প্রকৃত পরিমাণ বুঝা যায়, এবং সেই অনুযায়ী তাহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। একটি দশ সের দুধওয়ালা গাভীকে নিম্নোক্ত খাদ্য দেওয়া হয়—

| | |
|---|---|
| চুনী ( ছোলার গুঁড়া ) অথবা | /২॥০ |
| কলাই-সিদ্ধ | /৪ |
| তিসির খইল | /১ |
| গমের ভুষি | /২।০ |
| গুড় | /৵০ |
| ছাতু | /॥০ |
| লবণ | //০ |
| গন্ধক-গুঁড়া | ১॥ তোলা |

ইহা ছাড়া ছোট করিয়া কাটা বিচালী আট-নয় সের অথবা কাঁচা ঘাস কুড়ি-পঁচিশ সের অথবা অনুপাত অনুযায়ী দুই-ই মিলাইয়া খাওয়ানো হয়। খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পৃথক পৃথক পাত্রে খইল ও চুনী পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখা হয়। কাটা বিচালী এবং ঘাসের সহিত খইলের জল ভালরূপে মিলাইয়া উহাতে ভিজানো চুনী, শুক্না ভুষি ও লবণ বেশ ভাল করিয়া মিলাইয়া পরিষ্কার পাত্রে অথবা সিমেণ্ট করিয়া বাঁধানো টবে গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। গন্ধক গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়ানো হয়। জলের সহিত ছাতু ও গুড় দিয়া সরবতের মত করিয়া পানীয় হিসাবে খাওয়ানো হয়। তাহা ছাড়া প্রচুর জল খাইতে দেওয়া হয়। গোশালায় গরুর খাদ্যপাত্রের নিকট প্রত্যেক গরুর জন্যই একটি করিয়া জলপূর্ণ টব আছে, যাহা হইতে গরু ইচ্ছামত জল পান করিতে পারে। ইহা ছাড়া গোশালার প্রাঙ্গণে সৈন্ধব লবণের বড় বড় চাকা রাখা আছে, গরু ইচ্ছামত নুন চাটিয়া লইতে পারে। গাভীর দুধ কমার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে কমাইতে হয়। কাঁচা গিনি ঘাস অধিক পরিমাণে হজম করিতে পারিলে গরুর দুধ বেশী হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। রেবা নামক গাভী তাহার তৃতীয় বিয়ানের সময় কখনও কখনও দৈনিক এক মণ পর্য্যন্ত কাঁচা ঘাস খাইয়াছে, এবং চৌদ্দ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই গাভীটির অষ্টম বিয়ান চলিতেছে। এই বৎসরও সে সাত-আট সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

## গাভী-সংগ্রহ

কলিকাতার বিভিন্ন গো-হাট হইতে আবশ্যক-মত গাভী কেনা হইয়া থাকে। গাভীগুলি দুগ্ধবতী অবস্থায় ক্রয় করা হয়। গাভী দৈনিক যত সের দুধ দেয়, সেই হিসাবে সাধারণতঃ ২০৲ টাকা সের দরে গাভী কেনা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে ষোল-সতের টাকা সের দরে দুইটি গাভী ক্রয় করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া গোশালাতেই জন্মিয়াছে এইরূপ গাভী চারিটি রহিয়াছে। এই গাভীগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং ছয়-সাত সের হিসাবে দুধ দিতেছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কিনিবার সময় গাভীটি যে-পরিমাণ দুধ দিত, একমাত্র পরিচর্য্যার ফলে অল্পদিন মধ্যেই তদপেক্ষা অধিক দুধ দিতেছে। কোন-কোন স্থলে অবশ্য ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে।

## দুগ্ধদোহন ও বিক্রয়

ভোর পাঁচটায় এবং অপরাহ্ণ চারিটায় দুইবার দোহন করা হয়। পরিষ্কার বালতিতে দোহন করিয়া আবৃত পাত্রে ঢালিয়া রাখা হয়। পরে ওজন করিয়া পাত্র সিল করিয়া বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়। দোহনকারীর হস্ত ও নখের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বাছুরকে তাহার শক্তি অনুযায়ী প্রচুর দুধ খাইতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও বাছুরের চোখ হইতে জল গড়াইয়া জলের দাগ হয়। ইহা পুষ্টির অভাবের চিহ্ন। ছোট ছেলে মেয়েরও ঐ রোগ দেখা যায়। প্রথমে জল পড়ে, পরে পুঁজ হয়, তাহার পর চক্ষু খারাপ হয় ও শেষে মৃত্যু হয়। সময় মত পুষ্টিকর খাদ্য দিলে সহজেই রোগ উপশম হয়।

আজকাল প্রতিদিন ৩৫।৩৬ সের দুধ গোশালা হইতে পাওয়া যাইতেছে। গড়পড়তা সাধারণতঃ এইরূপই পাওয়া যায়। ইহার কতক অংশ খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রম সংলগ্ন পাকশালায় খরচ হয়, বাকী দুধ কলিকাতায় গৃহে গৃহে পাঠাইয়া বিক্রয় করা হয়।

## খাদ্য সংগ্রহ

গরুগুলির জন্য ঘাস বিচালী যথাসম্ভব কলাশালায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিছু শাকসব্জী ছাড়া নয় বিঘা জমিতেই পশুখাদ্য বপন করা হইতেছে। ইহার মোটামুটী হিসাব দেওয়া হইল—

| | |
|---|---|
| গিনি ও নেপিয়ার ঘাস | ২½ বিঘা |
| জোয়ার, ধান, গম ইত্যাদি | ৪ ,, |
| শাকসব্জী | ২½ ,, |
| মোট | ৯ বিঘা |

শাকসব্জীর মধ্যে কিছু আশ্রমের পাকশালায় যায়, কিছু বিক্রয় হয়। এবং কিছু গোশালায় যায়। আশ্রমের পাকশালায় তরিতরকারী বাছা ও কুটার পর ঐ গুলির একটা বড় অংশ পড়িয়া থাকে এবং উহার সমস্তই গোশালায় দেওয়া হয়। ইহা গরুর পরম উপাদেয় খাদ্য।

## সার-ব্যবহার

গোশালার নিকটেই পাকা চৌবাচ্চা আছে। উহাতে গোমূত্র এবং গোশালার মেজে ধোয়া জল আসিয়া জমে। গোবর গোশালার নিকটেই একটি বড় গর্ত্তে জমান হয়, এবং আবশ্যক মত পচাইয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। গোমূত্রাদির দ্বারা যখন চৌবাচ্চা পূর্ণ হইয়া উঠে তখন উহা তুলিয়া গোবরের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, অথবা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গোমূত্র বিশেষ উপকারী সার, এবং গরুর জন্য ঘাস উৎপাদনে সদ্য সদ্যই ব্যবহার করা যায়।

খাদি প্রতিষ্ঠানের গোশালার মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া গেল। খাদিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি প্রধানতঃ নিযুক্ত। আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে গোশালার প্রতিষ্ঠা হইলেও উহা বর্ত্তমানে একটি আদর্শ গোশালায় পরিণত হইয়াছে। উষাগ্রামের পাদরী উইলিয়ম গোশালা দেখিয়া তাঁহার "উষাগ্রাম" নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"I was proudly shown the dairy where the animals are treated with human race." ইহা খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ত্যাগী, অনন্যসাধারণ কর্ম্মযোগী শ্রীমান সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও তাঁহারা উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী হেমপ্রভার উদ্যম, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তির নিদর্শন স্বরূপ।

আদর্শ গোশালার সঙ্গে কৃষিকার্য্য একান্ত আবশ্যক। যে কোন উদ্যমশীল যুবক, একা অথবা কয়েকজনে মিলিয়া কলিকাতার সন্নিকটে দশ পনর বিঘা জমি লইয়া উহাতে চাষ আবাদ ও গো-পালন এক সঙ্গে করিতে পারেন এবং নিজেদের উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। প্রতিষ্ঠান-গোশালা তাহারই পরীক্ষামূলক নিদর্শন। উদ্যোগী কর্ম্মিগণ এখানে আসিয়া হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন।

বাংলার গরুর অবস্থা দেখিয়া আমার মন স্তব্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আমি বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির তালোড়া কেন্দ্রের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বসিয়া এই প্রবন্ধ লেখাইতেছি। আমার সম্মুখে বিস্তৃত মাঠের উপর গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। এই গরুগুলির চেহারা দেখিতেছি, আর আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে। দেখিলেই মনে হয় কোন পুষ্টিকর খাদ্য ইহারা পায় না। চরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে যে শক্তি ইহাদের ব্যয় হয়, সেই শক্তি টুকু পরিপূরণের উপযুক্ত খোরাক ইহারা পায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা ঘাস খায় বলিলেও অত্যুক্তি হয়। ঘাস এত ক্ষুদ্র ও রসহীন যে, তাহা আহরণ করিতে দাঁত ক্ষয় হইয়া তাহার খাদ্যসংগ্রহ শক্তি কমাইয়া দেয়। ইহার কারণ কি? একমাত্র

কারণ আমাদের আলস্য। সত্যবটে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা গরুকে খাদ্য দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকমত করে না। তাহারা এত অলস এবং এই আলস্যের পিছনে তাহাদের অজ্ঞানতা এত অধিক যে চেষ্টা ঠিক পথে চলে না। বাল্যকালে দেখিয়াছি —গ্রামে গ্রামে প্রায়ই গৃহস্থেরা গরুর জন্য সম্বৎসরের বিচালীর গাদা দিয়া রাখিত। এখন পাড়াগাঁয়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখি বিচালির গাদা রাখা আছে বটে, তবে তাহা পালিত গরুগুলির পক্ষে খুবই কম। ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল। গৃহস্থেরা ধান ভানিত। কাজেই ক্ষুদ কুঁড়া প্রভৃতি ভাতের ফেন জলের সহিত মিশাইয়া গরুকে খাইতে দেওয়া হইত। উহা গরুর একটি পুষ্টিকর খাদ্য। বর্ত্তমানে এই খাদ্য গরু কোথায় পাইবে? ধানকলগুলির কল্যাণে সমস্ত ঢেঁকি উঠিয়া যাইতেছে। গৃহস্থের বাড়ীর খাদ্যের যে অংশ ফেলিয়া দেওয়া হইত, (যেমন আনাজ তরকারীর খোসা, আম কাঁঠালের খোসা) তাহা গরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু উহা যত্নসহকারে গরুকে জোগাইবে কে? আজকাল গৃহস্থবাড়ীর গৃহলক্ষ্মীরা গো-সেবা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করা হইতে গরুর জাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য করিতে নারাজ। ফলে গৃহস্থ বাড়ীতে গো-পালন ও তাহার পরিচর্য্যার ভার চাকর বাকরদের উপর ন্যস্ত হইতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই গরু নাই। ফলে পাড়াগাঁয়ে দুগ্ধ না কিনিলে মিলে না, এবং কিনিতে হইলেও বেশীর ভাগই মুসলমান চাষীদের নিকট হইতে কিনিতে হয়। কিন্তু তাহারাও গো-পালন সম্বন্ধে অজ্ঞ, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহাদের অস্থিকঙ্কালসার গাভীগুলি আধসের, তিন পোয়া, বড়জোর একসেরের বেশী দুধ দেয় না। কিন্তু আবার কয়জন গৃহস্থেরই বা এমন সচ্ছলতা আছে যে, প্রত্যহ নগদ পয়সা দিয়া দুগ্ধ কিনিতে পারে? যে টুকু পারে তাহাও আবার শিশুদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুন্দরবন অঞ্চলের স্থানে স্থানে সামান্য মুদির দোকানে সুইডেন ও সুইজারলাণ্ডের প্রস্তুত জমাট দুগ্ধ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। আমার বাল্যকালের বাংলা এবং এখনকার বাংলায় কত প্রভেদ। তখন প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ—ধনী, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র—গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে পূজা করিত, যত্ন করিত। কিন্তু এখনকার গৃহলক্ষ্মীরা কি গোয়ালে গিয়া এই প্রকার গো-সেবা করিতে প্রস্তুত? তাঁহারা ত গোয়াল দেখিয়া আঁত্‌কাইয়াই মূর্চ্ছা যাইবেন। ইহার ফলে বাংলা দেশে শতকরা ৯৫ জনের ঘরে দুধের চেহারাই দেখা যায় না। কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রত্যেক গৃহস্থ বা কৃষক অন্ততঃ পক্ষে একটি গাভী বা মহিষ পোষে। তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য যোগায় এবং তাহাদের দুধ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিজেরা ব্যবহার করে। ঘৃতাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। গ্রামে যদি কোন পথিক কোন গৃহস্থের নিকট একটু পানীয় জল চায়, তাহা হইলে সে অবাক হইয়া জলের পরিবর্ত্তে এক গ্লাস দুগ্ধ দিয়া থাকে।

কলিকাতার সন্নিকটে (আট দশ মাইল দূরে) প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। উদ্যমশীল যুবকগণ কয়েক বিঘা জমি লইয়া গো-পালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। চাই কেবল উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম। বারাকপুর, পল্‌তা

প্রভৃতি অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া কয়েকজন পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান প্রচুর শাকসব্জি তরিতরকারী উৎপাদন করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। যে সকল বাঙালী যুবক দেশ বিদেশে গিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা এই সকল সংবাদ রাখেন না। হ্যাট কোট পরিয়া বা পরিচ্ছন্ন ধুতি শার্ট পরিয়া চেয়ার টেবিলে বসিয়া হুকুম জারি করিয়া যাঁহারা কেবল কুলীমজুরের দ্বারা কাজ করাইবেন, তাঁহাদের লাভ হওয়া দূরের কথা, বিস্তর লোকসান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে প্রাচীন গৃহিণীরা এখনও যে ভাবে গো-সেবা করেন, অর্থাৎ নিজহাতে গোয়াল পরিষ্কার করা, গরুর জাব দেওয়া ইত্যাদি কাজ করেন - যুবকদের সেই কথা মনে রাখিয়া কায়িক পরিশ্রম করিতে হইবে। এ বিষয়ে খনার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। উহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক হাতে ( কাঁধে ) ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত
তার ঘরে সদাই হা-ভাত।

এই প্রবন্ধের উপকরণ প্রতিষ্ঠানের একজন হাতে কলমে অভিজ্ঞ কর্ম্মী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ( প্রবাসী —ভাদ্রে, ১৩৪২ )

## অন্নসমস্যা ও গোপালন

### ( ২ )

এক কালে এদেশে লোক গাভীকে কত নিষ্ঠার চক্ষে দেখিত তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'গো-ধন', 'গো-মাতা', 'গো-সেবা'—এই সকল কথার মধ্যে দেখিতে পাই। মহাভারতে, পুরাণে দেখি গো-সেবা তাপসী ও মুনি-পত্নীদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। স্বামিসেবা, অতিথিসেবা, রন্ধনশালা ও অগ্ন্যাগারের পাশাপাশি গোশালা গৃহস্থালীর একটি প্রয়োজনীয় স্থান জুড়িয়া থাকিত। দোহন করিতেন বলিয়া কন্যার নাম হইয়াছিল দুহিতা। কালের কুটিল গতিতে দুহিতা এখন দোহন করিতে ভুলিয়াছেন ; এখন তিনি শোষণ করেন পিতৃকুলকে। রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণা কেমন করিয়া নন্দিনীকে সেবায় তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত। ঋগ্‌বেদের একস্থানে জনৈক মুনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন,—"অপর মুনির কন্যার জন্য ভাল বর জুটে, কিন্তু আমি দরিদ্র, আমার যথেষ্ট গো-ধন নাই, তাই আমার কন্যার অদৃষ্টে মনোমত

পাত্র জুটে না।" প্রাচীনকালে রাজা-রাজড়াদের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ দিতে হইলে তাঁহাদের গোধনের সংখ্যার উল্লেখ করিতে হইত। মহাভারতে দেখা যায়, বিরাট-রাজার গো-ধন লইয়া কৌরবদের সহিত একটা খণ্ডযুদ্ধই হইয়া গেল। এ সকল উপাখ্যান হইলেও ইহা হইতে গাভীর সঙ্গে হিন্দুগৃহস্থ ও গৃহস্থালীর কিরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এখন জীবন-যাত্রার প্রণালী অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। দেশের মাঠ-ঘাটের নূতন করিয়া বাঁটোয়ারা হইয়াছে। প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও প্রতি গ্রামে গোচারণের বিস্তৃত মাঠ ছিল। সেখানে গ্রামের গাভী ও বলদ যথেষ্ট ঘাস খাইয়া পুষ্টিলাভ করিত ও গাভীরা প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। এখনও অনেক গ্রাম আছে যাহাদের নাম হইতে বোঝা যায় যে, এক সময় সে সকল জায়গায় গোয়ালার বসতি ও গোচারণের মাঠ ছিল। পোড়াদহের কাছে 'গোয়াল-বাথান', খুলনা জেলার প্রান্তদেশে 'গোয়াল-মঠ' প্রভৃতি গ্রাম ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষী-তীরে দেওড়ার মাঠ নামে এক বিখ্যাত গোচারণ-ভূমি ছিল। ইহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত। 'ছিল' বলিতেছি এইজন্য যে, উহা আর গোচারণের মাঠরূপে ব্যবহৃত হয় না। প্রায় সাত আট শত ঘর গোয়ালা ইহার আশপাশে বসবাস করিত। এই সুবিস্তীর্ণ মাঠে তাহাদের গরু চরিত। দেশের লোকে সুলভে প্রচুর দুগ্ধ, ঘি, মাখন, ছানা খাইতে পাইত। ইহার জন্য গোয়ালারা মালিককে নামমাত্র খাজনা দিত—তাহাও টাকায় নহে; দুগ্ধ, ঘি ও ছানার বরাদ্দেই ভূস্বামী তুষ্ট থাকিতেন।

ক্রমে কল-কব্জা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতী, জোলা, কামার, মাঝিরা নিজ নিজ জাতি-ব্যবসায় ছাড়িয়া ভূমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইল। একমাত্র বিলাতী কাপড়ের কল্যাণেই কত তাঁতীর তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।* আর এক সর্ব্বনাশ হইল পাটের চাষে। ইহা দাবানলের মত দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ফলে জমির উপর উপর্য্যুপরি এত চাপ পড়িতে লাগিল যে, এই সমস্ত গোচারণের মাঠের প্রতি হৃদয়হীন জমিদার ও প্রতিপত্তিশালী গ্রামবাসীর লুব্ধদৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই শনির দৃষ্টি হইতে দেয়াড়ার মাঠও নিষ্কৃতি পায় নাই। নিঃসম্বল গোয়ালারা আর কত লড়িবে? আইনের কূটজালে হয়রাণ হইয়া তাহারা অবশেষে রণে ভঙ্গ দিল। সেই বিস্তীর্ণ গোচারণের মাঠ এখন ভাগবিলি হইয়া গিয়াছে। সেখানে এখন পাটের রাজপাট বসিয়াছে। ঘাস অভাবে গাভীকুল কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বাঁটে দুধের ধারা শুকাইয়া গিয়াছে। যেখানে টাকায় ৩২ সের করিয়া দুধের বিকি-কিনি হইত, সেখানে আজ টাকায় চারি সের হইতে, ছয় সেরের বেশী দুধ মিলিবে না।

ইংলণ্ড ও ইউরোপে গো-পালন ও দুধের কারবার কৃষিকার্য্যের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ।* কৃষি-ব্যাপারে আমি শুধু এই দিকটাই বেশী করিয়া আলোচনা করি।

* ১৯২৬ সালের রয়াল-কৃষি কমিশনে সাক্ষ্যদান-প্রসঙ্গে আমার উক্তি দ্রষ্টব্য।

কারণ বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় দুধের অপ্রাচুর্য্য বা মন্বন্তরের ফলে বাঙলার ঘরে ঘরে শিশুরা অপুষ্টি ও রিকেট্‌স্ প্রভৃতি রোগে ভুগিতেছে। ইউরোপ-ভ্রমণকালে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে দেখিয়াছি—বিস্তীর্ণ গোচারণের মাঠ ও চাষের জমি পাশাপাশি রহিয়াছে। শুধু মরকত দ্বীপ ( Emerald Isle ) আয়র্লণ্ডেই নহে, ইউরোপের অপর দেশেও মাঠের শ্যামল শোভা দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গিয়াছে। বিশাল বলীবর্দ্দ ও গাভীগণ মাঠে দাঁড়াইয়া জাবর কাটিতেছে। চতুর্দ্দিকে লম্বালম্বা ঘাসের আটি কর্ত্তিত হইয়া শুকাইয়া যাইতেছে। ইহাই ওদেশের 'হে' ( hay )। শুনিলাম অনেক মাঠে গ্রীষ্মকালে মাসের মধ্যে এই ঘাস ২।৩ বার করিয়া কাটা হয় ও শীতকালের জন্য সঞ্চিত হয়। সেইজন্যই বোধ হয় ইংরাজী প্রবাদের উৎপত্তি—'Make hay while the sun shines'। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরকাল যখন এডিনবরায় প্রবাস যাপন করিতেছিলাম, তখন সহরতলীর মাঠে গিয়া দেখিলাম যে, পশুদের খোরাক জোগাইবার জন্য গাজর, শালগম, ম্যাঙ্গেল ভূর্জ্জেল ( mangel wurzel ) প্রভৃতি কত রকম ফসল ফলিয়াছে। কিন্তু ইহারই প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১৬৮৫ অব্দে এই বিষয়ে ইংলণ্ড কত দূর পশ্চাৎপদ ছিল, তাহা মেকলের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসের একস্থানে বলিতেছেন,—"তৎকালে চাষের ক্রম বা পালা সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ত ছিল না। দেশে তখন সবেমাত্র কয়েকপ্রকার সব্‌জী—বিশেষ করিয়া শালগমের প্রচলন হইয়াছে। শীতকালে এই সব সব্‌জী পশুদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারিত; কিন্তু লোকে তখনও উহাদের ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং মাঠে যখন ঘাস থাকিত না বা শুকাইয়া যাইত, তখন গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুদিগকে বাঁচাইয়া রাখাই দুঃসাধ্য হইত। উপায়ান্তর না দেখিয়া লোকে ঐ সকল পশুকে শীতের প্রারম্ভেই মারিয়া ফেলিত এবং লবণাক্ত করিয়া রাখিয়া দিত।"* স্থানান্তরে মেকলে বলিতেছেন, "ইদানীং যে সকল গো-মেষাদি আমাদের হাট-বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় তাহাদের তুলনায় তৎকালীন পশুগুলি নিতান্ত শীর্ণ ও খর্ব্বকায় ছিল।" ১৬৮৫ সালের ইংলণ্ডের যে চিত্র মেকলে দিয়াছেন, ১৮৮৮ সালে তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। চেষ্টা করিলে আমাদের দেশেও নানাবিধ পুষ্টিকর পশুখাদ্য জন্মাইতে পারা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশিমবাজারের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। সেখানে প্রচুর জোয়ারের গাছ জন্মিয়াছে দেখিলাম। মহারাজার নিকট শুনিলাম ঐ সকল গাছ বিচালীর মত শুকাইয়া পালা দিয়া রাখা হয় এবং শুক্‌না সময়ে উহা খাইয়াই খামারের গরু বাঁচে। ঢাকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রেও জোয়ারের গাছ জন্মে। গাছগুলি কাটিয়া একটি গর্ত্তের

* আমাদের দেশের লোনা ইলিশের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

মধ্যে জমা করা হয় এবং তাহার উপরে ঘাসের চাপড়া দিয়া গর্ত্তের মুখ ঢাকিয়া দেওয়া হয়। পরে অনাবৃষ্টির সময় এই সংরক্ষিত জোয়ার গাছ উপাদেয় ও পুষ্টিকর পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় ভাষায় এই সংরক্ষণ প্রণালীকে 'সাইলেজ' ( ensilage ) করা বলে। ফরিদপুরের কৃষিক্ষেত্রে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের অনেক জমি পদ্মার পলিমাটি হইতে উদ্ভুত, সুতরাং শীত ও গ্রীষ্মকালে সমান রস থাকে। একটু যত্ন করিলেই, যখন পাট ও ধানের ফসল উঠিয়া যায়, তখন ভুট্টা, জোয়ার ও মাষকলাই প্রভৃতি নানাবিধ সব্‌জী সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে আর পাট চাষের দেশে গৃহস্থ চাষীকে অসময়ের জন্য উচ্চমূল্যে বিচালী সংগ্রহ করিতে হইত না। ঢাকা ও কাশিমবাজারের ন্যায় প্রতি গ্রামে জোয়ার প্রভৃতি চাষের ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে। পশ্চিমা গোয়ালারা কি প্রণালীতে ভুট্টা ও জোয়ারের গাছগুলি ব্যবহার করে এবং খাদি প্রতিষ্ঠানে সোদপুরের গোশালাতেই বা কিরূপে এই প্রকারের গো-খাদ্যের সংস্থান করা হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বিলাতের গাজর, শালগম প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল সব্‌জী বহুদিন পর্য্যন্ত সরস থাকে; সুতরাং শুক্‌না সময়ের জন্য অনায়াসেই সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। আমরাও এই সকলের চাষ করিতে পারি। বাংলার মাটিতে সোণা ফলে, কিন্তু কুঁড়েমি ও অজ্ঞতার বশে বৎসরের অর্দ্ধেক দিন সেই মাটি নিস্ফলা পড়িয়া থাকে। এই অপচয়ের পাপেই গোজাতি ধ্বংসের পথে উঠিয়াছে, দুধের বাজারে আগুন লাগিয়াছে এবং আমাদের বংশধরগণ দুগ্ধ অভাবে দিন দিন শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া অবশেষে অকাল মৃত্যু বরণ করিতেছে।

প্রসঙ্গক্রমে শৈশবকালের কথা মনে পড়িয়া গেল।* তখন দুগ্ধবতী গাভীর সেবা প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল। আমাদের বাড়ীতে নানা প্রকারের গাভী ছিল। আমার বেশ মনে আছে আমার মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সকল গাভীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। আমাদের বাড়ীর এই নিয়ম ছিল যে, শিশুরা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধাহারী থাকিবে। এমন কি সম্পন্ন গৃহস্বামী ও গৃহিণীরা প্রত্যূষে গোশালা পরিষ্কার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। গোয়াল হইতে যে আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া বাহির করা হইত তাহাতে উত্তম সারের কাজ চলিত। চালের খুদ ও কুঁড়োর সহিত কলাগাছ কিংবা লাউয়ের টুকরা সিদ্ধ করিয়া এক রকম ফ্যান্‌সা ভাত প্রস্তুত হইত, উহা গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গোচারণের জন্য পৃথক মাঠ নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন, সেখানে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া গাভীগণ পুষ্ট হইত। ধানের ফসল উঠিয়া গেলে প্রচুর বিচালী পালা দিয়া রাখা হইত। শীতকালে মাঠে যখন ঘাস থাকিত না, তখন এই সঞ্চিত বিচালী কাজে লাগিত। তিসি ও সরিষার খইল বিচালীর

* আমার আত্মজীবনীর ( Life & Experiences. vol. ) ৩৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলেও গাভীর দুধের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই খইলও আর গরুর ভোগে আসে না। দেশের কতক খইল পানের বরজে উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বিদেশেও কম রপ্তানী হয় না। কলিকাতার সন্নিকটে গৌরীপুর অঞ্চলে যে সকল তেলের কল আছে সেখান হইতে প্রচুর তিসির খইল জাহাজ ভরিয়া বিদেশে যায়—সেখানকার পশুদের খোরাক জোগাইতে।

আমাদের হাতে যেখানে গো-জাতির এত দুর্গতি চলিতেছে, ঠিক তাহারই পার্শ্বে পশ্চিমা গোয়ালারা কিরূপে গো-সেবায় তৎপরতা দেখাইতেছে এবং দুধের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ও সাফল্যলাভ করিতেছে তাহার আভাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। তাহাদের ও খাদিপ্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, চেষ্টা করিলে গোচারণ ভূমির অভাবে গোয়ালে বাঁধা গরুর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হয় না, এবং দুগ্ধেরও অপ্রাচুর্য্য হয় না।

কিন্তু চক্ষের সম্মুখে এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হয় না। অলসতা ও শ্রমবিমুখতার জন্য আমরা কুলী মজুর, মাঝি মাল্লা, গাড়োয়ান ও গোয়ালার সকল শ্রমসাধ্য কাজই একে একে ভিন্নপ্রদেশীয়দের হস্তে তুলিয়া দিয়া নিদারুণ অন্নসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, বড় বড় ব্যবসায়ী ও বণিকের কথা বাদ দিয়া কেবলমাত্র শ্রমজীবিগণই বৎসরে প্রায় সাত আট কোটি টাকা বাংলা দেশ হইতে রোজগার করিয়া দেশে পাঠায়। অতএব অর্থনীতির দিক হইতে দেখিলে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। দেখিয়া শিখিবার মত সুমতি আমাদের হয় নাই, ঠেকিয়া শিখিবার সময়ও উত্তীর্ণপ্রায়। এখনও সজাগ না হইলে আমাদের ভাগ্যে আরও অনেক লাঞ্ছনা ও দুঃখ অনিবার্য্য, এমন কি কালক্রমে এ জাতির ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবারও সম্ভাবনা আছে।

(প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৪২।)

——:০:——

# ম্যাডাম কুরী

ম্যাডাম কুরীর নাম বিজ্ঞান জগতে সকলেরই সুপরিচিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞান বিভাগে নারীর দান সামান্য। বুদ্ধি-বৃত্তির অপকর্ষতাই যে ইহার কারণ এমত নহে। সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান না। সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে মহিলারাও যে কত কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন, ম্যাডাম কুরীর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কুরী তাঁহার জীবনকালের অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞান-জগতে এক অভিনব আবিষ্কার করিয়া এক নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

পোলাণ্ড দেশের ওয়ার্শ নগরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর ম্যাডাম কুরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ডক্টর সক্লোডাউস্কী অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। অল্প বয়সে মাতার মৃত্যু হওয়ায় কুরী তাঁহার পিতার তত্বাবধানে বাল্যকালে প্রতিপালিত হন। একটু বয়স হইলে তিনি তাঁহার পিতার ল্যাবরেটরীতে কাজ শিখিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, বাল্যকালে ম্যাডাম কুরী ( মেরী সক্লোডাউস্কী ) তাঁহার পিতার নিকটে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির মূল কারণ হইয়াছিল।

পোলাণ্ড দেশের যে অংশে ডক্টর সক্লোডাউস্কী বাস করিতেন তাহা রুশিয়া দেশের অন্তর্গত ছিল। রুশিয়ার জারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেকে জারের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিত এবং ম্যাডাম কুরী দেশপ্রেমিক পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই শ্রেণীভুক্ত হন। শীঘ্রই একটি বিপ্লবীর দল গড়িয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রুশিয়ার পুলিশ এই রাষ্ট্রবিপ্লবপন্থীদের সন্ধান পায়। এই ঘটনার পরে মেরী সক্লোডাউস্কীর পক্ষে পোলাণ্ডে নিরাপদে কালযাপন করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। তিনি একাকী রিক্ত-হস্তে প্যারীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম ছিল এবং অর্থের অনটন হেতু মেরী সক্লোডাউস্কী নিতান্ত দরিদ্রভাবে কালযাপন করিতে থাকেন। অন্নসমস্যা তখন তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দৈনিক খরচ দশসেণ্ট যোগাড় করিবার জন্য তাঁহাকে সোর্বনের ল্যাবরেটরীতে শিশি বোতল প্রভৃতি পরিষ্কার করার কার্য্য করিতে হইত। ঘরে আগুন দিবার জন্য অর্থাভাবে তাঁহাকে নিজের কয়লা বহন করিতে হইত এবং দিনের পর দিন তিনি কেবল রুটি ও দুধ খাইয়াই জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। মাংস, ব্রাণ্ডী প্রভৃতির স্বাদ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

এই সময়ে সোর্বনের ল্যাবরেটরীর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ গেব্রিয়েল লিপম্যান্ এবং হেন্‌রী পৌয়াকারের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ হয়। তাঁহার অবস্থা শুনিয়া এবং কার্য্যকুশলতা দেখিয়া লিপ্‌ম্যান্ ও পৌয়াকারে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হন এবং পেরী কুরী নামক একটি মেধাবী ছাত্রের সহকর্ম্মীরূপে কার্য্য করিবার আদেশ দেন। একত্র কার্য্য করিবার ফলে পেরী কুরী এবং মেরী সক্লোডাউস্কী উভয়ে

উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। উভয়েই বিজ্ঞানদেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন এবং আজীবন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

এই সময়ে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল পরিলক্ষিত হইতেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম্ ক্রুক্স দেখাইলেন যে, সূক্ষ্ম কাচ নলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক দ্বার হইতে ( Negative pole ) একপ্রকার আশ্চর্য্য রশ্মি বাহির হয়। তিনি উহার নাম দিলেন বিয়োগ-রশ্মি ( Cathode rays. )

এই নূতন রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা প্রকার পরীক্ষা ও তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টম্‌সন এই সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, এই রশ্মিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণতাড়িত কণার সমষ্টিমাত্র। এই ঋণতাড়িত কণা অথবা ইলেক্‌ট্রনের ওজন একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর দুই সহস্র ভাগের একাংশ মাত্র। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম্ রণ্টজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের কথা আসিয়া পড়ে। তিনি দেখাইলেন যে, বিয়োগ-রশ্মি কোনও বস্তুর উপর পতিত হইলে ঐ বস্তু হইতে এক অপূর্ব্ব রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি ধাতু, পাথর কিংবা কাঠের আবরণ অনায়াসে ভেদ করিতে পারে। এই রশ্মি মনুষ্য চর্ম্ম ও মাংস ভেদ করিয়া অস্থিতে বাধা পায়। সুতরাং এই রশ্মির সাহায্যে ফটোগ্রাফ তুলিলে মনুষ্যের শরীরের অস্থিতে কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়াছে কি-না সহজেই ধরিতে পারা যায়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাশী বৈজ্ঞানিক বেকেরল্ ( Becquerel ) এক নূতন রশ্মি আবিষ্কার করিলেন। নানা প্রকার প্রস্ফুরণশীল ( Phosphorescent ) পদার্থের প্রকৃতি পরীক্ষাকালীন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইউরেনিয়ম এবং উহার যৌগিক পদার্থসমূহ হইতে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়, যাহা রঞ্জনরশ্মির অথবা এক্স-রে'র সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই সকল রশ্মি বায়ু অথবা অন্য কোনও বাষ্পের ভিতর প্রবেশ করিলে উক্ত বাষ্পকে তড়িৎ-পরিবাহক করে। আবিষ্কর্ত্তার নাম অনুসারে এই নূতন রশ্মির নাম হইল বেকেরল্ রশ্মি।

বেকেরলের প্রণালী অনুসরণ করিয়া ম্যাডাম্ কুরী এই নূতন রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন যে, ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত অন্য এক প্রকার পদার্থ হইতেও উক্ত প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। ম্যাডাম কুরী এই নূতন পদার্থের নাম দিলেন থোরিয়ম্। এই সকল গবেষণা-প্রসঙ্গে ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করিলেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক ইউরেনিয়ম্-সংযুক্ত খনিজ পদার্থ হইতে যে রশ্মি নির্গত হয়, তাহা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম্ হইতে নির্গত রশ্মি অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী। ম্যাডাম কুরী অনুমান করিলেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত নিশ্চয়ই এমন অন্য জিনিস আছে, যাহা ইউরেনিয়ম্ হইতে অধিকতর শক্তিশালী রশ্মি নির্গত করিতে পারে। এ পর্য্যন্ত ম্যাডাম কুরীর

কোনও সহকর্মী ছিল না। এক্ষণে তাঁহার স্বামী অধ্যাপক পেরী কুরী তাঁহার সঙ্গে একত্রে এই অজ্ঞাত বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইল যে, পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর পরিমাণ অত্যন্ত কম। কাজেই তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ পিচ্‌ব্লেণ্ড লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইল। এই কার্য্যের জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বোহেমিয়া দেশের অন্তর্গত ইউরেনিয়মের খনি হইতে কুরীদ্বয়কে এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ড উপহার দিলেন। সাধারণতঃ পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে নানারূপ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। সুতরাং উহা হইতে তাঁহাদের অভীপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া অতীব আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এক টন অর্থাৎ ২৭ মণ পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে ১ গ্রাম ওজনের ৬০০ শত ভাগের একভাগ অতি শক্তিশালী স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থ পাওয়া যায়। ম্যাডাম কুরী ইহার নাম দিলেন রেডিয়াম। দীর্ঘ বারো বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে পরীক্ষা করিবার পর তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ রেডিয়াম ধাতু প্রাপ্ত হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, রেডিয়াম আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় আরও একটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত বস্তুর নাম দিয়াছিলেন,—পলোনিয়াম।

এই প্রসঙ্গে রেডিয়াম সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ক্যান্সার ও কতকগুলি চর্ম্মরোগ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় রেডিয়াম-চিকিৎসা। রেডিয়াম একটি তীব্র শক্তিশালী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। সূর্য্য হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয় বলিয়াই এই জগত আমাদের দৃশ্যমান হয়। রেডিয়াম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে না। অথচ এই আলোক সূর্য্যের আলোক অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী। সূর্য্যের আলোক আমাদের চামড়া ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু রেডিয়াম হইতে নির্গত আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইলে শরীরের অন্তঃস্থিত প্রত্যেকটি অংশবিশেষ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রণ্টজেন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এক্স-রে'র বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই রেডিয়াম হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা এক্স-রেরই অনুরূপ। মাত্র এক গ্রাম ওজনের রেডিয়াম হইতে এই জ্যোতিরূপে যে শক্তি নির্গত হয় তাহা এক গ্রাম ওজনের কয়লা হইতে প্রাপ্ত তাপশক্তির দশ লক্ষ গুণেরও অধিক।

রেডিয়াম যে কেবল মানুষের উপকারে আসিয়াছে, এমন নহে। বিজ্ঞানজগতে ইহা যে কত গভীর রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বলা বাহুল্য, ম্যাডাম কুরীর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। ম্যাডাম কুরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য দেশে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় ( Radioactive ) পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে রাদারফোর্ড, সডি, র‍্যাম্‌জে ও বোল্‌টউড্‌-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে ম্যাডাম কুরী অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুরীদ্বয় ও বেকেরল্‌ একত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী অতি উচ্চ সম্মানের সহিত প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-

অফ-সায়েন্স উপাধি প্রাপ্ত হন। বোধ হয় জগতের ইতিহাসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর-অফ-সায়েন্স উপাধির জন্য যে-সকল মৌলিক গবেষণা দাখিল হইয়াছে ম্যাডাম কুরীর গবেষণা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আরেনিয়াস কৃত দ্রবীভূত পদার্থের তাড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় গবেষণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বলা যাইতে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দেই ম্যাডাম কুরী ও তাঁহার স্বামী লর্ড কেল্‌ভিনের আমন্ত্রণে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে পেরী কুরী রয়াল্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে রেডিয়াম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন এবং কুরীদ্বয় রয়াল সোসাইটীর ডেভী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ম্যাডাম কুরী সোর্বনের ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এক মোটর দুর্ঘটনায় অধ্যাপক পেরী কুরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই আকস্মিক বিপদে ম্যাডাম কুরী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য এতদূর খারাপ হইয়া পড়ে যে, তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করেন। স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর তিনি পুনরায় বিজ্ঞানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর ম্যাডাম কুরী দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পাইলেন, সেই বৎসর ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য তালিকাভুক্ত করিতে ম্যাডাম কুরীর নাম উত্থাপিত হয়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উক্ত সভার ধুরন্ধর সভ্যেরা ম্যাডাম কুরীর নাম সভ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে রাজি হইলেন না। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইলেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক এ-সভার সভ্য হয় নাই এবং এ-নিয়মের এখনও ব্যতিক্রম হইবে না। বলা বাহুল্য, ইহাতে ম্যাডাম কুরীর সম্মানের কোনও হ্রাস হয় নাই—পক্ষান্তরে ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউ-টেরই সম্মানের লাঘব হইয়াছিল।

পেরী কুরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম কুরী সোর্বনের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর তিনি পলেনিয়াম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিবার জন্য লণ্ডন হইতে লর্ড কেলভিন, স্যার উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে, স্যার অলিভার্ লজ প্রমূখ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্যারীতে উপস্থিত হয়েন। বিগত (প্রথম) মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমূহের গবেষণার জন্য 'রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ম্যাডাম কুরী ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই গবেষণাগার দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার একটি অংশের নাম 'কুরী ল্যাবরেটরী', অপর অংশের নাম 'পাস্তুয়র ল্যাবরেটরী'। কুরী ল্যাবেরেটরীতে স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা হয় এবং পাস্তুয়র ল্যাবরেটরীতে এই পদার্থগুলি কি উপায়ে চিকিৎসাকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণা হয়। ফরাসী সামরিক হাসপাতালগুলিতে রেডিয়াম সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিকিৎসা-ব্যাপারে উক্ত গবেষণাগার হইতে সাহায্য আসে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ম্যাডাম কুরী

এই ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

আইরিন্ (Irene) ও ইভ (Eve) নামে ম্যাডাম কুরীর দুই কন্যা বর্ত্তমান। ম্যাডাম কুরী তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যেও কন্যাদিগের প্রতি যত্ন লইতে ক্রুটী করিতেন না। কন্যাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও আহারাদি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি নিজে আজীবন সাদাসিদা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা কখনও তাঁহাকে তিলমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতের, বিশেষতঃ ফরাসী জাতির যে বিরাট ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

---

সহ-লেখক শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী ডি. এস্‌-সি.। প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৪১।

# পাঠাগারের ব্যবহার

লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হ'লে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা ভাল বটে, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পড়া।

আগেকার দিনে পড়িয়া আর পড়াইয়া পণ্ডিতেরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল।

আজকাল আর লেখাপড়া শেখবার জন্য, জ্ঞান-অর্জ্জন করবার জন্য, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হ'লে কিছু হবে না, একথা বলা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন—প্রতিভায় উজ্জ্বল—তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি।

মেকলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আস্‌বার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুয়েজ খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয় নি। বিলেত থেকে ভারতে আস্‌তে হবে 'কেপ-অব্‌-গুড-হোপ' ঘুরে। তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তাঁর হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত।

গিবন্ অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত জ্ঞানী কয়জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে ব'সে

জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন—'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস'—এক অতি অপূর্ব্ব জিনিস।

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন্ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দুবেলা তাঁহার আহার জুটত না। একদিন তিনি তাঁহার পুস্তক-প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন, —নীচে সই করেছিলেন—'খাদ্যহীন'। এই জন্‌সন লাইব্রেরীতে প'ড়ে পড়ে জ্ঞানবান্ হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার তাঁর সঙ্গতি ছিল না।

মহাপণ্ডিত কার্লাইলের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর পিতা রাজ-মিস্ত্রীর কাজ করতেন। অতি দরিদ্র ছিলেন এঁরা। কার্লাইল বল্‌তেন—'রক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হ'য়ে জন্মাইনি, তাই মানুষ হয়েছি'।

তাঁর পিতা তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে এসে তিনি বল্‌লেন—"একমাত্র গণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নাই।" তবুও যে তিনি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালিয়ান্, কেল্ট ও জার্ম্মাণ ভাষা শিখেছিলেন।

ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে পণ্ডিত হননি। এঁদের কারও নামের পিছনে ক্যাণ্টাব, অক্‌সন্ নেই। এঁরা ভারতে থেকেই লেখাপড়া ক'রে পণ্ডিত হয়েছেন।

অনেক জাপানী লণ্ডনে যায়, বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে আনতে। তাঁদের কাউকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লণ্ডনের ডাক্তার (Doctor) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন আমাদের দেশের Doctorate কি কিছু নয় যে. আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব?

আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটাও আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল জিনিস হচ্ছে জ্ঞান-স্পৃহা।

পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার Imperial Library ও University Library থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোটকরি—যেন রাত পোহালে আমার এম. এ. এগ্‌জামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান বই খুব কম লোকেই পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটা প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা শিখে তার পর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখিতে কি সময় নষ্ট! কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে আগে জার্ম্মাণ শিখে তার পর সেই ভাষার মারফত অপর যা কিছু শিখতে হবে, তবে সে ঐ কথাকে পাগলের

প্রলাপ বলে' ভাব্‌বে। অথচ এই বিষম অস্বাভবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব শেখা যায়।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হ'তে পারে, পরের আর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি, মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে পড়া দরকার। যাকে বলে 'well-informed', তাই হওয়া দরকার। 'well-informed' না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই।*

* "মাধবী"—মেদিনীপুর—চৈত্র, ১৩৩৬।

# পাস্তয়র ও তাঁহার গবেষণা

## ( ১ )

লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করেন, তাহা চিরস্থায়ী এবং সমস্ত মানব তাহার ফল ভোগ করে। যে সকল স্বনামধন্য মনীষী নিজেদের ঐকান্তিক সাধনার বলে জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন' রাজি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, মানুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিতেছে। লুই পাস্তয়র ইঁহাদেরই অন্যতম।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের অন্তর্গত ডোলে নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে পাস্তয়রের জন্ম হয়। পাস্তয়রের পূর্ব্ব পুরুষগণ চর্ম্ম-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা জিন জোসেফ্‌ বংশানুগত চর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করেন; কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্ব কালে প্রায় তিন বৎসর (৩য় সৈনিক বিভাগে) সৈনিকের কার্য্য করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সম্মানিত হন। পাস্তয়রের শৈশবকালে আরবোয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই স্থানেই পাস্তয়রের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে 'একোল প্রিমিয়ারে' এবং পরে 'আরবোয়া' কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। কয়েকটা পরীক্ষায় পদক পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করা সত্ত্বেও শিক্ষকের মনে 'তিনি ভাল ছাত্র' বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল না। কারণ তিনি কোন বিষয়ই তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। পাস্তয়রের সদাই ইচ্ছা হইত যে, তিনি প্যারিসের বিখ্যাত একোল নর্ম্যাল ( Ecole Normale ) নামক প্রথিত নামা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সেখানকার প্রথম উপাধি পরীক্ষায় ( Bacelloureal—Bachelor's degree ) কৃতকার্য্য হন। পনর বৎসর বয়সে তাঁহার এই

সুযোগ ঘটে, এবং তিনি এক বন্ধুর সহিত প্যারীতে উপস্থিত হন। কিন্তু বাল্য সুখস্মৃতি জড়িত গ্রাম হইতে সহরের বিলাস ভূমিতে আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্ট হয়, এবং তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্যারীর আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হইল না; সুতরাং বাধ্য হইয়াই একোল নর্ম্যালে বিদ্যালাভ করার আশা জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। প্যারীতে শিক্ষালাভের আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া তিনি দুই বৎসর পরে পিতার অনুমতি ক্রমে আরবোয়া হইতে ২৫ মাইল দূরে বেসাকোঁ ( Besacor ) কলেজে শিক্ষালাভ করিতে যান এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আহারাদির ব্যয় ব্যতীত প্রতি বৎসর তিনশত ফ্রাঙ্ক বৃত্তি লাভ করেন। এই সময় তিনি কি প্রকার পরিশ্রম করিতেন তাহা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর নিকট লিখিত এক পত্র হইতে জানা যায়।

"তোমরা পরস্পরকে ভাল বাসিবে এবং অলস হইবে না। একবার কাজ করার অভ্যাস হইয়া গেলে বিনা কাজে বসিয়া থাকা যায় না। আর জানিও যে, পৃথিবীর সমস্তই মানুষের কর্ম্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।"

এইখানে শার্ল শাপুই ( Charles Chappuis ) এর সঙ্গে পাস্তুয়রের আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা নিজেদের ভবিষ্যতের জীবনধারা নিরূপণ করেন। শার্ল শাপুই একোল নর্ম্যালে প্রবেশলাভ করার একবৎসর পরে পাস্তুয়রও সেইখানে ভর্ত্তি হন। বাইশ বৎসর বয়সে পাস্তুয়র সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান লাভ করেন নাই এবং পরীক্ষকগণ তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রে মাঝারি রকম ( moderate in Chemistry ) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর পাস্তুয়র তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক এবং ব্রোমিন্ ( Bromine ) নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা এম্. বালার্ড (M. Balard) এর সহকারী নিযুক্ত হন। স্ফটিক-তত্ত্ব ( Crystallography ) সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি ঐ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম সফলতা লাভ করেন। তিন্তিড়িকাম্ল ( Tartaric acid ) হইতে উদ্ভূত একটি যৌগিক পদার্থের স্ফটিক ( Sodium Ammonium Tartrate ) লইয়া গবেষণা করিবার সময় তিনি আবিষ্কার করেন যে, এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে দুই প্রকারের স্ফটিক বর্ত্তমান আছে।* উক্ত দুই প্রকারের স্ফটিক আলোকরশ্মির দিকপরিবর্ত্তন করে ( optical rotation )। আলোকতত্ত্ব ও স্ফটিকতত্ত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তি এম্. বিয়ো ( M. Biot ) এর নিকট আবিষ্কারের বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে তিনি পাস্তুয়রকে পুনরায় ঐ পরীক্ষার যথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে বলিলেন। পাস্তুয়র পুনরায় ঐ পরীক্ষা করিলে বিয়ো দেখিলেন যে, পাস্তুয়রের সিদ্ধান্ত সত্য সত্যই নির্ভুল। বিয়োর জীবনব্যাপী সাধনা আজ পাস্তুয়রের পরীক্ষা দ্বারা জয়যুক্ত হইল। তিনি আনন্দের আবেগে

---

* তিন্তিড়িকাম্ল তেঁতুলের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

পাস্তুয়রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"প্রিয় পাস্তুয়র, আমি সারাজীবন বিজ্ঞানকে এত অধিক ভালবাসিয়াছি যে, তোমার এই আবিষ্কার আমার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে।" তখন পাস্তুয়রের বয়স মাত্র পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর।

এই সময়ে পাস্তুয়রের যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিজঁ লিসেতে (Dijon Lycee) পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে অবস্থানকালে তাঁহার গবেষণাকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য বিয়ো ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ ধারণা করিতে পারে না যে, গবেষণা কার্য্য সকল কার্য্যের উপরে।"

বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে, অনেক সময়ে যাঁহারা আজীবন মৌলিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া বহু গূঢ় রহস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনও বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিলে নানাপ্রকার কার্য্য পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে হয়। এইরূপ ধরাবাঁধা কাজে অনেক মহামূল্য সময়ের অপচয় হয়। এই কারণে পাস্তুয়রের মহামূল্য গবেষণাকার্য্যে বিঘ্ন জন্মে।

কিছুকাল পরেই বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় পাস্তুয়র ষ্ট্রাসবূর্গ এ (Strasbourg) রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এই স্থানে তাঁহার গবেষণা কার্য্যে সুবিধা ঘটে।

এই সময়ে ষ্ট্রাসবুর্গ একাডেমীর অধ্যক্ষ ছিলেন এম্. লোরাঁ (M. Lourent) তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত পাস্তুয়রের ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং কিছুদিন পরে তিনি অধ্যক্ষের কন্যা মারি লোরাঁর গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

পাস্তুয়রের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়াছেন যে, মারি লোরাঁ কেবল গৃহিণী ছিলেন না, গবেষণাকার্য্যেও তিনি পাস্তুয়রের প্রধান সাহায্যকারিণী ছিলেন। সন্ধ্যাকালে পাস্তুয়র তাঁহার দৈনিক কার্য্যাবলী বলিয়া যাইতেন এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী সেই সমস্ত একত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া পাস্তুয়রকে উহা ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। ইহাতে পাস্তুয়রের এই সুবিধা হইত যে, ঐগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময়ে তাঁহার মনে নূতন নূতন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইত এবং গবেষণাকার্য্য সত্যপথে পরিচালিত করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইত। তাঁহার দাম্পত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের না হইলে পাস্তুয়র এক জীবনে এত লোকহিতকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন কি-না সন্দেহ।

এই সময়ে তিন্তিড়িকাম্ল সম্বন্ধে গবেষণা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি 'সন্ধান' বা 'গাঁজনপ্রক্রিয়া' (fermentation) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়েন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুযোগও জুটিয়া যায়। তিনি এই সময়ে লিল্ (Lille) নগরে বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লিলের বিজ্ঞান সমিতিতে দুগ্ধাম্ল (lactic acid)* 'সন্ধান' বিষয়ে এক

* দধি তৈয়ার করিবার সময় দুধে যে দম্বল দিতে হয় তাহাতে এক প্রকার জীবাণু থাকে। এই দম্বল দেওয়ায় জীবাণুর প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং এই কারণে দুগ্ধ অম্লাক্ত দধিতে পরিণত হয়।

প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তৎকালে এই নূতন মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ক্রমাগত বিশ বৎসর পরীক্ষার পর পাস্তুয়র তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং দীর্ঘ বিরোধ-অবসানের সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিলেন যে, জীবাণু ব্যতীত 'সন্ধান' হয় না।

তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-মন্দির একোল নর্ম্যালের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে ইহার বিজ্ঞান-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এই সময়ে কতকগুলি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য তাঁহার গবেষণাকার্য্যের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মাত্র ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই ভাবিলেন যে, এইবার তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান ঘটিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় পাস্তুয়র আরোগ্যলাভ করেন এবং কিছুকাল পরেই গুটীপোকার সংক্রামক রোগের দুইটি জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রিয় মাতৃ-ভূমির নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার করেন।

এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পাস্তুয়রের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী দেশে লিয়ঁ (Lyons) নামক স্থানে কোটী কোটী টাকার রেশমের ব্যবসা হইতেছে। জাপানও এই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রেশমের ব্যবসায়ে প্রভূত লাভবান হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে রেশমশিল্প প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতে চলিল, কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের লোকের চোখ ফুটিল না। আমাদের দেশের রেশমশিল্প উন্নত করিতে হইলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

তৎকালে কোন যুদ্ধের সময় শত শত পীড়িত এবং আহত ব্যক্তি উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালগুলির উন্নতির কথা বলিতে গেলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'ক্রিমিয়ান্' যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং স্কুটারীতে (Scutari) যে সামরিক হাসপাতাল ছিল তাহার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়।

মানুষের দুঃখ এবং যন্ত্রণা দেখিলে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইত এবং তিনি দেশের এই দুর্দ্দিনে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সাইত্রিশ জন শুশ্রূষাকারিণীর সহিত তিনি স্কুটারীতে উপস্থিত হন। এই সময় তিনি যেরূপ পরিশ্রম সহকারে এবং সুচারুরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধান করিয়াছিলেন, ইংরেজ জাতির ইতিহাসে তাহা চিরকাল সুবর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি অস্ত্রোপচারের গৃহে উপস্থিত থাকিয়া নিয়ত আহত ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা ও সাহসের কথা শুনাইতেন। রাত্রিকালে একটি প্রদীপহস্তে তিনি হাসপাতালের প্রতি গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং অনেক সময় হতভাগ্য আহত ব্যক্তিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের

অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি যে-সমস্ত পরিচর্য্যার নিয়মাবলী অবলম্বন করাইলেন তাহাতে হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। তিনি আসিবার পূর্ব্বে মৃত্যু-সংখ্যা শতকরা বিয়াল্লিশ জন ছিল, কিন্তু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুসংখ্যা অবশেষে মাত্র শতকরা দুই জনে দাঁড়াইল। তাঁহার পরিশ্রমের প্রতিদানে কৃতজ্ঞ ইংরেজ জাতি চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষ টাকা উপহার দেন, এবং তিনি সেই অর্থ দ্বারা সেণ্ট টমাস্ ও কিংস্ কলেজ হাসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী-দিগের শিক্ষার জন্য 'নাইটিঙ্গেল হোম' ( Nightingale Home ) প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান্ ( Franco-Prussian ) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাতৃভূমির পরাজয়ে এবং লোকক্ষয়ে পাস্তুয়রের মনে অত্যন্ত বেদনার উদ্রেক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহারা বীরোচিত সম্মান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে সমস্ত সৈনিক সামান্য আহত হইয়া হাসপাতালে ক্ষতস্থান-বিষাক্ত (Septic) হওয়ায় অসহায় ভাবে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, তাহাদের জন্য পাস্তুয়রের দয়াদ্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পচননিবারণের জন্য পাস্তুয়র দেখাইলেন যে, মাংসের ঝোলকে উত্তপ্ত করিয়া জীবাণুবিহীন বাতাসে ( filtered air ) রাখিয়া দিলে পুনরায় পচন হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্যশরীরে পচননিবারণ সম্বন্ধে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নহে। গ্লাস্গো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক লিষ্টার পচননিবারক চিকিৎসা প্রণালীর (antiseptic treatment ) প্রবর্ত্তন করিয়া মনুষ্য জাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং এই সূত্রে জোসেফ লিষ্টার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্র-চিকিৎসক এসেক্সের অন্তর্গত আপটন্ ( Upton ) নামক স্থানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জোসেফ জ্যাক্সন্ লিষ্টার যশস্বী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জোসেফ লিষ্টার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এম. বি. ও এফ. আর্. সি. এস্. উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে হাসপাতালে অনেক রোগী তাহাদের ক্ষতস্থানে পচনের জন্য মারা যাইত। লিষ্টার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই পচনের কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি পায়েমিয়া ( Pyaemia ) নামক দুস্তর ব্যাধির কারণও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

লিষ্টারের কাজের প্রকৃত উপকারিতা বুঝিতে হইলে, আমাদের সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী মোটামুটি জানা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অস্ত্র-চিকিৎসায় জ্ঞানলোপকারী বা বেহুঁস করিবার ( anaesthetic ) পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হইলে পর তৎকালীন অস্ত্র-চিকিৎসকগণ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের দ্বারা অধিকতর সাহস এবং দক্ষতার সহিত রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার সমাধান করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই ক্ষতস্থলে পচন আরম্ভ হইয়া প্রাণসংশয় হইত। সুতরাং

তৎকালে হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসা করা ভয়ের ব্যাপার ছিল এবং লোকের শরীরের কোন স্থানে অস্ত্র-চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেহ তৎকালীন অতি বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারাও অস্ত্রোপচার করিতে সাহস করিত না।

লিষ্টার গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ হাসপাতালগুলিতে এইরূপ পচনজনিত মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া ইহার মূল কারণ নির্ণয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি রোগীর ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন এবং প্রত্যেক রোগীর নিকট তাহার ব্যবহারের জন্য পরিষ্কৃত তোয়ালে রাখিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই সকল সতর্কতা সত্ত্বেও পচনের জন্য মৃত্যু সংখ্যা কিছুই কমিল না। এই সময়ে রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পাস্তুয়রের অভিনব আবিষ্কার লিষ্টারের নিকট এক নূতন আলোক আনিয়া দিল। লিষ্টার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, পচনের সহায়ক জীবাণুগুলি বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসে। তখনকার দিনে কারবলিক এসিড জীবাণুধ্বংসের একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইত। লিষ্টার ক্ষতস্থানে কারবলিক এসিডের প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ফল এই হইল যে, ক্ষতস্থানের উপরে একটি পর্দ্দা পড়িয়া যাইত এবং ক্ষতস্থানও তাড়াতাড়ি শুখাইয়া আসিত। কিন্তু রোগীর শরীরে কারবলিক এসিডে পোড়ার ভীষণ দাগ থাকিয়া যাইত এবং সে জন্য অস্ত্রোপচারের পক্ষে ইহা রোগীদের মনঃপূত ছিল না। ইহার পরে আরও গবেষণার পর লিষ্টার বুঝিতে পারিলেন যে, বাতাসের জীবাণুগুলি ক্ষত-স্থানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর নয়। পচন কার্য্যের প্রধান সহায়ক হইতেছে চিকিৎসকের হাতের, এবং ছুরি, কাঁচি, ব্যাণ্ডেজ ও রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদের ময়লা। তিনি উপযুক্ত ঔষধের দ্বারা এই সকল জিনিস জীবাণুবিহীন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই উচ্চাঙ্গ অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যার উৎপত্তি হইল। আজও পর্য্যন্ত সকল অস্ত্রোপচারে লিষ্টার প্রবর্ত্তিত পচন নিবারক প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্র-চিকিৎসায় লিষ্টারের অমূল্য দান লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেছে।

---

সহলেখক—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী. ডি. এস্-সি.। প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩১

---

# লুই পাস্তয়র ও এডওয়ার্ড জেনার

## টীকা দিবার প্রথার প্রচলন

(২)

পাস্তয়রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়। কি প্রকারে এই ক্ষুদ্র অথচ অমিতপরাক্রমশালী শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তিনি সর্ব্বদাই সেই চিন্তা করিতেন। এই সময়ে ফরাসীদেশে দুরন্ত বিসূচিকা রোগে অনেক কুক্কুটশাবক মারা যাইতেছিল। পাস্তয়র সর্ব্বপ্রথমে কুক্কুট-শাবকগুলির বিসূচিকা রোগের জীবাণুর প্রকৃতিনির্ণয়ে মনোনিবেশ করিলেন। বিসূচিকা-পীড়াগ্রস্ত কুক্কুটশাবকগুলির রক্তের মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি জীবাণু প্রত্যক্ষীভূত করা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পাস্তয়রের রেশমীপোকা সম্বন্ধে গবেষণা বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

রেশমীপোকার রোগের জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা করিবার সময়ে পাস্তয়র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপকারিতা দেখাইয়াছিলেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা গবেষণা বিষয়ে পাস্তয়র যে সকলের অগ্রগামী ছিলেন, তাহা নয়। তাঁহার পূর্ব্বে গেরা মেনভিল ( Guirin Menneville ) রোগাক্রান্ত রেশমী পোকার শরীরের ভিতরে আণুবীক্ষণিক কণা প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ল্যবের্ ( Lebert ) এবং ফ্রে ( Frey ) রোগা-ক্রান্ত মশার রক্তের মধ্যে এবং নানাপ্রকার ডিমের মধ্যে উপরি উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলির অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

যাঁহারা জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, গবেষণাকার্য্য নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক। রসায়নবিদের নিকটে অবকাশের সময়গুলি তাঁহাদের গবেষণা কার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করে। কারণ তাঁহারা সমস্ত সময় একমনে গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত ছুটির সময় রসায়নবিদগণকে পরোক্ষভাবে এক অভিনব উপায়ে সাহায্য করে। অনেক সময় পরীক্ষালব্ধ তরল পদার্থ হইতে কঠিন দানা বাহির হইয়া আসা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘ অবকাশের পর রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ পরিশ্রমলব্ধ দানাগুলির আকৃতি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হন এবং নূতন উদ্যমে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের ( Bacteriologist ) পক্ষে এই হিসাবে অবকাশের সময় বিশেষ অনিষ্টকারী, কারণ হয়ত তাঁহারা মাসের পর মাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে যে সকল জীবাণু কালচার* করিয়াছেন, দীর্ঘ অবকাশের পরে

* কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা।

হয়ত আসিয়া দেখিবেন যে. তাঁহার কোন অলস সহকারীর যত্নের অভাবে সেই সকল জীবাণু মৃতপ্রায় এবং মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোনও কারণ বশতঃ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ অবকাশের পরে পাস্তয়র গবেষণা গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে, অবকাশের পূর্ব্বে তিনি কুক্কুট শাবকের বিসূচিকা রোগের যে সকল জীবাণু লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন সেগুলি মৃতপ্রায়। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতকগুলি পশু-পক্ষীর শরীরের ভিতরে এই মন্দীভূত জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পাস্তয়র আশা করিয়াছিলেন যে. এই জীবাণু মন্দীভূত হইলেও জন্তুগুলি জীবাণুর প্রভাবে পীড়াক্রান্ত হইবে। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, জন্তুগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে, সুস্থশরীরে তাহাদের পিঞ্জরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি পুনরায় কতকগুলি তীব্র জীবাণু সংগ্রহ করিয়া ঐ প্রাণীগুলির শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভাবিলেন, দেখা যাউক, কি হয়। যখন তিনি দেখিলেন যে, প্রাণীগুলির শরীরে এই সকল তীব্র জীবাণু প্রবেশ করান সত্ত্বেও কিছুমাত্র কুফল হইল না, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাস্তয়র বুঝিলেন যে, প্রথমে প্রাণীগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু ( attenuated virus or vaccine ) প্রবেশ করান হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা পরে তীব্র জীবাণুর তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইল। পাস্তয়র এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিলেন এই, যে মন্দীভূত জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইবার ফলে ঐ সকল প্রাণীর শরীরে কতকগুলি বিরুদ্ধ-শক্তিসম্পন্ন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত জীবাণুগুলি, ভবিষ্যতে ঐ রোগের কোনও তীব্র জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া শরীরকে নীরোগ রাখে। কিন্তু পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, লুই পাস্তয়রের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রায় সকল দেশেই বসন্ত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য টীকা গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাই, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বসন্তের বীজ নরদেহে প্রবেশ করাইয়া কৃত্রিমভাবে বসন্ত রোগের সৃষ্টি করা হইত এবং এইভাবে তাহাকে আজীবন এই ব্যাধি হইতে মুক্ত করা হইত। ভারত-গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এস. পি. জেম্‌স্ বসন্ত রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করিয়া উক্ত রোগ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার '*Small-pox and Vaccination in British India*' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, পুরাকাল হইতে বাঙলা দেশে বসন্ত রোগের প্রতীকারস্বরূপ টীকা গ্রহণ করিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। অবশ্য কতকগুলি লোক ধর্ম্মসংস্কারের জন্য টীকা লইত না; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তৎকালীন প্রথানুসারে টীকা লইবার পদ্ধতি খুবই প্রচলিত ছিল। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক আটটি বা দশটি পরিবারের জন্য একটি করিয়া টীকাদার ছিল। তাহারা তৎকালীন দেশীয় প্রথানুসারে লোকদিগের শরীরের মধ্যে বসন্তরোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া টীকা দিত। উক্ত বৎসরে কেবলমাত্র কলিকাতা সহরেই আটষট্টি জন টীকাদারের নাম ও ঠিকানা পাওয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা

যায় যে, ঐ সময়ে শতকরা একাশী জন লোক দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া বসন্তরোগের প্রতীকার স্বরূপ টীকা গ্রহণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে টীকা লইবার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে চিত্তাকর্ষক হইবে। হল্‌ওয়েল্ (Holwell)এর ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ প্রবন্ধ হইতে ইহা গৃহীত।

তখনকার দিনে একদল ব্রাহ্মণ ছিল, যাহাদের ব্যবসায়ই ছিল লোকদিগকে টীকা দেওয়া। তাহারা তিনচারি জন একত্র হইয়া এই উদ্দেশ্যে বাহির হইত এবং তাহাদের ভ্রমণের সময় ও স্থান এরূপভাবে নির্ব্বাচন করিত যাহাতে তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থান-গুলিতে বসন্তরোগের সংক্রমণ আরম্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পৌছাইতে পারে। বাঙলা দেশে তাহারা সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগ হইতেই টীকা দেওয়া আরম্ভ করিত। বাঙলা দেশের অধিবাসীরা বুঝিতে পারিত যে, কোন্ সময়ে এই সকল টীকাদারের আবির্ভাব হইবে, এবং তজ্জন্য তাহারা এই সময়ের একমাস পূর্ব্ব হইতেই মৎস্য, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি জিনিস আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিত না, কারণ এই সমস্ত নিয়ম পালন না করিলে তাহারা টীকা লইতে পারিত না। যখন টীকাদার ব্রাহ্মণের দল আসিয়া বাড়ী বাড়ী টীকা দিতে আরম্ভ করিত, তাহারা কোনও লোককে টীকা দিবার পূর্ব্বে সে ঐ নিয়মগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিত। শিশুদিগকে টীকা দিবার পূর্ব্বে কয়টি গুটি দ্বারা টীকা দিতে হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহাদের পিতামাতার সম্মতি লওয়া হইত। যাহারা টীকা লইবে তাহাদের অভিপ্রায়মত শরীরের যে-কোনও স্থানে টীকা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু প্রায়ই টীকাদারের অভিপ্রায়-অনুসারে সাধারণতঃ পুরুষের কনুই হইতে হাতের কব্জার মধ্যভাগে যে-কোন জায়গা এবং স্ত্রীলোকের ঘাড়ের উপরি-ভাগের যে-কোন জায়গা মনোনীত করা হইত। টীকার স্থান ক্ষত করিবার পূর্ব্বে টীকাদার হাতে এক টুকরা পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় লইয়া টীকা দিবার স্থান আট-দশ মিনিট ধরিয়া বেশ করিয়া ঘসিয়া দিত এবং তাহার পরে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা একটু রৌপ্যমুদ্রার আকৃতি পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া অনেকবার খুব সামান্য সামান্য আঘাত করিয়া একবিন্দু রক্ত বাহির করিত। তখন সে তাহার কোমরে-জড়ান একটি কাপড়ের থলি হইতে একটি তূলার গুটি বাহির করিত। এই তূলার গুটিতে গো-বসন্তের বীজ রক্ষিত থাকিত। টীকাদার এই তূলার গুটিটি অতি যত্নসহকারে দুই-তিন ফোঁটা গঙ্গার জলে ভিজাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিত। সেই জায়গাটি তখন একটি ছোট কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ছয় ঘণ্টার পরে এই ব্যাণ্ডেজ অপসারিত করা হইত এবং তূলার গুটিটি যতক্ষণ না আপনা হইতে শুকাইয়া পড়িয়া যায় ততক্ষণ উহাকে সেই জায়গায় রাখা হইত। এই সকল তূলার গুটির মধ্যে একবৎসর আগে টীকা লইয়া বসন্তরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ লোকের গুটি রাখা হইত। তখনকার টীকাদারেরা কখনও টাট্‌কা অথবা স্বভাবজাত বসন্তরোগের রোগের গুটি দিয়া টীকা দিত না।

যে-দিন টীকা দেওয়া হইত তাহার পরের দিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় রোগীকে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথার উপরে চার বালতি ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া হইত। এই প্রক্রিয়া তিন-চারি দিন ধরিয়া করিবার আদেশ ছিল, যতক্ষণ না রোগী বেশীরকম জ্বরে আক্রান্ত হয়। ইহার পর দুই-তিন দিন ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্নান করান বন্ধ রাখা হইত এবং এই সময়ের মধ্যে রোগীর শরীরে বসন্তরোগের গুটিগুলি বেশ ফুটিয়া উঠিত। তখন আবার জ্বরের মধ্যেই ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্নান করান সুরু করা হইত, যতদিন না বসন্তরোগের গুটিগুলি শুকাইয়া পড়িয়া যাইত। গুটিগুলি ভাল করিয়া শুকাইবার পূর্ব্বেই টীকাদারের নির্দ্দেশ থাকিত যে, গুটিগুলি খোঁচা দিয়া উঠাইয়া ফেলিতে পারা যায়। রোগীকে মুক্ত বাতাসে বসিতে এবং মুক্ত বাতাসে চলাফেরা করিতে আদেশ দেওয়া হইত, এবং ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার পরে দেবদেবীকে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। টীকাদার তাহার পারিশ্রমকস্বরূপ একপণ কড়ি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত।

ইহা ভিন্ন যে-বাড়ীতে টীকা দেওয়া হইয়াছে সে-বাড়ীর লোকেরা যাহাতে টীকা লইবার পরে একুশ দিনের মধ্যে অন্য বাড়ীতে না যায়, এবং অন্য বাড়ীর লোকেরা ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের বাড়ীতে না আসে—তদ্বিষয়ে কঠিন নিষেধ ছিল। কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া কাপড় বদলাইতে হইত। ঐ সময়ের মধ্যে কোনও নাপিত সেই বাড়ীতে ক্ষৌরকার্য্য করিতে আসিতে পারিত না। এই সকল সতর্কতাসত্ত্বেও যাহাতে টীকা দ্বারা বসন্তরোগের বিস্তার না হয়, সেই জন্য টীকাদারদিগের নিয়ম ছিল যে, কোনও গ্রামে অধিকাংশ লোকেই টীকা গ্রহণ না করিলে—সেই গ্রামে কাহাকেও টীকা দেওয়া হইবে না। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোক অথবা অন্য কোনও লোক যাহারা বিশেষ কোনও কারণে টীকা লইতে পারে না, তাহাদিগকে একুশদিনের জন্য গ্রাম হইতে সরাইয়া দেওয়া হইত। যাহারা টীকা লইত, রোগমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পুষ্করিণীতে স্নান করা তাহাদিগের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

হল্ওয়েল্ স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দেশে উপরিউক্ত প্রণালীদ্বারা টীকা গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ লোকের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা দুইশতের মধ্যে একজনেরও কম ছিল, এবং এই প্রসঙ্গে জেম্‌স্‌ও স্বীকার করিয়াছেন যে, "There can be no doubt that in those comparatively olden times a high degree of knowledge in regard to the procedure necessary for success have been attained"—"এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সেই অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালেও বসন্তরোগের প্রতিকারের খুব উচ্চাঙ্গের ফলপ্রদ প্রণালী ভারতীয়গণের জানা ছিল।" জেম্‌স্ আরও বলিয়াছেন—"We see then that in olden times when all the rules just enumerated were strictly enforced and when the operation was performed by the professional Brahmin inoculators only, the measure proved a real blessing

to the inhabitants of a certain part of India."—"আমরা দেখিতে পাই যে, অতি প্রাচীনকালে, যখন উপরিউক্ত নিয়মাবলী যথাযথরূপে পালন করা হইত এবং যখন টীকা দেওয়ার ভার পেশাদার ব্রাহ্মণ টীকাদারদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে তৎকালীন বসন্তচিকিৎসার প্রণালী সত্যসত্যই প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।"

যতদিন শিক্ষিত টীকাদার সম্প্রদায়ের হাতে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল, ততদিন ভারতীয় টীকাপ্রণালী পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও স্থানের টীকাপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ছিল। কিন্তু ক্রমে অর্থপিপাসু লোকদের হাতে ইহা একটি অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হয় এবং টীকার পারিশ্রমিক একপণ কড়ি হইতে ক্রমে এক, দুই হইতে দশটি রৌপ্যমুদ্রা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। কালে নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ হিন্দুরা অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য এই ব্যবসা আরম্ভ করে। ইহারা যে টীকা দেওয়ার প্রণালী সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল, তাহা নয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নির্লোভ ব্রাহ্মণ টীকাদারের ন্যায় ইহাদের জনসাধারণের উপরে প্রভাব না থাকায় টীকাজনিত বসন্তরোগের বিস্তারের বিরুদ্ধে যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক তাহা যথাযথ পালন করা হইত না, অর্থলোলুপ অশিক্ষিত লোকের হস্তে পড়িয়া ইহার ফল এই হইল যে, টীকা দেওয়ার দরুণ অসংখ্য লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিল, এবং রোগের প্রসার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।* ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত গভর্ণমেণ্টের বিশেষ আইন অনুসারে দেশী বা বাংলা টীকা দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

ইংলণ্ডে মেরী ওর্টলি মণ্টেগু ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রোগের প্রতিকারস্বরূপ টীকা লইবার পদ্ধতির উপকারিতা দেখাইয়া যান। ঐ চিরস্মরণীয়া মহিলা তুর্কীস্থানে কনষ্টাণ্টি-নোপল্ নামক সহরে ইংরেজ রাজদূতের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তুর্কীস্থানে বসন্তরোগের প্রকোপ আদৌ নাই, এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেখানকার লোকে বসন্তরোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শরীরের কোনও স্থানের শিরা কাটিয়া বসন্তরোগের জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা সাময়িকভাবে অসুস্থ হয় বটে, কিন্তু বসন্তরোগ হইতে আজীবন রক্ষা পায়।

তখন ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র লোক বসন্তরোগে মারা যাইত। মেরী ওর্টলি মণ্টেগু স্বদেশে ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথমে নিজের কন্যাকে টীকা দেওয়াইলেন। তখন হইতেই ইংলণ্ডে টীকা লইবার পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা হইল। কিন্তু দেখা গেল যে, তদানীন্তন পদ্ধতি দ্বারা টীকা লইবার ফলে যে ব্যক্তি টীকা গ্রহণ করিত সে নিজে বসন্তরোগের

* প্রফুল্লচন্দ্রের "A History of Hindu Chemistry" ১ম ভাগের ১০৫-১০৭ পৃষ্ঠার সারাংশ তুলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে কিরূপে অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা ও অনুসন্ধিৎসা ভারতবর্ষ হইতে কিছুকালের জন্য তিরোহিত হয়।

আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিত বটে, কিন্তু আশেপাশের লোকদিগের মধ্যে বসন্তরোগ ছড়াইয়া পড়িত। সুতরাং সেই সময় টীকাগ্রহণ করিবার পদ্ধতি জনপ্রিয় হয় নাই, এবং আরও কার্য্যকর প্রতিষেধক ঔষধের আবিষ্কার করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। জেনার নামক একজন সাধারণ চিকিৎসক এক অভিনব উপায়ে এই ঔষধের আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে জেনারের গবেষণা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এডওয়ার্ড জেনারের পিতা একজন ধর্ম্মযাজক এবং তাঁহার মাতা একজন ধর্ম্মযাজকের কন্যা। জেনারের মাতুল বংশের সকলেই ধর্ম্মযাজক ছিলেন এবং তাঁহার সকল ভগিনীরই ধর্ম্মযাজকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হয় এবং ব্রিস্টলের নিকটবর্ত্তী সড্‌বেরী (Sodbury) নামক স্থানে ড্যানিয়েল লাড্‌লো (Daniel Ludlow)এর অধীনে শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে গমন করেন।

জেনার যখন হাসপাতালে লাড্‌লোর সহকারীরূপে কাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটি গ্রাম্য বালিকা সেখানে চিকিৎসার জন্য আসে। যখন বালিকাটিকে শোনান হইল যে, হয়ত সে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তখন সে দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, "আমার বসন্তরোগ কখনই হইতে পারে না, কারণ ইতিপূর্ব্বে আমার গো-বসন্ত হইয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া জেনারের মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়, কারণ তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে, গ্লষ্টারসায়ারের গোয়ালা ও গোয়ালিনীদিগেরও এইরূপ ধারণা ছিল। তখন হইতেই তিনি মনে মনে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জেনারের মন কিরূপ অনুসন্ধিৎসু ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায়। যখন তিনি সড্‌বেরীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন এই প্রশ্ন ওঠে যে একটি মোমবাতির অগ্নিশিখার কেন্দ্রস্থলে অথবা উপরিভাগে-কোন স্থানে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম? অল্পভাষী জেনার বেশী বাদানুবাদ না করিয়া মোমবাতিটিকে আপনার নিকটে টানিয়া লইলেন এবং অগ্নিশিখার কেন্দ্রস্থলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি অগ্নিশিখার উপরিভাগে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা সরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে সহজেই উপরিউক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল।

চিকিৎসাবিদ্যা সমাপন করিয়া জেনার গ্লষ্টারসায়ারে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার সহস্র কাজের মধ্যেও তিনি গো-বসন্তের অদ্ভুত প্রভাবের বিষয় ভুলিতে পারেন নাই, এবং অতিশয় আগ্রহ-সহকারে এই বিষয়ে গোয়ালাদিগের গল্প শুনিতেন। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অতিশয় সহিষ্ণুতাসহকারে তিনি এই বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জেনার লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, গোজাতির মধ্যে বসন্তরোগ অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করে। সুতরাং জেনার অনুমান করিলেন যে, যদি গো-বসন্তের বীজ

মানুষের শরীরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে মনুষ্যজাতির মধ্যে বসন্তের প্রকোপ সম্ভবতঃ কম হইবে। জেনার আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কোন লোকের একবার বসন্তরোগ হইলে, পরে সে প্রায়ই দ্বিতীয়বার ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। এই ব্যাপার হইতেও জেনার অনুমান করিলেন যে, গো-বসন্ত সাধারণ বসন্তরোগ অপেক্ষা কম মারাত্মক। সুতরাং গো-বসন্তের বীজ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে মারাত্মক বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

এ-বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গিয়া জেনারকে পদে পদে বাধা পাইতে হইল। তিনি দেখিলেন যে, বসন্ত-রোগাক্রান্ত গরুর শরীরের কোন কোন গুটির জীবাণু মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করে বটে; কিন্তু ইহাও দেখিলেন যে, একই গরুর অন্যান্য গুটির জীবাণু মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। উপরন্তু ঐ জীবাণু মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করাইবার ফলে সে মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় জেনার কিছু বিচলিত হইয়া পড়িলেন, এবং এই উপলক্ষ্যে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার প্রতি অসংখ্য বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু অসামান্য সহিষ্ণুতা সহকারে জেনার এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই তাঁহার পরিশ্রম সফল হইল। তিনি দেখাইলেন যে, আসল গো-বসন্তের জীবাণুগুলি ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে উহা খুবই মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র এই অবস্থাতেই জীবাণুগুলি মনুষ্যশরীরকে বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই সময়ে জেনার একটি চিকিৎসা-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি সেই চিকিৎসা-সমিতির একটি অধিবেশনে দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, মানুষকে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গো-বসন্তের জীবাণু ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সমিতি হইতে বহিষ্কৃত করিবার ভয় দেখায়।

জেনারের গবেষণার প্রকৃত উপকারিতা ও তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সেই সময়ে বসন্তরোগ যে মহামারীর সৃষ্টি করিত তাহার বিবরণ জানা দরকার। মানুষ তখন সমস্ত ব্যাধির মধ্যে বসন্তরোগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করিত। যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে তাহার আর দ্বিতীয় আক্রমণের বিশেষ ভয় থাকিত না। কিন্তু যাহার কখনও বসন্তরোগ হয় নাই, সে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত। বলা বাহুল্য, বসন্তরোগ এত সংক্রামক যে, মানুষ খুব সাবধানে থাকিয়াও এই ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত না। এক সময়ে মেক্সিকো দেশে কয়েকমাসের মধ্যেই ষাট লক্ষ লোক বসন্তরোগেমারা যায়, এবং খৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যাধি মহামারীরূপে চীনদেশকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধির ভয় এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, সন্তান বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইলে মাতা তাহাকে নিরাশ্রয়ভাবে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন ঘটনাও শোনা যায় যে, বসন্তের ভীষণ মহামারীর সময়ে পিতা, পরিবারের সকলকে ডাকিয়া বসন্ত-রোগাক্রান্ত মানুষের চেহারা কিরূপ ভীষণ আকৃতি ধারণ করে, তাহা দেখাইতেন

এবং এইরূপ ভয়াবহ পরিণামের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সকলকে আত্মহত্যা করিতে উপদেশ দিয়া নিজে সর্ব্বাগ্রে তাহার পথ দেখাইতেন। এক হিসাবে প্লেগের মহামারীর প্রকোপ অপেক্ষা বসন্ত মহামারীর প্রকোপ আরও ভয়াবহ, কারণ প্লেগের প্রকোপ বহু বৎসর অন্তর একবার করিয়া হয়, কিন্তু বসন্তরোগের প্রকোপ প্রতি বৎসর লাগিয়াই আছে। বার্নোলি ( Bernoulli ) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে প্রতি ২৫ বৎসর ১৫,০০০,০০০ লোক বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্তরোগ মনুষ্যজাতির কি ভীষণ ক্ষতি সাধন করে, উপরিউক্ত মৃত্যুসংখ্যা হইতে তাহার একাংশ মাত্র জানা যায়। কারণ বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াও যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোটি কোটি লোক অন্ধ অথবা অঙ্গহীন হইয়া কালযাপন করে।

মনুষ্যজাতির এই ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য জেনার মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার অস্ত্র হইল একখণ্ড হস্তিদন্তের উপরিভাগে এক তিল জীবাণু। অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া জেনার তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত মত ও অনুমান সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

সারা নেল্‌মস্ ( Sarah Nelmes ) নামক এক গোয়ালিনী গো-বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। জেনার এই স্ত্রীলোকটির হাত হইতে বসন্তরোগের গুটি লইয়া জেম্‌স্ ফিপ্‌স্ ( James Phipps ) নামক একটি আট বছরের স্বাস্থ্যবান বালকের বাহু চিরিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহার দুই মাস পরে বালকটির শরীরের মধ্যে বসন্তরোগের তীব্র জীবাণু প্রবেশ করান হইল। বালকটিকে ইতিপূর্ব্বে মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা টীকা দেওয়া না হইলে সে কিছুতেই সেই জীবাণুর শক্তি সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে দেখা গেল যে, বালকটির কোনই অনিষ্ট হইল না। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষায় সফল হওয়ায় জেনারের নাম ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এতদিনে কোটি কোটি লোককে বসন্তরোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইল।

অবশ্য টীকা লইবার পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদী লোকের কখনও অভাব হয় নাই। একজন ধর্মযাজক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া বসন্তরোগ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা যে মানুষ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। মোজ্‌লে (Moseley) নামক এক ডাক্তার জাহির করিলেন যে, গরু বা অন্য কোনও নিম্নস্তরের জন্তুর শরীর হইতে কোনও দ্রব্য মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সেই মানুষও পশুভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু বসন্তরোগের মহামারী সকল দেশেই এরূপ ভয়াবহ ছিল, যে, উপরিউক্ত বিরুদ্ধবাদ সত্ত্বেও লোকে দলে দলে আগ্রহসহকারে টীকা লইতে লাগিল এবং বলা বাহুল্য, শীঘ্রই ইহার সুফল ফলিল। ক্রমে টীকা লইবার পদ্ধতি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। লোকে ইহাকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং দেশে দেশে জেনার ঈশ্বরের দূত বলিয়া অভিনন্দিত ও সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

যে বিভীষিকাময় বসন্তরোগের প্রকোপে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অকালে কালের করালকবলে পতিত হইত, আজকাল একটি সাধারণ রোগের জন্য মৃত্যুসংখ্যা গণনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অন্যান্য রোগের তুলনায় বসন্তরোগের দরুণ মৃত্যুসংখ্যা নিতান্তই সামান্য।

---

সহলেখক—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি.এস্‌-সি.। প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৪১।

# লুই পাস্তয়র ও তাঁহার গবেষণা

## ( ৩ )

জেনার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত টীকা লইবার প্রণালী প্রচারিত হইবার প্রায় এক শতাব্দী পরে পাস্তয়র পরীক্ষাগারে টীকা লইবার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। জেনারের আবিষ্কারের সহিত পাস্তয়রের আবিষ্কারের প্রধান পার্থক্য এই যে, জেনারের পদ্ধতি অনুসারে টীকা দেওয়ার জীবাণুগুলি কোনও জীবন্ত প্রাণীর শরীরের মধ্যে কালচার করিতে হয়, কিন্তু পাস্তয়র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রণালী দ্বারা জীবাণুগুলি কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব।

পাস্তয়রের এই আবিষ্কারের সহিত কতকগুলি তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। প্রথমতঃ বেশ বোঝা গেল যে, উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা কোনও রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা ইচ্ছামত কমান সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই যে, এই মন্দীভূত জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইবার পরে প্রাণীর শরীরে সাময়িকভাবে যে সামান্য প্রকারের রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ প্রাণীকে ভবিষ্যতে উক্ত শ্রেণীর তীব্র জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। যে জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ক্রমান্বয়ে যত তীব্র এবং যত বেশী টাট্‌কা হয় তাহার উপকারিতাও তত অধিক। পাস্তয়র পরে দেখাইয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন রকমের।

য়্যানথ্‌্রাক্স (Anthrax) রোগে যখন ফরাসী দেশের গৃহপালিত গবাদি পশুদিগের মধ্যে শতকর ১০টি মারা যাইতেছিল, সেই সময় চিকেন্ কলেরার (chicken cholera) জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া পাস্তয়র য়্যানথ্‌্রাক্স রোগের (গো-বসন্তের প্রকারভেদ) প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিলেন। তিনি য়্যানথ্‌্রাক্সের জীবাণুগুলিকে কালচার করিলেন এবং উহা নানাপ্রকার জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে টীকাতত্ত্বের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে এক নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, যদি পঁচিশটি মেষশাবকের শরীরে য়্যান্থ্রাক্স রোগের মন্দীভূত জীবাণু দ্বারা টীকা দেওয়া হয় এবং কিছুকাল পরে ঐ পঁচিশটি মেষশাবকের শরীরে অতি তীব্র য়্যান্থ্রাক্স রোগের জীবাণু প্রবেশ করান হয়, তাহা হইলে প্রথম পঁচিশটি ভেড়া যাহাদের টীকা দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে; কিন্তু শেষোক্ত পঁচিশটি মেষ শাবক যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পাস্তুয়রের সহযোগী ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাস্তুয়র উহাতে আশাহত হন নাই। সত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় তিনি স্থির করিলেন যে, সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে পুঁইয়ি ল্য ফোর এর ( Pouillyha Fort ) কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষবাদী বহুসংখ্যক কৃষক, চিকিৎসক ও পশু বৈদ্যের সম্মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বিপক্ষবাদীরা তাঁহাকে অবিশ্বাসের ভয় প্রদর্শন এবং অসংখ্য বিদ্রূপবাণী বর্ষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। সেইদিন পঁচিশটি মেষশাবককে একটি মন্দীভূত জীবাণুর 'কালচার' দ্বারা টীকা দেওয়া হয়। বার দিন পর্য্যন্ত ঐ মেষশাবকগুলি ভাল থাকিবার পর ১৭ই মে তারিখে তাহাদের শরীরে পুনরায় আরও তীব্র জীবাণু প্রবেশ করান হইল। পূর্ব্বের প্রতিষেধক টীকা না দেওয়া হইলে দ্বিতীয় বারের টীকার তীব্র জীবাণু দ্বারা অন্ততঃ অর্দ্ধেক মেষশাবক মারা যাইত। কিন্তু পাস্তুয়র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মেষশাবকগুলির শরীরে মন্দীভূত জীবাণু থাকার দরুণ উহাদের তীব্র জীবাণুগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং সেইজন্য পরে শক্তিশালী জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেও কোন অপকার বা অনিষ্ট হইবে না। সকলে শঙ্কিতচিত্তে উক্ত ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। এক পক্ষকাল অতীত হইল, কিন্তু একটি মেষশাবকও অসুস্থ হইল না। চারিদিকে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ৩১ শে মে তারিখে শেষবার টীকা দেওয়ার জন্য পুনরায় সকলে সমবেত হইলেন। পাস্তুয়রের বিরুদ্ধবাদিগণের ভিতরে অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। সেই সময়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, পাস্তুয়র তীব্র বীজাণুর বদলে মন্দীভূত জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন, এবং যেস্থলে মন্দীভূত জীবাণু দেওয়ার কথা সেই স্থলে তীব্র জীবাণু ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষাস্থলে কেহ কেহ জীবাণু রাখিবার পাত্রটিকে 'ঝাকাইয়া' দিলেন। কিন্তু পাস্তুয়র তাহাদের এই বিদ্রূপ ও কটূক্তিতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া ক্রমে অনেক শত্রুপক্ষীয় লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অবশেষে এই পরীক্ষার শেষ ফল দেখিবার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে ২রা জুন দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

নির্দ্দিষ্ট তারিখে সকলে একত্র হইয়া ফলাফল দেখিবার নিমিত্ত কৃষিক্ষেত্রে আগমন

করিলেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে পঁচিশটি মেষশাবককে পূর্ব্বে মন্দীভূত জীবাণুদ্বারা টীকা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু প্রথমেই তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে বাইশটি গতায়ু হইয়াছে, দুইটি মুমূর্ষুপ্রায় এবং বাকী একটি অসুস্থ, তবে মৃতপ্রায় নহে। আর যে পঁচিশটি মেষশাবককে প্রথমে মন্দীভূত জীবাণু দিয়া পরে তীব্র জীবাণু দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সুস্থ। কেহ কেহ বা পরস্পরের সহিত শক্তি পরীক্ষায় ব্যস্ত। এই ফল দেখিয়া উপস্থিত সকলেই সমস্বরে এবং উৎসাহ সহকারে পাস্তুয়রকে অভিনন্দিত করিল। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় ঘটিল।

পাস্তুয়র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত য়্যান্থ্রাক্স রোগের চিকিৎসাপ্রণালী ফরাসীদেশের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে জানা যায়। তাহাতে দেখা যায় যে ৩,৪০০,০০০ ভেড়ার মধ্যে মাত্র শতকরা একটি এবং ৪৩৮০০০ গবাদি পশুদিগের ভিতরে হাজারের মধ্যে একটিরও কম য়্যান্থ্রাক্স রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার ফলে ফরাসী দেশের মোট চল্লিশ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যেমন কৃত্রিম উপায়ে রোগের জীবাণুগুলি মন্দীভূত করা হয়, সেইরূপ কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা রোগের জীবাণুগুলিকে তীব্রতর করা সম্ভব কি না? ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পাস্তুয়র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, য়্যান্থ্রাক্স রোগের জীবাণুগুলির তীব্রতা নষ্ট করিবার পরে নবজাত কোমলাঙ্গ ইঁদুরের দেহের মধ্যে এই মৃতপ্রায় জীবাণু সঞ্চারিত করিলে জীবাণুগুলি অধিকতর সতেজ হইয়া উঠে। তখন এই নবজাত ইঁদুরের রক্ত একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ইঁদুরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, এবং ক্রমান্বয়ে খরগোস, ভেড়া এবং পরিশেষে গরু অথবা অশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে জীবাণুগুলির তীব্রতা ও তেজ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। নানাপ্রকার রোগের জীবাণুকে এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে তীব্র হইতে তীব্রতর করার পদ্ধতি জীবাণুতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে।

জীবাণুতত্ত্ববিষয়ে উপরি উক্ত আবিষ্কার পাস্তুয়রের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। পাস্তুয়র তাঁহার সমস্ত জীবনে যদি কেবল মাত্র এই একটি বিষয়ে গবেষণা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন! কিন্তু পাস্তুয়রের প্রতিভা বহুশাখামুখী। তাঁহার প্রত্যেকটি আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতের এক একটি স্তম্ভস্বরূপ।

পাস্তুয়রের জীবাণুসম্বন্ধীয় গবেষণা ও আবিষ্কার পৃথিবীতে যে কি মহদুপকার সাধন করিয়াছে আধুনিক খাদ্যদ্রব্য রক্ষণপ্রণালী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে, কোনও প্রকার আহার্য্য দ্রব্য যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে যে, যতই সময় যায় ততই পচন কার্য্যে সহায়ক জীবাণুগুলি ক্রমে আহার্য্য দ্রব্যের

মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্প ও উষ্ণতা এই উভয়বিধ অবস্থা ঐ জীবাণুগুলি পোষণের ও বর্দ্ধনের পক্ষে অনুকূল। দশ হইতে চল্লিশ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রীর উত্তাপের মধ্যে এই জীবাণুগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ৬৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই জীবাণুগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকেই জানেন যে, সাধারণ অবস্থায় কোনও পাত্রের মধ্যে দুধ বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ব্যাসিলাস এসিডি ল্যাকৃটিসি ( Bacillus acidi lactici ) নামক একপ্রকার জীবাণু দুধের মধ্যে সংখ্যায় ও আকৃতিতে ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু দশ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রীর উত্তাপের কমে ইহারা আদৌ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয় না। পনেরো ডিগ্রীর উত্তাপের সময় হইতে ইহারা ধীরে ধীরে দুগ্ধাম্ল ( lactic acid ) প্রস্তুত করিতে থাকে, এবং পয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ ডিগ্রীর মধ্যে এই জীবাণুগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হয়। ৪৬ ডিগ্রীর উত্তাপের উপরে এই জীবাণুগুলির শক্তি একেবারে কমিয়া যায়। সুতরাং যদি আহার্য্য দ্রব্যকে অল্পক্ষণের জন্য ১০০ ডিগ্রীর উত্তাপে গরম করা যায়, এবং তাহার পরে এরূপভাবে রক্ষিত করা হয়, যাহাতে কোনও জীবাণু ঐ আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে চিরকালের জন্য ঐ আহার্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় রাখা যাইতে পারে। আহার্য্য দ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখিবার এই প্রথাকে ইংরেজী কথায় 'Sterilization' বলে। এই প্রণালী প্রধানতঃ টিনের কৌটা করিয়া নানা প্রকার ফল ও খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহার্য্য দ্রব্যকে অবিকৃত ও সুখাদ্য অবস্থায় সংরক্ষিত রাখিবার দ্বিতীয় প্রথাকে ইংরেজী ভাষায় pasteurization বলে। এই প্রণালী অনুসারে আহার্য্য দ্রব্যকে ৬৫ হইতে ৭০ ডিগ্রীতে বিশ মিনিট ধরিয়া গরম করিতে হয়। ইহাতে আসল জীবাণু সমস্তই বিনষ্ট হইবে, এবং ঐ সকল অপেক্ষাকৃত বড় বড় জীবাণু হইতে জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি ( spores ) মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তাহার ফলে গাঁজন ( fermentation ) ও পচন ( decomposition ) প্রক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে এবং নূতন জীবাণু আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়া বর্দ্ধিত না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা শেষোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত গাঁজন বা পচন প্রক্রিয়া দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য নষ্ট হইবে না। য়্যানথ্রাক্স, টিটেনাস্ ও সম্ভবতঃ অতিসার উদরাময় ( epidemic diarrhoea ) ব্যতীত সকল প্রকার ব্যাধির জীবাণুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উৎপন্ন করে না। সুতরাং উপরি উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তাহারা বিনষ্ট হইবে। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ রক্ষণার্থে, এই প্রণালী সকল দেশেই ব্যবহার করা হয়। এই প্রণালী দ্বারা রক্ষিত দুগ্ধ ব্যবহার করিলে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে অজীর্ণতা অথবা স্কার্ভি রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা কম।

আহার্য্য দ্রব্য সংরক্ষণের আরও একটি প্রণালী আছে। ১০ সেন্টীগ্রেড ডিগ্রীর নীচে আহার্য্য দ্রব্যকে রাখিলে জীবাণুগুলি সংখ্যায় ও আকৃতিতে বাড়িতে পারে না এবং উত্তাপ আরও বেশী না-বাড়া পর্য্যন্ত জীবাণুর প্রক্রিয়া সম্ভব হইবে না। এই প্রণালী

সাধারণতঃ মৎস্য ও মাংসের পচননিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই যে, দূর-দূরান্তর হইতে নানা প্রকার মৎস্য বরফের সাহায্যে ঠাণ্ডা করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা হয়। বরফ দেওয়া মাছ ও মাংস, টাটকা মাছ ও মাংসের মতই পুষ্টিকর ও সুপাচ্য খাদ্য। ইউরোপে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে দুধ সরবরাহ করিবার সময় এই প্রণালী বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরিউক্ত তিন প্রকার প্রণালী ব্যতীত নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আহার্য্যদ্রব্য-সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে লবণের ব্যবহার বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মৎস্য, মাংস, মাখন, পনির প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য রক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে লবণ ব্যবহৃত হয়। কোন কোনও স্থলে লবণ ও সোরা ( saltpetre ) একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় সোহাগা, বোরিক্ এসিড্ ও ফরম্যালডিহাইড্ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুধ, মাখন, মাছ ও মাংসের তৈরী নানা প্রকারের আহার্য্য দ্রব্য ও ঘনীভূত দুধ ( condensed milk ) এই উপায়েই সাধারণতঃ রক্ষিত হয় এবং এক দেশ হইতে অন্যদেশে প্রেরিত হইতে পারে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাস্তুয়র জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। কিন্তু এই জীবাণু অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া ইহা লইয়া কাজ করা বিপজ্জনক। তদুপরি আরও একটি বিশেষ অন্তরায় এই যে, এই বিষ প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করাইবার পরে রোগ প্রকাশ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পাস্তুয়রের সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, লালাস্রাবের সহিত এই জীবাণু নিঃসৃত হয়। কিন্তু পাস্তুয়র দেখাইলেন যে, এই জীবাণু মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে অধিষ্ঠান করে। তিনি প্রমাণ করিলেন, যে কুকুর জলাতঙ্ক রোগে মরিয়াছে তাহার ঘাড়ের শিরদণ্ড ( Medulla Oblongata ) লইয়া অন্যপ্রাণীর দেহে ঢুকাইলে সেই প্রাণীতে এই রোগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইল না, কারণ ইহাতেও দেখা গেল যে, কোন কোনও ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও এই রোগ প্রকাশিত হয় না। পাস্তুয়র স্থির করিলেন এই জীবাণু দেহের অন্য কোন স্থানের পরিবর্ত্তে যদি মাথার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই এই রোগ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু ইহাতে পশুটির অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে ভাবিয়া তিনি নিজ হাতে এ-কার্য্যটি করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি পরীক্ষাগার হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার সহকর্ম্মী রাউক্স ( Roux ) এই কার্য্য সাধন করিলেন। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত জন্তুটির শরীরে রোগ অনিবার্য্য প্রকাশিত হয়, এবং রোগ-প্রকাশ হইতে কখনও বিশ দিনের বেশী সময় লাগে না। পরে পাস্তুয়র বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন জলাতঙ্কের জীবাণু প্রস্তুত করিয়া কুকুরের দেহে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই মন্দীভূত জীবাণু ইহার শরীরে প্রবেশ করাইবার পর ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে কোন অপকার হয় না। কিছুদিন পরে তিনি আরও দেখিলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পরেও উক্ত জীবাণু আহত কুকুরের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে আর কোনও অপকার হয় না।

প্রায় এক বৎসর ধরিয়া পাস্তর পশুদের শরীরে এইরূপ পরীক্ষা করিলেন; মনুষ্যদেহের উপর এইরূপ পরীক্ষা করিবার সাহস তাঁহার হইল না; অবশেষে ঘটনাচক্রে তাঁহার এক সুযোগ মিলিয়া গেল। যোশেফ্ মাইষ্টার নামে বৎসর-নয়েকের একটি ছেলেকে পাগ্‌লা কুকুরে দংশন করিয়া তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। ঐ বালকটির মাতা বালকটিকে লইয়া ভালপিয়া (Vulpian) নামক একটি বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকটে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, ইহার কোন চিকিৎসা নাই—তবে পাস্তয়রের প্রবর্ত্তিত মতে চিকিৎসা করিলে বালকটি বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কিন্তু পাস্তয়র ইহাতেও দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। অবশেষে তাহাদের একান্ত অনুরোধে উপরিউক্ত জীবাণু দ্বারা চিকিৎসা করিতে স্বীকৃত হইলেন। দুই তিন দিন তাহার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করাইবার পর বালকটির ক্ষতস্থান শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং, সে উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় পাস্তয়রের নিদ্রা হইত না। কারণ যতই প্রবিষ্ট-জীবাণুসমূহ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল পাস্তয়রের ভয়ও তত বাড়িতে লাগিল। অবশেষে বালকটিকে যেদিন সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র জীবাণুর দ্বারা টীকা দেওয়া হইল সেদিন রাত্রিতে পাস্তয়রের চক্ষুতে আর নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি তিনি ছট ফট্ করিয়া কাটাইলেন। কেবলই মনে ভয় হইতে লাগিল যদি কল্য প্রত্যুষে গিয়া দেখি যে, ছেলেটি জলাতঙ্করোগের দারুণ জ্বালায় চীৎকার করিতেছে, তবে কি করিব? কিন্তু ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হইল। গিয়া দেখিলেন যে, ছেলেটি দিবা নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। বহুদিন পরে পাস্তয়রও সুখে নিদ্রা গেলেন।

অনতিকাল মধ্যে এই অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীর খ্যাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, এবং ছয় মাসের মধ্যে ৩৫০টি রোগী এই প্রণালী দ্বারা চিকিৎসিত হইল। তন্মধ্যে কোন একটি রোগী কুকুর দংশনের ৩৭ দিন পরে চিকিৎসার্থ আসিয়াছিল বলিয়া রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৬৭১ টি রোগীর মধ্যে মাত্র পঁচিশটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই চিকিৎসায় আশাতীত সাফল্যদর্শনে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান-সমিতি ( Academy of Sciences ) দ্বারা গঠিত এক কমিটি প্যারি সহরে পাস্তয়রের ইন্‌স্‌টিটিউট ( Pasteur Institute ) স্থাপন করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলেন 'পাস্তয়র ইনস্‌টিটিউট্'। এই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য হইল জলাতঙ্ক-রোগের চিকিৎসা করা, এবং সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য বহুপ্রকার রোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮ শে সেপ্টেম্বর অসংখ্য নরনারীর আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া পাস্তয়র মহাপ্রস্থান করেন।

পাস্তয়র শত শত সহযোগী বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রকে সত্যের সন্ধানে অনুপ্রাণিত

করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই পাস্তুরের ইন্‌স্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সহস্র সহস্র রোগীকে নীরোগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পাস্তুর মানবজাতির মহদুপকার সাধন করিয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গেলেন, তাহা প্রবল পরাক্রান্ত শত শত সম্রাট, সেনাপতি বা রাজনীতিকের প্রভাবের তুলনায় সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

সহলেখক—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্‌-সি। প্রবাসী—আশ্বিন-১৩৪১।

# রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার

রসায়নশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠতম মৌলিক গবেষণার জন্য পিঁয়ের কুরী ও মাদাম কুরীর কন্যা ইরেন কুরী জোলিও এবং তাঁহার স্বামী মঁসিয়ে জাঁ ফ্রেডারিক জোলিও এ বৎসর (১৯৩৫) নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে বিশ্ববিশ্রুত কুরী দম্পতী হেনরী বেকারেলের সহিত একযোগে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। পুনরায় ১৯১১ সালে একক মাদাম কুরীকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। একমাত্র মাদাম কুরী ব্যতীত দ্বিতীয় বার এই পুরস্কার লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

যে দুরূহ গবেষণার জন্য সমগ্র বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার জোলিও দম্পতিকে অর্পিত হইয়াছে, তাহার একটা আভাস দিতে হইলে প্রথমেই কুরী দম্পতী সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে প্যারিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পিঁয়ের কুরী জন্ম গ্রহণ করেন। কৈশোর এবং যৌবনে যথারীতি শিক্ষালাভ পূর্ব্বক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. es Sc. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করেন, এবং প্যারিসেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

মাদাম কুরীর জন্ম হয় পোল্যাণ্ডের ওয়ার্‌-শ বিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ স্কোল দোয়াস্কির গৃহে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর। বাল্যেই মাতৃহারা হওয়ায় পিতার সযত্ন স্নেহে তাঁহার গবেষণাগারেই এই মহীয়সী মহিলার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ তিনি প্যারিসে আসিয়া তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ছাত্রী-জীবনের অপরিমেয় বাধা এবং অপরিসীম অর্থাভাবের মধ্যেও বিজ্ঞান-সাধনার প্রেরণা মেরীর সমস্ত অন্তরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মেরী অধ্যাপক পিঁয়ের কুরীকে বিবাহ করিয়া বিজ্ঞান-সাধনায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অধ্যাপক স্যুৎজেন বার্জ্জারের চেষ্টায় পিঁয়ের ও মাদাম কুরীর একত্রে এক গবেষণাগারে গবেষণা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। বিবাহের পর কুরী দম্পতি যে পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিলেন, তাহার মূলে রহিল তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক সাধনা—জ্ঞান পিপাসা। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরীর এক জনবহুল পথ অতিক্রম কালে

অধ্যাপক পিঁয়ের কুরী শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। শোকাকুলা বিধবা মাদাম কুরী দুইটি শিশুকন্যা ইরেন্ ও ইভকে বুকে করিয়া জন কোলাহল হইতে বহুদূরে রেডিয়াম ইন্‌স্টিটিউটের বিজ্ঞানাগারে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানালোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। জননীর এই অচঞ্চল সাধনাই কন্যার মনে জাগাইয়া দিয়াছে বিজ্ঞান সাধনার এক অকৃত্রিম প্রেরণা।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রশ্মিবিকীরণের ( Radio-activity ) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মনীষীবৃন্দ এই অত্যদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যের উদ্‌ঘাটনে যত্নবান হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের প্রাণপাত পরিশ্রমে গবেষণার যে অপরিমিত ক্ষেত্র এবং সুযোগ গড়িয়া উঠিল, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ও গবেষণা মুখ্যত এই বিষয় লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল গবেষণার ফলে মানুষের পরমাণু সম্বন্ধে জ্ঞান সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, পরমাণু একটি সরল পদার্থ নহে, পরন্তু বিশেষ জটিল। পরমাণুর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আভাস আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় পরমাণুর সম-ওজনের ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ( Protons ) কয়েকটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার ( Electrons ) সহিত সংযুক্ত অবস্থায় পরমাণুকেন্দ্রে ( Nucleus ) অবস্থিত। এই কেন্দ্রাণুর চতুষ্পার্শ্বে ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা স্বতঃ-উৎসারিত বেগে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

মাদাম কুরীর আবিষ্কৃত রেডিয়াম নামক মৌলিক ধাতু সাধারণতঃ সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত একটু গরম থাকে। কুরীদম্পতি প্রমাণ করেন—এই স্বতঃ-উৎসারিত তাপ রেডিয়ামের রূপান্তরের ফল। রেডিয়ামের ভারী পরমাণু হইতে স্বতঃই তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হইতেছে এবং তাহার ফলে রেডিয়াম রূপান্তরিত হইয়া পরিশেষে সীসায় পরিণত হইতেছে। এই তিন প্রকার রশ্মির প্রথমটি ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট আল্‌ফা রশ্মি ( Alpha rays ), দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা ( Beta rays ) এবং তৃতীয়টি সূক্ষ্ম তরলধারা ( Gamma rays )। নানা প্রকার জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই কেন্দ্রাণুর বিভিন্নতাতেই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রভেদ। যদি কোন প্রকারে পারদের কেন্দ্রাণু হইতে একটি প্রোটনকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে পারদ সোনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এই প্রোটন ধনাত্মক হাইড্রোজেন পরমাণু মাত্র।

১৯১৯ সালে অধ্যাপক রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেন যে, লঘুতর নাইট্রোজেন গ্যাসের উপর আল্‌ফা রশ্মির আঘাত করিলে উহা হইতে একটি প্রোটন বাহির হয়, এবং সম্ভবতঃ নাইট্রোজেন অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়। পরবর্ত্তী সময়ে বেরিলিয়াম ধাতুকে এইভাবে আঘাত করিয়া দেখা গেল যে, প্রোটনের পরিবর্ত্তে ইহা হইতে একপ্রকার সুদূর প্রসারী ( Penetrating ) রশ্মি নির্গত হয়। কুরী জোলিও এই নবাবিষ্কৃত রশ্মি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং ইহার নানা প্রকার বিশেষত্বও লক্ষ্য করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার কৃতিত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই। সে সৌভাগ্য লাভ করেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যাড্‌উইক্। তিনি লক্ষ্য করেন, এই রশ্মি বৈদ্যুতিক

শক্তিবিহীন এবং ইহার নাম দেন 'নিউট্রন'। বিজ্ঞানের এই নবাগত অতিথির সর্ব্ববিধ স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য এ বৎসর (১৯৩৫) স্যাড্উইক্ পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

মৌলিক পদার্থগুলির বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় দেখা গিয়াছিল যে. রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুর স্বতঃ রূপান্তর (Spontaneous disintegration) এবং রশ্মি-বিকীরণ (radio activity) ক্ষমতা থাকিলেও অপেক্ষাকৃত লঘু ওজনের মৌলিক পদার্থগুলি এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন পদার্থে এ-শক্তি সঞ্চার করাও অসম্ভব।

জোলিও দম্পতি 'নিউট্রন' আবিষ্কারের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও তাঁহারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পদার্থগুলিতে এই শক্তি সঞ্চার করা অসম্ভব নহে। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক পদার্থে রূপান্তর করা সম্ভব, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন এলুমিনিয়ামকে আলফা-রশ্মিদ্বারা আঘাত করিলে হাইড্রোজেন বাহির হয় এবং এলুমিনিয়াম দুইটি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ফস্ফরাস্ হইতে সিলিকনে রূপান্তরিত হয়। এই নূতন মৌলিক পদার্থ দুইটির ভিতর কৃত্রিম রশ্মি বিকীরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসীম ধৈর্য্য এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাঁহারা নবজাত মৌলিক পদার্থগুলির এই কৃত্রিম শক্তির প্রমাণ করিয়াছেন। আঘাতের পর এলুমিনিয়াম খণ্ডটিকে এসিডে গলাইয়া তাঁহারা ফস্ফরাস্ এবং সিলিকনের অস্তিত্ব এবং তাহাদের কৃত্রিম রশ্মির বিকীরণ শক্তির প্রমাণ করেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই লঘুতর পরমাণুর এই প্রকার রূপান্তর এবং কৃত্রিম রশ্মি-বিকীরণের প্রায় চল্লিশটি উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

রেডিয়াম্ প্রভৃতির রূপান্তরে মানুষের কোন হাত নাই—ইহা প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে স্বতঃ সংঘটিত। জ্ঞান-পিপাসু মানুষ আজ প্রকৃতির এই খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। অনন্তকাল হইতে ধনোন্মাদ মানুষ সোনার খোঁজে ছুটিয়াছে অন্ধকার খনির গুহায়—'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।' বৈজ্ঞানিক চলিয়াছে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের নেশায়। কে জানে তার যাত্রাপথের এই মহান্ আবিষ্কার একদিন সকল সন্ধানের শেষ করিতে পারিবে কি না?

রশ্মি-বিকীরণের ক্ষেত্রে জোলিও দম্পতির এই আবিষ্কার এবং এই প্রমাণিত তথ্য পরমাণুর গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দিতে পারিবে ইহা আশা করা যায়। বর্ত্তমান কালে পদার্থ এবং রসায়নশাস্ত্রে বিভিন্ন গবেষণায় পরমাণুর সাধারণ গঠন সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু পরমাণুকেন্দ্রস্থ 'প্রোটন', এবং 'ইলেকট্রনের' অবস্থা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। স্যাড্উইক্, জোলিও দম্পতি, এণ্ডারসন্ প্রমুখ মনীষিগণের সাধনায় পরমাণু-গঠনের তত্ত্ব অচিরেই বোঝা যাইবে ইহা দুরাশা নহে।

**এই প্রবন্ধ রচনায় সহলেখক (১) ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার ও (২) শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায়, এম. এস-সি। প্রবাসী—মাঘ, ১৩৪২।**

# ভাগাড় হইতে চর্ম্মশালা

প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম, তখন ইহার ব্যবহারিক দিক মানুষের কত উপকারে আসিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা দেশের ধন সম্পদ কত ভাবে বর্দ্ধিত হয়, তাহার উদাহরণরূপে নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে ধরিতাম। আজ পুনরায় অনুরূপ একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

কলিকাতায় সার্কুলার রোডে, যেখানে আবর্জ্জনা ফেলিবার প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছিল, ( সৌভাগ্যের বিষয় আজ তাহা শহরের বাহিরে গিয়াছে ) সেখানে অনেক সময় গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর মৃত পূতিগন্ধযুক্ত দেহ স্তূপীকৃত হইয়া পচিয়া থাকিত। একটি ইংরেজ কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত এই মৃত জন্তুর দেহগুলি উঠাইয়া লইবার চুক্তি করে। সেই কোম্পানী ধাপাতে এই জন্য বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সমস্ত মৃত জন্তুর পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়াস পাইতেছে, এবং অনেক টাকা আয়ও করিতেছে। তাহারা মৃতজন্তুর চামড়া, হাড়, মাংস, চর্ব্বি, শিং, খুর সমস্তই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিষ্কারভাবে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে এবং বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছে। বোম্বাইয়ে এবং অন্যান্য বড় বড় শহরেও এই প্রকার মৃতজন্তুর সদ্ব্যবহারের জন্য কারখানা রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি সমস্তই বিদেশীয়দের সম্পত্তি। দেশী এই প্রকার কোন কারখানা আছে কিনা অবগত নহি। আমাদের দেশে এত অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ নোংরা জিনিসের কারখানা প্রতিষ্ঠা করার দিকে লোকের মনও আকৃষ্ট হয় না।

প্রায় তিন বৎসর হইল খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্তের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। হরিজন সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করায় মুচি, চামার, ডোমদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া তিনি উপলব্ধি করেন—ইহাদের সেবা করার একমাত্র পথই হইতেছে—ইহাদের কাজকে মর্য্যাদা দেওয়া, ইহাদের কাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়মিত করা। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করেন এবং ছোট শহরে, গ্রামে হরিজনেরা যাহাতে মৃতজন্তুর উপযোগ করিতে পারে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বাৎসরিক ৩,০০০ টাকায় উহার ভাগাড় ইজারা লইয়া সতীশবাবু "মৃত পশুশালা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; দ্বিতীয় ধাপার নিকটে ট্যাংরায় চামড়া-পাকাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য "কুটীর চর্ম্মকারুশালা" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে গ্রামোন্নয়ন নামে একটি দাতব্য ট্রাষ্ট সংগঠন করিয়া এই প্রতিষ্ঠান

দুইটি তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। গত আড়াই বৎসরের মধ্যে এই দুইটি শিক্ষাশালা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পঁচিশ ছাব্বিশটি ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া গিয়াছে। মুচি-চামার, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একসঙ্গে এইস্থানে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইটি শিক্ষাশালা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মোটামুটি ভাবে ভারতবর্ষের চামড়ার ব্যবসা কিরূপ ব্যাপক এবং মৃতজন্তুর পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা দেশ যে কত সমৃদ্ধ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

## ভারতের চামড়ার ব্যবসা

ভারতের চামড়ার ব্যবসার প্রধান অঙ্গ কাঁচা চামড়া ও ছাল-পাকাই করা চামড়া রপ্তানি করা। ইহার প্রায় অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় যায়। সম্পূর্ণ পাকানো ( Chrome-tanned leather ) বিদেশে সামান্যই রপ্তানি হয়। ছাল-পাকাই চামড়া বিলাতে লইয়া পুনরায় উহা ক্রোম-ট্যান করা হয়। এজন্য ছাল-পাকাই চামড়া অর্দ্ধ-পাকাই ( half tanned ) চামড়া বলিয়া কথিত হয়। যে পরিমাণ চামড়া কাঁচা অবস্থায় বিদেশে যায়, তাহার সমস্তটাই এদেশে ছাল-পাকাই অথবা ক্রোম-পাকাই করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব। তাহাতে দেশের ধন সম্পদ কত বাড়িতে পারে, কত নিরন্ন লোক যে কাজ পাইয়া বাঁচিতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব। গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের হিসাব হইতে ভারতবর্ষের চামড়া রপ্তানির হিসাব নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

### কাঁচা চামড়ার রপ্তানির হিসাব

[ ১-৪-৩৬ হইতে ৩১-৩-৩৭ পর্য্যন্ত ]

| চামড়ার বিবরণ | সংখ্যা | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|---|
| মহিষের চামড়া | ৬,৫৩,১৫৬ খানা | ৪,৪৮০ টন | ২১,৫৭,০৩২৲ |
| গরুর চামড়া | ৪২,৩৪,৫৭৮ „ | ১৯,৪১৭ „ | ১,০৯,৪১,৬২২৲ |
| বাছুরের চামড়া | ১,৭৮,২৮৩ „ | ৩১৪ „ | ২,৩৬,১৬৫৲ |
| ছাগলের চামড়া | ২,৬১,৬৮,১৮০ „ | ১৭,৯৮৫ „ | ২,৭৮,১৩,৪৩৯৲ |
| ভেড়ার চামড়া | ১১,৫২,৮৮৪ „ | ৬০৩ „ | ১৪,৫৯,০৪৬৲ |
| অন্যান্য চামড়া | ৯,০৫,৮৪৫ „ | ২৮০ „ | ৮,৬৭,৭৮২৲ |
| | ৩,২২,৯২,৯২৬ „ | ৪৩,০৭৯ „ | ৪,৩৪,৭৫,০৮৬৲ |

## ছাল-পাকাই ও ক্রোম-পাকাই চামড়ার রপ্তানির হিসাব

| চামড়ার বিবরণ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|
| মহিষের চামড়া | ১,৪৫৫ টন | ২৪,০৭,২১৭৲ |
| গরুর চামড়া | ১৪,৮৬৭ „ | ২,৫৭,৪৭,৬৩৯৲ |
| বাছুরের চামড়া | ১,৫৮৫ „ | ৩৬,০২,০৮৫৲ |
| ছাগলের চামড়া | ৩,৭৯৭ „ | ১,৮৩ ৭৯,৯৯১৲ |
| ভেড়ার চামড়া | ৩,৫৬৬ „ | ১,৬৭,৮৭,৫৬৮৲ |
| অন্যান্য চামড়া | ১০৯ „ | ৪,৮৫,৭০৪৲ |
| | ২৫,৩৬৯ „ | ৬,৭৪,১০,২০৪৲ |

এক্ষণে কোন প্রদেশ হইতে কত চামড়া রপ্তানি হয় দেখা যাউক।

## প্রদেশ অনুযায়ী কাঁচা চামড়া রপ্তানির হিসাব

( ১৯৩৬-৩৭ )

| প্রদেশ | ওজন | মূল্য |
|---|---|---|
| বাংলা | ২৪,৬২০ টন | ২,৬৬,৯০,৬২১৲ |
| বোম্বাই | ৩,৩৯৭ „ | ৫০,৭৬,০৭০৲ |
| সিন্ধু | ৮,১৫৪ „ | ৭৩,৪১,৩১২৲ |
| মাদ্রাজ | ১,২৪১ „ | ২৭,৮৭,৪৮১৲ |
| ব্রহ্মদেশ | ৫,৬৬৭ „ | ১৫,৭৯,৫০২৲ |
| | ৪৩,০৭৯ „ | ৪,৩৪,৭৫,০৮৬৲ |

## প্রদেশ অনুযায়ী অর্দ্ধ-পাকাই ও ক্রোম-পাকাই চামড়ার রপ্তানি

১৯৩৬-৩৭

| প্রদেশ | ওজন | মূল্য৲ |
|---|---|---|
| বাংলা | ৮৮ টন | ২,৫৯,১২৮৲ |
| বোম্বাই | ৮৯১ „ | ২৫,৯২,৪৬৪৲ |
| সিন্ধু | ৬৫ „ | ২,২৬,০২১৲ |
| মাদ্রাজ | ২৪,৩১৪ „ | ৬,৪৩,১৯,৫২১৲ |
| ব্রহ্মদেশ | ১১ „ | ১৩,০৭০৲ |
| | ২৫,৩৬৯ „ | ৬,৭৪,১০,২০৪৲ |

অর্দ্ধ-পাকাই ও পাকাই চামড়ার সংখ্যার হিসাব না পাওয়াতে দেওয়া সম্ভব হইল না। এই সমস্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, সব রকমের কাঁচা চামড়া মিলাইয়া প্রতি টনের মূল্য গড়ে ১০০৯৲ টাকা, এবং সব রকমের পাকা ও অর্দ্ধপাকা চামড়া মিলাইয়া প্রতি টনের মূল্য ২৬৫৭৲ টাকা; অর্থাৎ প্রতি টন কাঁচা চামড়া অপেক্ষা প্রতি টন পাকা চামড়ার মূল্য ১৬৪৮৲ টাকা অধিক। শুষ্ক কাঁচা চামড়া অপেক্ষা পাকা ও অর্দ্ধ-পাকা চামড়ার ওজন সর্ব্বদাই কম হয়। মহিষের ও গরুর চামড়া অর্দ্ধ-পাকা অবস্থায় কখন কখন শুষ্ক কাঁচা চামড়ার সমান ওজনেরই থাকে।

যাহা হউক, যদি মোটামুটি কাঁচা ও অর্দ্ধ-পাকা এবং পাকা চামড়ার ওজন সমানই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়, তাহা যদি সমস্ত এদেশে পাকানো হইত, তাহা হইলে প্রতি টন চামড়াতে ১৬৪৮৲ টাকা দেশের অধিক আয় হইত; অর্থাৎ ৪৩০৭৯ টন কাঁচা চামড়া যাহা কাঁচাই রপ্তানি হয় তাহা সমস্তটা পাকাই হইয়া রপ্তানি হইলে ভারতবর্ষের ধনসম্পদ আরও ৭,০৯,৯৪,১৯২৲ টাকা বৃদ্ধি পাইত। চামড়া-পাকাইয়ের জন্য রসায়ন-দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির ব্যয় যদি ইহার অর্দ্ধেক ধরা যায়, তবে এই চামড়া-পাকাই কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের পারিশ্রমিক হিসাবে বাকী অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৩,৫৪,৯৭,০৯৬৲ টাকা আয় হইবে। এই কার্য্যে এক্ষণে কত লোক যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহা পাঠকেরা ভাবিয়া দেখুন।

অর্দ্ধ-পাকাই চামড়া মাদ্রাজ হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। উপরে প্রদেশ-অনুযায়ী রপ্তানির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক সেই সেই প্রদেশের রপ্তানির হিসাব নয়। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচি, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন এই পাঁচটি বন্দরের মারফতে যে রপ্তানি হয়, তাহাই এই ভাবে প্রদেশ-অনুযায়ী দেখান হইয়াছে। কলিকাতার মারফতে বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের চামড়া রপ্তানি হয়। চামড়া পাকাইয়ের কার্য্যে বাংলা মাদ্রাজ হইতে কত পশ্চাতে, উক্ত হিসাব হইতে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মাদ্রাজ হইতে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার অর্দ্ধ-পাকাই ও পাকাই চামড়া রপ্তানি হয়। সেই স্থলে বাংলা হইতে এই প্রকার চামড়া রপ্তানি হয় মাত্র ছাব্বিশ লক্ষ টাকার। অপর দিকে মাদ্রাজ হইতে মাত্র আটাশ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়। সেই স্থলে বাংলা হইতে আড়াই কোটি টাকার অধিক কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলায় এই কাঁচা চামড়া রপ্তানির কাজও বাঙালীর হাতে কিছুই নাই।

ভারতবর্ষে চামড়ার প্রস্তুত জুতা ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবসায় খুব বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে। বাংলায় জুতার ব্যবসা ত সমস্ত চীনা ও পাঞ্জাবীদের হাতে। বাঙালীর হাতে এই ব্যবসায়ের যে সামান্য অংশ আছে, তাহা একরূপ নগণ্য। চামড়ার তৈরি জুতা ও অন্যান্য জিনিসের জন্য আবশ্যক সমস্ত চামড়া আমরা দেশেই পাইতে পারি, এবং আমাদের আবশ্যক চামড়ার প্রস্তুত সমস্ত দ্রব্যও এদেশেই প্রস্তুত করাইয়া লইতে

পারি। কিন্তু বিদেশী জুতা ও বিদেশ হইতে আমদানি করা চামড়া না হইলে ত আমাদের চলে না। কাজেই দেশ হইতে যেমন কাঁচা চামড়া বিদেশে যায়, তেমনি আবার বিদেশ হইতে পাকাই চামড়া, তৈরি জুতা ও অন্যান্য চামড়ার দ্রব্যও এদেশে যথেষ্ট আসে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে :—

( ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাব )

| | |
|---|---|
| জুতা | ২১,১৯,৩০৮ টাকা মূল্যের |
| পাকাই চামড়া, এবং | |
| চামড়ায় প্রস্তুত | |
| অন্যান্য দ্রব্যাদি | ৫১,১০,০১৯ ,, ,, |
| | ৭২,২৯,৩২৭৲ ,, ,, |

এই ত গেল চামড়ার ব্যবসা সম্বন্ধে।

## মৃত জন্তুর পূর্ণ উপযোগ

এক্ষণে ভারতবর্ষে মৃত জন্তুর কোন প্রকার সদ্ব্যবহার না হওয়াতে দেশের ধন সম্পদ কিরূপে অপচয় হইতেছে তাহা দেখা যাউক।

ভারতবর্ষে গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় আঠার কোটি, অর্থাৎ মোটামুটি বলিতে গেলে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা যত, গৃহপালিত পশুর সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক। গড়ে যদি এই গৃহপালিত পশুর জীবনকাল ছয় বৎসর করিয়া ধরা যায়, তবে প্রতি বৎসরে তিন কোটি পশুর মৃত্যু হয়। গ্রামে বা সহরে আজকাল গরু মরিলে উহা গৃহস্থের নিকট একটি বোঝাস্বরূপ হইয়া পড়ে। গৃহস্থকে টাকা খরচ করিয়া উহা ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসার ব্যবস্থা করিতে হয়। চামারেরা মৃত গরুর চামড়াটাই শুধু ছাড়াইয়া লয়। উহার হাড়-মাংস বা চর্ব্বি কিছুই সংগ্রহ করা হয় না। এই হাড়-মাংস ও চর্ব্বি সমস্তই মূল্যবান পদার্থ। হাড় ও মাংসকে জমির উৎকৃষ্ট সাররূপে পরিণত করা যাইতে পারে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি প্রধান শহরে বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত হাড়-মাংস গুঁড়া করিবার বড় বড় কারখানা রহিয়াছে। তাহাদের নিযুক্ত এজেন্ট গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মৃত জন্তুর শুষ্ক হাড় সংগ্রহ করিয়া এই সমস্ত কারখানায় লইয়া আসে। কারখানা হইতে সেগুলি গুঁড়া হইয়া প্রায়ই বিদেশে চালান যায়। আবার সারের জন্য এবং হাড়ের নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত করার জন্য বহু হাড় গুঁড়া না-করা অবস্থায়ও বিদেশে যায়। এই মূল্যবান সার আমরা বিদেশে পাঠাইয়া, আবার বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার (chemical manure ) আমদানি করি। রাসায়নিক সারের প্রয়োগে জমির উর্ব্বরা শক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হয়, এবং উৎপন্ন ফসলের পুষ্টিকারক শক্তিও কম হয়। স্বাভাবিক সার (natural organic manure), যথা—মৃত জন্তুর হাড়, মাংস, খৈল, গোবর ইত্যাদি জমির

উর্ব্বরা শক্তি রাসায়নিক সারের অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি করে, উৎপন্ন ফসলের পুষ্টিকারক শক্তিও ইহাতে বেশী হয়। কিন্তু আমরা সেদিকে কি দৃষ্টি দিই? হাড়, খৈল প্রভৃতির রপ্তানি ও রাসায়নিক সারের আমদানির নিম্নে প্রদত্ত হিসাব হইতে ইহা আরও সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯৩৬-৩৭ সালের রপ্তানি

| বিবরণ | পরিমাণ | মূল্য |
|---|---|---|
| হাড়—গুঁড়া না-করা, নানাবিধ হাড়ের জিনিস প্রস্তুতের জন্য | ৭৪,২৭৯ টন | ৪৬,৭৫,৪৩৭৲ |
| হাড়—গুঁড়া না-করা সারের জন্য | ২৫,৫১৮ ,, | ২০,৩৪.০১৯৲ |
| হাড় ও শিং গুঁড়ানো—সারের জন্য | ৩৪,১৬৫ ,, | ১৭,৮৪,৪৪৯৲ |
| খৈল, বিভিন্ন রকমের | ৩ ৩৫,৬২০ ,, | ২,২৬,৯৩,৩০৮৲ |
| চর্ব্বি | ৩,৪৬২ ,, | ৯৫.৭৩৭৲ |

১৯৩৬-৩৭ সালের আমদানি

| বিবরণ | পরিমাণ | মূল্য |
|---|---|---|
| বিভিন্নপ্রকারের রাসায়নিক সার | ৮৩,৫৫৩ টন | ৮০,০৭.৭২২৲ |
| চর্ব্বি | ২,০৫,৪৯০ ,, | ৩৫,৭০,৬০৪৲ |

সতীশ বাবু দেখাইয়াছেন যে, একটি পরিণতদেহ গরু বা মহিষ হইতে চামড়া, হাড়, মাংস, চর্ব্বি ইত্যাদিতে প্রায় ছয়-সাত টাকা পাওয়া যায়। চামড়ার মূল্য তিন টাকা, হাড়-মাংসের মূল্য দেড় টাকা, চর্ব্বির মূল্য দেড় টাকা হইতে দুই টাকা এইরূপ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসর যে তিন কোটি গৃহপালিত জন্তুর মৃত্যু হয়, সেইগুলির মৃতদেহের পূর্ণ ব্যবহার করিলে জন্তু-পিছু গড়ে দুই টাকা করিয়া ধরিলেও দেশের সম্পদ বৎসরে ছয় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। অধিকন্তু মৃত জন্তুর ব্যবহার দ্বারা এইরূপ আয়ের সম্ভাবনা দেখা গেলে, গো-সেবার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবত আকৃষ্ট হইবে, গরুর পুষ্টির দিকে গৃহস্থের নজর আপনা-আপনিই পড়িবে। কারণ গৃহস্থ তখন বুঝিতে পারিবে যে, গরুকে প্রকৃত সেবা করিয়া উহার জীবিতকালে সে যেমন লাভবান হইয়াছে, উহার মৃত্যুর পর উহার মৃতদেহ হইতেও তাহার যথেষ্ট লাভই হইতেছে।

# হাওড়া মৃতপশুশালা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সতীশবাবু হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাগাড় ইজারা লইয়া মৃত জন্তুর সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য একট শিক্ষাশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে যাহাতে সহজে অল্প ব্যয়ে এই কাজ হইতে পারে, এখানে সেই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানকার কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। কোথায়ও গো-মহিষাদি মরিতেছে কি না তাহা ঘুরিয়া দেখার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে লোক নিযুক্ত আছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৃতদেহ ভাগাড়ে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা ইহারা করে। সেখানে লইয়া যাওয়া মাত্রই চামড়া ছাড়াইয়া লওয়া হয়। হাড়-মাংস কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হয়। নাড়ীভূঁড়ি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। চামড়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লবণ দিয়া রাখা হয়। কিছু কিছু চামড়া বিক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট ক্রোম-ট্যান করার জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত কুটীর চর্ম্মকারুশালাতে পাঠান হয়। হাড়-মাংস তাজা অবস্থাতেই অর্থাৎ পচনের পূর্ব্বেই সিদ্ধ করা হয়। অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার ফলে হাড়-মাংস পৃথক হইয়া যায়, চর্ব্বিও জলের উপরে ভাসিতে থাকে। তখন চর্ব্বিটা তুলিয়া লওয়া হয়, এবং হাড়-মাংস আলাদা করিয়া শুকাইয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ রৌদ্রে শুকান সম্ভব হয় না বলিয়া আগুনের উপর বড় বড় পাত্রে করিয়া ভাজিয়া শুকান হয়। এই শুষ্ক হাড়-মাংস ঢেঁকিতে গুঁড়া করিয়া মহামূল্য সারে পরিণত করা হয়। বর্ত্তমানে পেষণযন্ত্রে ( Disintegrator-এ ) হাড়-মাংস গুঁড়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে অবশ্যই ঢেঁকিতে গুঁড়া করার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। ঢেঁকিতে হাড় গুঁড়া করা কঠিন, কিন্তু সামান্য পুড়াইয়া লইলে সহজেই গুঁড়া করা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই গুঁড়ানো মাংসে শতকরা ১১-১২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। হাড়ে শতকরা ২১-২২ ভাগ ফস্‌ফেট্ আছে। জমির পক্ষে এইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান সার। হাড়-মাংস সিদ্ধ হইতে প্রাপ্ত চর্ব্বি রিফাইন করিয়া উহা সাবান-প্রস্তুতকারকদের নিকট বিক্রয় হয়। সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান কলাশালায় ব্যবহারের জন্য আবশ্যক সাবানও উহা হইতে তৈরি করিয়া লওয়া হয়। শিং ও খুর সাধারণতঃ পৃথক ভাবে বিক্রয় করা হয়। খুর অনেক সময়ে হাড়ের সহিত গুঁড়া করিয়া সারে পরিণত করা হয়। মহিষের শিং দ্বারা চিরুণী, বোতাম, ছুরির বাঁট, কলমের হোল্‌ডার প্রভৃতি তৈরি করা যাইতে পারে। পরিণতদেহ গরু বা মহিষের পৃষ্ঠদেশে ঠিক চামড়ার নীচেকার স্থানের লম্বা অংশ কাটিয়া লওয়া হয়—এগুলিকে "পুঠ" বলে। ইহা দ্বারা তাঁত ( gut ) তৈরি হয়। সোদপুর কলাশালায় পুঠ হইতে তাঁত তৈরি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চুলসমেত লেজগুলিও পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া বিক্রয় করা হয়। এখানে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়িক দিকও দেখা হয়। এই শিক্ষাশালা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ভাবে চলিতেছে।

ভাগাড়ের কল্পনাতেই আমাদের দেহমন আঁৎকাইয়া উঠে। মৃত পশুর উপযোগ করিবার জন্য ছাল ছাড়াইবার অথবা হাড়-মাংস সিদ্ধ বা গুঁড়া করার কথা অনেকের কাছেই ন্যক্কারজনক।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবার পর মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন ও সমস্ত দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এমন কি ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত শত শত কেন, সহস্র সহস্র উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত যুবক শবব্যবচ্ছেদ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, পূতিগন্ধময় নরদেহ অপেক্ষা গরু-মহিষ-ছাগলের মৃতদেহ কি হিসাবে অস্পৃশ্য মনে হয়?

হাওড়ার ভাগাড় সতীশবাবুর হাতে আসিবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল, তাহাতে কখনও যে উহা পরিষ্কৃত হইয়া লোকের বাসোপযোগী হইতে পারে তাহা কল্পনাও করা যায় নাই। কিন্তু সতীশবাবু নিজে ওখানে দিবারাত্র থাকিয়া ও কর্ম্মীদের সাহস ও উৎসাহ দিয়া উহা এরূপ সুন্দর পরিষ্কৃত স্থানে পরিণত করিয়াছেন যে, এক্ষণে উহা কর্ম্মীদের বাসযোগ্য হইয়াছে। বাগান করিয়া শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে ভাগাড়ের বীভৎস রূপ কল্পনাতেও আসে না।

## কুটীর চর্ম্মকারুশালা

সতীশবাবুর প্রতিষ্ঠিত অপর শিক্ষাশালায় গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্প হিসাবে চামড়া-পাকানোর কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিক্ষাশালার এক দিকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চামড়া পাকাই করিয়া একট বড় ব্যবসায় গড়িয়া তোলা হইতেছে; অপর দিকে গ্রামের মধ্যে যাহাতে হরিজনেরা সহজে চামড়া ক্রোম-ট্যান করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানকার তৈরি চামড়া বিলাতেও বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। কুটীর-বিভাগের চামড়া যন্ত্রবিভাগের চামড়ার ন্যায় সমান উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সব সময়েই উভয় বিভাগের চামড়ার তারতম্য পরীক্ষা করা হইতেছে। গ্রামের কাজের উপযোগী হাতে চালানো ট্যানিং ড্রাম, গ্লেজিং মেশিন, শেভিং মেশিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখান হইতে কুটীরের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। সতীশবাবু কুটীর-বিভাগে চামড়া-পাকাইয়ের পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গ্রামে গ্রামে হরিজনেরা নিজেদের বাড়ীতে অল্প মূলধনে চামড়া ভালরূপে ক্রোম-ট্যান করিতে সমর্থ হইবে। বস্তুত এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া কয়েক জন ছাত্র এইরূপ কুটীরচর্ম্মশালা সাফল্যের সহিত প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছে। হরিজনেরা গ্রামে চর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাহাদের অবস্থা যে অনেক উন্নত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। চামড়ার ব্যবসায়ের ব্যাপকতা যে কিরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই প্রকার চর্ম্মশালায় যে-চামড়া প্রস্তুত হইবে, তাহা উৎকর্ষ ও মূল্যের দিক দিয়া প্রতিযোগিতায় কোন বড় চর্ম্মশালার চামড়া অপেক্ষা হীন হইবে না।

কুটীরচর্ম্মশালার জন্য সতীশবাবু যে কর্ম্মপ্রণালীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

## গ্রামে কুটীরচর্ম্মশালার কর্ম্মপ্রণালী

দুই জন লোক একত্রে কাজ করিবে। মাসিক তিন শত বর্গফুট ক্রোম চামড়া ও তিন শত পাউণ্ড সোলের চামড়া প্রস্তুত করিবে এবং বিক্রয় করিবে। বিক্রয় ও কাজের ব্যবস্থার জন্য একটি লোক মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ব্যয় করিবে ও বাকী দশ দিন অপর লোকটিকে কাজে সাহায্য করিবে।

### হিসাব

| | |
|---|---|
| গ্রামে গরুর কাঁচা চামড়ার মূল্য গড়ে প্রতি ফুট | ৵১০ |
| প্রতি ফুট চামড়া পাকাই করিতে রাসায়নিক দ্রব্যের খরচ | |
| পারিশ্রমিক ব্যতীত তৈরি চামড়ার মূল্য | |
| বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি ফুট | ।০ |
| মহিষের কাঁচা চামড়া প্রতিখানা | |
| ইহাতে ২৫ পাউণ্ড সোলের চামড়া হইবে, তদনুপাতে | |
| প্রতি পাউণ্ড কাঁচা চামড়ার মূল্য | ৵১০ |
| প্রতি পাউণ্ড চামড়া পাকাইয়ের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য খরচ | ৴০ |
| পারিশ্রমিক ব্যতীত প্রতি পাউণ্ড সোল চামড়ার মূল্য | ৶১০ |
| বিক্রয় মূল্য প্রতি পাউণ্ড | ।৴০ |

| ব্যয় | | আয় | |
|---|---|---|---|
| ৩০০ বর্গফুট চামড়ার | | ৩০০ বর্গফুট ক্রোম চামড়ার | |
| দরুণ ৶০ হিঃ | ৫৬।০ | বিক্রয়-মূল্য ।০ ফুট হিঃ | ৭৫৲ |
| ৩০০ পাউণ্ড সোল চামড়ার | | ৩০০ পাউণ্ড সোলের চামড়ার | |
| দরুণ ৶১০ পাঃ হিঃ | ৬৫॥৵০ | বিক্রয়-মূল্য ।৴০ পাউণ্ড হিঃ | ৯৩৸০ |
| অন্যান্য খরচ— | | | ১৬৮৸০ |
| | | বাদ ব্যয় | ১২৬৸৵০ |
| | ১২৬৸৵০ | | |
| | | | ৪১৸৵০ |

দুই জন লোক একত্রে ৪১৸৵০ মাসিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে

## আবশ্যক মূলধন

| | |
|---|---|
| ট্যানারীর জন্য আবশ্যক সাজসরঞ্জামাদি ক্রয় ও প্রস্তুত করান | ১১০৲ |
| ( বাহুল্যবোধে বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হইল না ) | |
| সোলের চামড়া পাকাইয়ের জন্য এক মাসের রাসায়নিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি— | ১৫৲ |
| ক্রোম চামড়া পাকাইয়ের জন্য তিন মাসের উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি— | ২৮৲ |
| এক মাসের উপযোগী গরুর চামড়া— | ৪৬৸৵০ |
| মহিষের চামড়া— | ৪৬৸৵০ |
| মোটামুটি ২৫০৲ | ২৪৬৸০ |

কুটীরচর্ম্মশালার জন্য আবশ্যক ঘরের ব্যয়ের হিসাব এখানে ধরা হয় নাই। এইজন্য একখানা সাধারণ ৩০ x ১২ ফুট ঘর, জলের জন্য একটি পাতকুয়া, এবং চামড়া শুকাইবার জন্য একটি ছোটখাট উঠান আবশ্যক হইবে।

শিক্ষিত যুবকেরা চামড়া-পাকাইয়ের কাজ হাতেকলমে শিক্ষা করিয়া হরিজনদের গ্রামে বসিয়া সেবার দৃষ্টিতে তাহাদের দ্বারা যৌথভাবে এই প্রকার চর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা পরিচালিত করিতে পারেন। ইহাতে এক দিক দিয়া তাঁহারা যেমন গ্রামে বসিয়া হরিজনদের সেবা, গ্রামের উন্নতি ও দেশের সম্পদ বাড়াইতে সমর্থ হইবেন, অপর দিকে পরিবারবর্গের জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থানও করিতে পারিবেন। সামান্য চাকরির জন্য পরের দরজায় খোসামোদ করিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হইবে না।

**[ কুটীর চর্ম্মকারুশালার কর্ম্মী শ্রীমান চারুভূষণ চৌধুরী প্রবন্ধরচনায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সঙ্কলন করিয়া না-দিলে এই-প্রবন্ধ রচনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত ]**

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৪৪

# বাঁচিবার উপায়

গত বৎসর বিলাত হইতে ফিরিয়া যখন শুনি যে, মহাত্মা গান্ধী ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন সম্বন্ধে মহা আন্দোলন তুলিয়াছেন তখন আমি হাসিয়াই উড়াইয়া দেই। ভাবিয়াছিলাম মহাত্মার বোধ হয় মাথার বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিছু মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা আমি ভাবিতাম মিলে ১ মিনিটে যত সূতা বাহির হয় সারা বৎসর ধরিয়া চরকা ঘুরাইলে তত সূতা উৎপন্ন হইতে পারে না। তারপর আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যালের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যখন আমাকে চরকার প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া দিলেন এবং আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া দেখাইলেন যে তাহার স্ত্রী পুত্রকন্যা সকলেই কেমন সূতা কাটিতেছে এবং বলিলেন যে দেশের সকলেই যদি তাহাদের অবসর সময়ে সূতা কাটে, তাহা হইলে অনায়াসে নিজের কাপড়ের সূতা নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে; তখন আমার প্রতীতি জন্মাইল যে, চরকা সত্যই আমাদের মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। কেননা, আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয় কত? লর্ড কার্জ্জনের মত যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে মাসে আয় মাত্র ২৷৷৹ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক মাত্র ৴৫। প্রত্যেকে যদি অবসর সময়ে সূতা কাটেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে ঐ ৴৫ আয় করিতে পারেন। আমাদের এই বাঙলা দেশে প্রায় ৪৷৷৹ কোটি লোকের বাস। এই সাড়ে চারি কোটির মধ্যে যদি আড়াই কোটি লোক বাদ দেই, তা'হলে দুই কোটি লোক থাকিল। এই দুই কোটি লোক যদি মাত্র ৴১০ দৈনিক আয় করে, তাহা হইলে মাসে প্রত্যেকের আয় এক টাকা হিসাবে দুই কোটি লোক মাসে দুই কোটি টাকা, বৎসরে ২৪ কোটি টাকা আয় করিতে পারে। উহা হইতে আরও ৪ কোটি টাকা বাদ দিলাম, তাহা হইলেও কুড়ি কোটি টাকা থাকিল। এই কুড়ি কোটি টাকা যদি প্রত্যেক বৎসর এই বাংলাদেশে রহিয়া যায়, তাহা হইলে কি ব্যাপার হয় ভাবিয়া দেখুন। আমাদের এই জেলায় (খুলনা) প্রায় ১৪ লক্ষ লোকের বাস। এই ১৪ লক্ষের মধ্যে যদি মাত্র এক লক্ষ লোক সূতা কাটে, আর তাহারা যদি দৈনিক মাত্র দুই পয়সাও আয় করে, তাহা হইলেও মাসে প্রত্যেকের ১ টাকা হিসাবে ১ লক্ষ লোকের মাসে ১লক্ষ টাকা, বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা আয় হইবে। প্রত্যেক বৎসর যদি এই বার লক্ষ টাকা খুলনায় থাকিয়া যায়, তাহাহইলে খুলনায় কি আর দুঃখ কষ্ট থাকে? ইংরাজীতে একটি কথা আছে, "A penny saved is a penny gained" অর্থাৎ যদি আমরা একটি পেনিও বাঁচাইতে পারি, তাহা হইলে একটি পেনি আমাদের লাভ হইল মনে করা উচিত। যখন আমরা বিদেশ হইতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া দেশে টাকা আনিতে পারি না, বরঞ্চ আমাদের দেশের টাকা ইংরেজ, জার্ম্মান, জাপান অবশেষে মাড়োয়ারী পর্য্যন্ত লুটিয়া লইতেছে, তখন একটা পয়সাও ঘরে রাখিতে পারিলে

সে পয়সাটা আমাদের আয় বলিয়া ধরিতে হইবে। আমি বাংলা দেশের টাকা বাংলার বাহিরে যাইতে দিতে চাহি না। বাংলার টাকা বাংলায় না থাকিলে আমাদের যে দুঃখ, সেই দুঃখই থাকিয়া যাইবে; অর্থাৎ বাংলার ঘরে ঘরে যদি চরকার প্রচলন না হয়, তাহা হইলে আমাদের টাকা বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে চলিয়া যাইবে। যেমন সেবার স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উঠিল বাংলা হইতে, কিন্তু সুবিধা হইল বোম্বাই প্রদেশের। বাংলার দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলে বাংলার টাকা বাংলাতেই রাখিতে হইবে।

একটি কথা উঠিতেছে বড়বাজারে মাড়োয়ারীরা বিদেশী কাপড় আনিবেই; এজন্য বিদেশী কাপড় আনা বন্ধ করা প্রথমে দরকার। তার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, যদি আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে বসিয়া চরকায় সূতা কাটি এবং সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া পরিধান করি, তাহা হইলে কি আর বড়বাজারে বিদেশী কি বিলাতী কাপড় আসিবে? তাহা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। নচেৎ কেবল মুখে বারণ করিলে বা পিকেটিং করিলে চলিবে না।

চরকা প্রচলন সম্বন্ধে এই বৎসর একটু বাধা পড়িতেছে, কারণ আমাদের তুলা ক্রয় করিতে হইতেছে। কিন্তু যদি আমরা প্রত্যেকেই ১০।১৫ টি তুলাগাছ নিজ নিজ বাটীতে রোপণ করি, তাহা হইলে এ অসুবিধা আগামী বৎসর আর থাকিবে না। আমার মনে হয় প্রত্যেকেরই বাটীতে, বিশেষতঃ এই খুলনা সহরে এমন স্থায়গা আছে যাহাতে ১০।১৫ টি তুলার গাছ অনায়াসে রোপণ করা যাইতে পারে। একবার গাছ হইলে সে গাছ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। বর্ত্তমানে তুলার বীজ বপন করিবার সময় আসিয়াছে, অতএব আমার নিবেদন যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাটীতে এই সময় তুলার গাছ লাগাইবেন, তাহা হইলে আর আগামী বৎসর তুলার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

ছাত্রদের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা গ্রীষ্মাবকাশে অনেক সময় পান; সে সময় তাঁহারা মিছামিছি কাটাইয়া দেন, এবং কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রায় সময় অতিবাহিত করেন। বিশেষতঃ যাঁহারা পরীক্ষার্থী তাঁহারা প্রায় তিন মাস সময় পাইবেন। তাঁহারা যদি মামার বাড়ী, বোনের বাড়ী ইত্যাদি না যাইয়া এবং নিদ্রায় সময়টা বৃথা নষ্ট না করিয়া এই চরকা প্রচলন সম্বন্ধে উঠে পড়ে লাগেন এবং নিজেরাও যদি প্রত্যহ চরকা কাটেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। আশা করি দেশের এই জাগরণে তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

সমগ্র খুলনাবাসীর প্রতি আমার নিবেদন এই যে, আমি যাহাতে খুলনাবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহার চেষ্টা যেন তাঁহারা করেন। সম্প্রতি আমি কুষ্ঠিয়া, বাঁকুড়া, বেনারস, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে চরকার উপকারিতা বুঝাইয়া আসিতেছি। প্রত্যেক জেলার কার্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার

সর্ব্বদাই ভয় হয় অন্য জেলার লোক 'আগে নিজের ঘর ঠেকান' বলিয়া আমায় লজ্জা না দেয়।

এখানে অনেক মা লক্ষ্মীরা উপস্থিত আছেন। অবশেষে তাঁহাদের নিকট আমার করযোড়ে নিবেদন এই যে, চরকাকে তাঁহাদের গৃহস্থালী কাজকর্ম্মের ভিতর যেন অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। প্রত্যহ যতটুকু সময় পান সেই সময়টুকু চরকাতে নিয়োগ করেন। অনেকে বলিতে পারেন যে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম ক'রে চরকা কাটার সময় পাওয়া যায় না—তাহার উত্তরে আমি বলিতে চাই, অধিকাংশ গৃহস্থের ঘরে বিধবা ভগিনী, বৃদ্ধা মাতা পিসিমাতা প্রভৃতি আছেন, যাঁহারা কেবল আলস্যে দিন কাটান এবং পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। আমার ধারণা, প্রত্যেক পরিবারে এমন দুই একজন লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যহ সূতা কাটিতে পারেন। ইহাতে সংসারে অনেক উপকার হয়। দেখা গিয়াছে যে, একজন একঘণ্টা সূতা কাটিলে অন্ততঃ ১॥০ তোলা সূতা অনায়াসে কাটিতে পারেন। প্রতিদিন যদি মাত্র এক ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটা যায়; তাহা হইলে দেখা যায়, দৈনিক এক তোলা করিয়া হিসাবে ধরিয়াও বৎসরে ৪॥০ সাড়ে চারি সের সূতা প্রস্তুত হয় অর্থাৎ বৎসরে একজনও অন্ততঃ চারি জোড়া কাপড়ের সূতা তৈয়ারী করিতে পারেন। আর যদি এক ঘণ্টার বেশী সময় ঐ চরকাতে নিয়োগ করেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত বিধবা স্ত্রী লোকদের পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না। আমি দেখিয়াছি যে, ছয় বৎসরের বালিকারাই সব চেয়ে ভাল সূতা কাটিতে পারে। এইজন্য মালক্ষ্মীদের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাঁহারা নিজেদের অবসর মত চরকায় সূতা কাটিবেন এবং তাঁহাদের কন্যাদের ছয় বৎসর হইতে সূতা কাটিতে শিক্ষা দিবেন। দেশের এই আন্দোলনে স্ত্রী জাতীরও একটি কর্ত্তব্য আছে; সে কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে কেবল মাত্র সূতা-কাটা। তাই কবির কথায় বলিতে হয়।

"তোরা না করিলে সাধনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"*

* খুলনায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা—'দেশবন্ধু'—২৭শে চৈত্র, ১৩৩৮।

# হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা

[ ঝালকাটী বন্দরে যোগি-সম্মিলনীর ১৪শ বার্ষিক (১৩৩০) অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা। যোগিসখা হইতে গৃহীত ১৩৩০, ১৪ই কার্ত্তিক। ]

সভাপতি মহাশয়, আগত যোগি-সম্মিলনীর সভ্যগণ ও অন্যান্য ভদ্রগণ,

আপনারা আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন, আমি তাহার দাবী করিতে পারি না। আমি এক বৎসরের মধ্যে আমার এই ক্ষীণ দেহ লইয়া প্রায় দুই হাজার মাইল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তথাপি আপনাদের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমার কাজের ছোটবড় বিচার করা চলে না। যখন যাহা কাছে আসে, তাহাই আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। ভারতময় খদ্দর প্রচারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আলিগড়ের মুসলমান বিদ্যালয়ের জন্যও আমার ডাক পড়িয়াছিল। আবার ভোজেশ্বরে আসিয়া আমার শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও যখন আপনাদের ডাক আসিল, তখনই এখানে আসিতে হইল। এখানে আসিয়াছি, কিছু বলিতেও হইবে, কিন্তু তাহাতে কাজ হয় কৈ? আমি না হয় কিছু বলিতেই পারিলাম, কিন্তু কাজ ত আমি কিছু করিয়া দিতে পারিব না, কাজ আপনাদের হাতে।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয় * যোগিজাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মত লোকের পক্ষে উপযুক্ত। তিনি তাঁহার এই গবেষণায় মৌলিকতার, চিন্তাশীলতার, নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন। আমার ঠিক পূর্ব্বে শ্রীমান্ শশী-বাবু † হিন্দু সমাজ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমার বেশ মনে লাগিয়াছে তিনি যুবক তাই মনের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই স্পষ্টবাদিতার জন্য আমি তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। আমি একজন রাসায়নিক, বিলাত হইতে আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকিয়া কেবল রসায়ন আলোচনাই করিয়াছি। কিন্তু জাতীয়তার ভিতরও রসায়ন চাই। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে যোগিজাতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যাহার ভিতর ব্রাহ্মণত্ব আছে সে ব্রাহ্মণত্বের দাবী ছাড়িবে কেন? আমাদের হিন্দুজাতির এত অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, কোন জাতিকে জাতিত্বের আন্দোলন করিতে দেখিলে অপরে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, তাহা সহ্য করিতে পারেন না। আমার বাড়ী খুলনার রাড়ুলী-কাটিপাড়ায়। সেখানকার যোগিদের সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছি, অনেক প্রত্ন-তত্ত্বের সন্ধান লইয়াছি, তাই জেনেছি তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের দাবী কত সঙ্গত। ব্রাহ্মণেরা এই কথায় বিরক্ত হইতে পারেন। আমার জন্মাইবার পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর কাছে রামচাঁদ নাথ নামে খুব বড় এক কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার উন্নত চরিত্রের জন্য অনেক ব্রাহ্মণেও তাঁহার পায়ের নিকট মাথা নীচু করিয়া কৃতার্থ বোধ

* ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও ইতিহাসের অধ্যাপক।
† বাবু শশীকুমার নাথ বি. এ. সমিতির জনৈক সভ্য; উগ্রভাবে সামাজিক বিষয়ে তীব্র আক্রমণ করেন।

করিতেন। যোগিজাতির মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা খুব বেশী। তাহা দেখিয়া মনে হয় ব্রাহ্মণত্বের দাবী ইহাদের আছে. যাহা যাহাদের নাই তাহা লইয়া তাহারা কখন দাবী করে না।"

আমি না হয় সাহেব বনিয়া গিয়াছি, কারণ আমি ইংলণ্ডে আট বৎসর ছিলাম। আমার কথা না হয় কেহই নাই মানিলেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তো হিন্দুই ছিলেন। বিধবা বিবাহের জন্য তিনি কত চেষ্টাই করেছেন। বম্বে, পাঞ্জাবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজে চলিয়া গেল. কিন্তু বাঙলায় তাহা চলিল না। হিন্দুর এই বিচার বুদ্ধিতে সমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালবা কাশীর হিন্দু মহাসভায় তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে এই দেশকে সমাজ সংস্কারের দেশ বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই দেশে অল্পদিনের মধ্যে রামমোহন রায়, কেশব সেন, বিবেকানন্দ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কত মনীষীর জন্ম হইয়াছে। কিন্তু হায় সেই দেশের কি দুর্দ্দশা! ছুৎমার্গ অবলম্বন করিয়া সেই দেশের কি সর্ব্বনাশ না হইতেছে! তথাকথিত অভিমানী ভদ্রজাতিরা বুকে হাত দিয়া বলুন তাঁহারা দেশের কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন। যার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে কি আগুন নিভাইবার সময় ব্রাহ্মণ শূদ্রের জলের বিচার করে? আমার দেশে আমাদের সমাজের চারিদিকে এখন আগুন লাগিয়াছে। এখন 'জল চল' চুলোয় যাউক। এখন সবাই জল তোল, এখন আগে ঘর বাঁচাও। ভাই সব এক হও। ভাই হইয়া ভাইকে ছাড়িও না। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' নামক পুস্তকে আমি হিন্দু জাতির বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি। যখন আমাদের দেশে—"তাল পড়িলে ঢিপ্ করে, না ঢিপ্ করিয়া তাল পড়ে" আলোচনা চলিতেছিল, যখন নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ না হইলে তাহার বংশ নরকগামী হইবে বলিয়া এদেশ সাবধান হইতেছিল, তখন ইউরোপ খণ্ডে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছিল। এদেশে যখন শৌচাগারে জল পাত্রের প্রকার ভেদের ব্যবস্থার প্রচলন হইতেছিল, ওদিকে তখন জ্ঞানের অফুরন্ত স্ফূরণ হইতেছিল। ইউরোপে যখন সাম্যের মোহন বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তখন আমরা—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যোগী—আমাদের জন্মগত অধিকার কতটুকু তাহারই সত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত। হিন্দু সমাজে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় সংস্কার করিলে এখন আর কোন কাজ হইবে না। এখন একেবারে অস্ত্র চিকিৎসার সময় আসিয়াছে।

রামমোহন রায় এদেশে সমাজ সংস্কার আরম্ভ করার পর চীন জাপান প্রভৃতি অন্যান্য দেশে স্বাধীনতার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা হইল। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়া দেশের আশাতীত উন্নতি করিল। কিন্তু আমাদের দেশ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'। আমাদের দেশেই মুসলমান ভায়েরাই দ্রুতবেগে উন্নতি করিতেছেন। তাঁহাদের কত উদ্যম, কত পরিশ্রম ; তাঁহারা কেহ বাস করেন ঘরে, কেহ জমির অভাবে জাহাজে খালাসী হইয়াও অর্থ উপার্জ্জন করেন। আর আমরা জাতি যাওয়ার ভয়ে ঘরে বসে থাকি। শ্রদ্ধানন্দ স্বামী পঁচিশ হাজার মুসলমানকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করেছেন বলে বাঙলায় মুসলমানের চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাদের বলিতে পারি যে,

পঞ্চাশ জন শ্রদ্ধানন্দ আসিলেও বাঙালাদেশের একজন মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। এই ঘরভাঙ্গা হিন্দুদের সে দিকে দৃষ্টি বেশ সতর্ক। এদেশের ব্রাহ্মণেরা সোডা খাবেন, লিমনেড খাবেন, বরফ খাবেন, তাহাতে জাতি যাইবে না; কিন্তু 'জল-অচলের' জল খাইলেই একেবারে, সর্ব্বনাশ। বিড়াল কুকুর প্রভৃতি পশু রান্না ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি যদি রান্নাঘরের চৌকাঠ মাড়ায় তবে সর্ব্বস্ব গেল! এ সমস্ত ভণ্ডামি থাকিতে হিন্দুর অধোগতি অনিবার্য্য। ওরে হতভাগারা, জাত্যভিমানের দিন আর নাই! ওরে এখনও তোদের ঘুম ভাঙ্গুক! তোরা এক হতেই সব জন্মেছিস্, আবার সব এক হ। এখন আর তোদের দ্বিধা করিবার দিন নাই। এখন চাই শুধু প্রাণ। দেশে এখন যে প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে! সে প্রায়শ্চিত্ত না হইলে হিন্দুর নাম লোপ হইয়া যাইবেই।

যাঁহারা খুলনা যশোহরের ইতিহাস পড়িয়াছেন তাঁহারা মঘী ব্রাহ্মণ ও মঘী কায়স্থের কথা জানিয়া থাকিবেন। আগে মঘেরা ঐ অঞ্চলে লুঠ করিতে আসিয়া যাহাকে যাহাকে স্পর্শ করিত সেই পতিত হইয়া যাইত। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে অনেকেই পতিত হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুরা তাঁহার জাতি ভাইকে ত্যাগ করিতে জানেন, কিন্তু গ্রহণ করিতে জানেন না। মুসলমানের মধ্যে আমি দেখি তাঁহারা আমীরই হউন, আর ফকিরই হউন, একসঙ্গে আহার করিতে দ্বিধা করেন না। আর হিন্দুদের দেবমন্দিরে আমরা দেখি ব্রাহ্মণ ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া দেবতা দর্শন করেন, ক্ষত্রিয় হয়তো বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেবদর্শন করেন, আর শূদ্র বাহির হইতে দূরবীন লাগাইয়া দেখেন। ইহাতে হিন্দুজাতির ভিতর সদ্ভাব থাকিবে কি করিয়া?

সভাপতি মহাশয়, আপনারা ব্রাহ্মণ হউন, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের ঐ ধাপ্পাবাজির অনুকরণ করিবেন না। যে অন্যের সম্মান বোঝে না, সে আত্মমর্য্যাদাও বোঝে না। যাহার নিজের প্রাণ নাই, সে অপরের ব্যথা বুঝিবে কিরূপে? ধাপ্পাবাজি ক'রে অপরের উপর প্রতিষ্ঠা করা, অবনতের উপর অত্যাচার করা আর বেশীদিন চল্‌বে না। জাতিভেদের ফলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হিন্দুজাতকে বাঁচাইতে হইলে পরস্পরের প্রতি সম্মান করা চাই; অন্যের প্রাণের ব্যথা বোঝা চাই। আপনাদের এই সম্মিলনী বলুন, আর কায়স্থদের সম্মিলনী বলুন, আর অপর কাহারও সম্মিলনীই বলুন, ইহার মূল উদ্দেশ্য হওয়া চাই—মিলন, ভাইএর সঙ্গে ভাইএর প্রাণের মিলন। বৈদ্য ও কায়স্থের মোট সংখ্যা বুঝি ২৫ লক্ষ, আর একমাত্র নমঃশূদ্রের সংখ্যা ২২ লক্ষ। হিন্দুজাতি যদি এদের ত্যাগ করেন, তবে কাহাকে লইয়া হিন্দুত্ব রক্ষা হইবে? যাহারা হিন্দুজাতির সর্ব্বস্ব তাহাদের ত্যাগ ক'রে, তাহাদের নির্য্যাতন ক'রে কিরূপে হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিবে? কথায় বলে 'জোর যার মুলুক তার', 'লাঠি যার মাটি তার', আপনারা নিজের জোরে হিন্দুসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করুন। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করুন। আপনারাও বাঁচিবেন, হিন্দু জাতিও বাঁচিবে।

## রত্ন-পরীক্ষা

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'রত্ন-পরীক্ষা' আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্তা প্রধানতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে তৎসমুদয়ে উল্লিখিত তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা, মণিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, অমরবিবেক, হেমচন্দ্র কোষ, মুক্তাবলী, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, রাজনির্ঘণ্ট এবং ভোজকৃত যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি হইতে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া রত্ন-পরীক্ষা রচিত হইয়াছে। রত্নপরীক্ষা বিষয়ে যে হিন্দুরা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় দেড় বৎসর হইল হিন্দু-নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা ফরাসী দেশীয় প্রাচ্য ভাষাজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত M. Sylvan Levy প্রবন্ধকারকে 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' প্রাপ্তিস্বীকার কালে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"European scholars as well as the common public of Europe look at the Hindus as a peculiar kind of people living in their dreams, slaves of their fancy, wholly abhorring practical life. In order to fight against this prejudice, I engaged one of my pupils, M. Pinat to prepare an edition and translation of the books concerning the Ratan Pariksha. His books were published six years ago."

ইহার কিছু পূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৮২ সালে জার্ম্মানদেশীয় সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিত Dr. Garbe নরহরি কৃত রাজনির্ঘণ্টুর ত্রয়োদশ সর্গের এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। * তাহাতেও অনেকগুলি ধাতু, উপধাতু ও মণির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে বঙ্গভাষাতেও রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—স্বর্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেন কৃত 'রত্ন রহস্য' ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের 'মণিমালা'। কিন্তু যোগেশ বাবু অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকে পুরাতন ও নূতন জ্ঞান গ্রথিত করিয়া পুরাতন আধারের উপর নূতন মত স্থাপন করা গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাকে আমাদের পুরাতন রত্নশাস্ত্রের আধুনিক সংস্করণ করাই উদ্দেশ্য।" গ্রন্থকর্ত্তা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিলে আরও ভাল হইত। কতটুকু পুরাতন, কতটুকু নূতন, তাহাও স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইলেই ভাল হইত।

* 'Indischen Mineralien.'

পুরাতনের সহিত নূতনের সম্মিলন করা কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে বিঘ্ন আছে, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি বিচার করিয়া মণির আধুনিক নাম নিরূপণ করা দুরূহ। পুরাণে অধিকাংশ রত্নের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যে সকল রত্নের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে, তাহাও চর্চ্চার অভাব হেতু দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন জহরীর নিকট হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিলে রত্ন সমূহের নাম নিরূপণে কোন সন্দেহ থাকে না। গ্রন্থকার এ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া—আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষের রত্ন ধারণ করিবার অনুরূপ ব্যবস্থা আছে তাঁহারাই এইরূপ পরীক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

গ্রন্থকার যদিও শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও সরল রচনা দ্বারা গ্রন্থখানি অতীব সুপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থপ্রারম্ভে তিনিও M. Levy-র ন্যায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রত্ন-পরীক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন আর্য্যগণ যে আধ্যাত্মিক বিদ্যার ন্যায় লৌকিক বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

অতি পুরাকাল হইতে স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে মণি, মুক্তা, মরকতাদি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। প্রাচীন আর্য্যেরা যে রত্নদ্বারা কেবল দেহ অলঙ্কৃত করিতেন তাহা নহে, গৃহ ও দেবপ্রতিমার ভূষণস্বরূপ রত্নসমূহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। যে বস্তুর ব্যবহার এত প্রচুর ছিল, তৎসম্বন্ধীয় ব্যবহার-জ্ঞান প্রাচীন আর্য্যজাতির যে বিশিষ্টভাবেই ছিল, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? এ সম্বন্ধে সমালোচ্য গ্রন্থ হইতে দুই একটি স্থান আমরা পাঠকদিগের নিমিত্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

অধিকাংশ মণিই স্বল্প সংঘর্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তবে মণি অনুসারে কাঠিন্যেরও (hardness) তারতম্য আছে। এই গুণ অবলম্বন করিয়া মণি নির্ব্বাচনের জন্য একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। প্রাচীন আর্য্যেরা যে ইহা অবগত ছিলেন তাহা গরুড় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হইবে।

জাতিরজাতিং বিলিখতি, জাতিং বিলিখন্তি বজ্রকুরুবিন্ধাঃ।
বজ্রৈর্বজ্রং বিলিখতি, নান্যেন বিলিখ্যতে বজ্রাঃ॥

জাতি-মণি অজাতি-মণিকে লিখিতে পারে, বজ্র ও কুরুবিন্ধ জাতিকে লিখিতে পারে; কিন্তু বজ্রই কেবল বজ্রকে লিখিতে পারে, অন্য কিছুতে পারে না, (রত্ন-পরীক্ষা, ৪৩ পৃষ্ঠা)।

পুরকালে যে মণি ও কাচ দ্বারা কৃত্রিম হীরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানা ছিল, তাহা গরুড় পুরাণ হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে।

ক্ষারাম্লং লেপয়িত্বা তু রৌদ্রে চৈব পরিক্ষিপেত্।
কৃত্রিমং যাতি বৈবর্ণ্যং সহজঞ্চাতিদীপ্যতে ॥

ক্ষার এবং অম্ল * লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিলে কৃত্রিম হীরক বিবর্ণ হয়, কিন্তু সহজ হীরক অধিক দীপ্তিশালী হয়।

উপরের উক্তি হইতে গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন যে, পুরাকালে রত্নশিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কেন না সহজ পদার্থের কৃত্রিম অনুকরণ প্রস্তুত করা অল্প কলার সাধ্য নহে। বস্তুতঃ আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই কৃত্রিম বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

হীরক ইন্দ্রধনুসদৃশ দীপ্তিশালী এবং অগ্নিসংস্পর্শে দহনশীল, এই সকল তত্ত্ব যে প্রাচীন আর্য্যেরা জানিতেন তাহা আমি হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রাচীনেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে রত্নের মধ্যে গণ্য করিতেন। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা জহরীর একটি প্রধান কার্য্য। অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা স্বর্ণে খাদ আছে কিনা তাহা অবগত হওয়া যায়; কিন্তু খাদের পরিমাণ কত তাহা জানা যায় না। পুরাকালে সাইরাকুজ দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিস্ আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের যে অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা স্বর্ণে অন্য কোন নিকৃষ্ট ধাতুর পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। আর্য্যেরা আর্কিমিদিসের আবিষ্কৃত নিয়ম অবগত ছিলেন না; কিন্তু শুক্রনীতিতে ধাতুদিগের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আর্কিমিদিসের তুল্য একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম উল্লিখিত আছে।

একছিদ্র সমাকৃষ্টে সমখণ্ডে দ্বয়োর্যদা।
ধাতোঃ সূত্রং মানসমং নির্দ্দিষ্টস্য ভবেত্তদা ॥

অজ্ঞাত ও নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণ একই ছিদ্র দিয়া টানিয়া সূত্র কর। উহাদের সমদীর্ঘ সূত্র উন্মানে সমান হইলে অজ্ঞাত স্বর্ণটিও নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানা যায়, (রত্নপরীক্ষা, ১৬০পৃ)।

যোগেশবাবু আর্য্যশাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধারের যে চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। সময়াভাববশতঃ তাঁহার গ্রন্থের সম্যক আলোচনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিন্তু আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার গ্রন্থখানি যে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা, যাঁহারা রত্নাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হন, এবং অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া

* গ্রন্থকার অনুবাদে ক্ষার যুক্ত অম্ল লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কেন না ক্ষার ও অম্ল বিরুদ্ধ গুণ সম্পন্ন।

যদি বর্ত্তমানকালে দেশে বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি একটু মনোযোগ করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে। নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গদেশে আমরা এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞান আলোচনা করিবার সময় একটি কথা স্মরণ না রাখিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। তাহা এই যে, বর্ত্তমানকালে জগতে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদিগের বিজ্ঞানজ্ঞান সামান্য ছিল। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, 'যখন ইউরোপ অজ্ঞান' তমসাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালের পক্ষে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল গৌরবজনক। প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে এবং আত্মসম্মানজনিত উৎসাহও বৃদ্ধি পায়। এইটুকু জাতীয় লাভ। কিন্তু বনিয়াদী ঘরের দরিদ্র অপদার্থ বংশধরের ন্যায় যদি আমাদের শূন্যগর্ভ অহঙ্কার ও তজ্জনিত আলস্য বাড়ে, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের পথ ক্রমেই প্রশস্ততর হইবে।

প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের পরিবর্ত্তে কুসংস্কার এবং কবি কল্পনার রাজত্বও বিস্তৃত হইয়াছিল। গজাদি প্রাণীর মস্তকে মণির অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের উক্তির প্রমাণ। প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি কারণে ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছিল, 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের' ১০৭ পৃষ্ঠায় তাহার কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে যোগেশবাবু বরাবর বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার তদ্‌বিষয়ক কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচারিত তাঁহার হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। 'রত্নপরীক্ষা' পাঠে আমরা যে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। *

* অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'রত্ন-পরীক্ষা' নামক গ্রন্থের সমালোচনা

# অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আবেদন

প্রিয় ছাত্রগণ,

আমি বৎসরের এই সময় একবার দেশে আসি। আমার জীবন-সন্ধ্যা ত ঘনাইয়া আসিয়াছে ; আর কত দিন যে এই স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষীতীরে পল্লীমাতার শ্যামবনানীর কোলে ফিরিয়া আসিতে পারিব তা জানি না। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতদিন কতস্থানে ঘুরিয়াছি, কত নগরে, কত বিশাল সৌধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এই নিভৃত পল্লীগ্রামে —যেখানে শৈশবের আনন্দের দিনগুলি ধীরে ধীরে কাটাইয়াছি—তাহাকে বোধহয় কখনও ভুলিতে পারিব না। কবির ভাষায় বলি "নিরখিতে সেই ভূমি চিতঃ সদা চায়।" আজ তোমাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে ; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার বিষাদ সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে। তোমরা বোধহয় শুনিয়া থাকিবে যে, মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতের হরিজনের উদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ ধরিয়া যাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় কার্য কলাপে ধীরে ধীরে আমার যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছে আজ তাঁহার জীবন-বিসর্জ্জন পণে সত্যই আমি বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া যাইতেছি। এই অনশন ব্রতে সমগ্র ভারত নয়, পৃথিবীর সমস্ত লোক উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেলিত। তাঁহার সংকল্প অচল ও অটল। ভাগ্যে যে কি আছে জানি না। ভগবান্ না করুন, যদি তিনি এই দৃঢ় সংকল্পে জীবন বিসর্জ্জন দেন, তাহা হইলে ভারতের প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে।

আজ ২।১ দিন হইল আমি ঋষিপাড়ায় তাহাদের ঘর বাড়ী, এবং তাহারা কি অবস্থায় থাকে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম। এই ঋষিরা আমাদের দেশে অধঃপতিত জাতি। ইহাদের স্পর্শে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দেহ নাকি অশুচি হয়। ইহারা বহুদিন হইতে সমাজের সকল রকম অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। যেদিন হইতে ইহারা এই ঋষির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইদিন হইতে ইহারা যেন চিরদিনের তরে অভিশপ্ত। কিন্তু অন্যান্য দেশে যেখানে শ্রমের মর্য্যাদা আছে, সেখানে জাতিগত অধিকার বা অনধিকারের কোন কথাই নাই। উইলিয়াম কেরীর কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবে। তাঁহাকে বাংলা ভাষার একরকম জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একদিন ইংলণ্ডে একটি সান্ধ্য-ভোজে যোগদান করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্রলোক অপর একজনের কাণে কাণে বলিলেন—'শুনুন, উইলিয়ম কেরী একজন মুচীর ছেলে।' কেরী তাহা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন—'মহাশয় ভুল করিলেন, আমি মুচীর ছেলে নই, একজন সেলাইজুতির ছেলে।' ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সে দেশের সমাজে আমাদের দেশের জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার বিষ একেবারেই প্রবেশ করে নাই।

তারপর William the Conqueror-এর কথা বলি। তিনি একজন চামারের ছেলে। তাঁহার পিতা Robert Duke of Normandy একদিন একটি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত একটি অপরূপ সুন্দরীর অবয়ব তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিশেষে জানিলেন যে, তিনি একজন চামারের দুহিতা। এই চামার কন্যার গর্ভেই বিজয়ী উইলিয়ামের জন্ম হয়। আধুনিক রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা Stalin-ও একজন চামারের সন্তান। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা মানুষকে হীন করা যাইতে পারে না।

মানুষ মানুষকে ছোঁয় না। ইহার চেয়ে যে আর কিছু পাপ থাকিতে পারে তাহা আমার কল্পনাতীত। ইহা কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা অপধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কুধর্ম্ম। বিড়াল কুকুর ঘরে ঢুকিতেছে, তাহাতে দোষ হয় না, কিন্তু যদি একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য গৃহে প্রবেশ করে অমনি হাঁড়ি ফেলিতে হইবে; যেন অস্পৃশ্যতারূপ বিষ তাহার শরীর হইতে অর্জ্জুনের শরের ন্যায় ভাতের হাঁড়ী ও জলের কলসীর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিবেকানন্দ এক সময় বলিয়াছেন—"হায় হিন্দুধর্ম্ম, তুমি এখন ভাতের হাঁড়ী ও জলের কলসীর ভিতর আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ।" আচ্ছা, ইহা কি কখনও সঙ্গত হইতে পারে? আজ বাঙলার লোকসংখ্যার শতকরা ৫৫জন মুসলমান। ইহারা অধিকাংশই হিন্দু ছিল। কিন্তু নির্য্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্মের ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দু-ভারত ছাড়া এইরূপ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। চীনদেশের লোকেরা তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা জানে না। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা আছে, কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথক।

আজ শতাধিক বর্ষ হইল—যে যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোজন করিলেন, সমাজের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূরীভূত করিবার জন্য এক নূতন হাওয়া সেইদিন হইতে প্রবাহিত হইতেছে। আজ আবার মহাত্মাজী তাহারই জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তবুও আমাদের দেশের লোকের চৈতন্যোদয় হইল না। এখনও সেই অচলায়তন গড়িয়া উঠিতেছে। এখনও সেই আভিজাত্য অভিমান রহিয়াছে।

হিন্দু সমাজ আজ জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কাররাশি সমাজের দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মের নামে এরূপ ভণ্ডামি ও কপটাচার আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। লেমনেড খাও, বরফ খাও তাহাতে জাতি যাইবে না, কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্যের ছোঁয়া জল খাইলেই সর্ব্বনাশ। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া

আসিয়াছে এবং ইহার ফলে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে। মহাত্যাগী আগেই তার পথ দেখাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"নেমেছে ধূলার পরে হীন পতিতের ভগবান, অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।" আজ আর ভাবিবার সময় নাই। আজ এই দিন হইতে সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা পুরাতন সংস্কার দূর করিয়া দিব। দিকে দিকে যে নূতনের হাওয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, প্রাণে প্রাণে যে আহ্বানের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার সহিত অগ্রসর হইব। জীবন যাত্রার পথে অনেক বাধা আসিবে তাহাতে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না; সংগ্রাম করিতে হইবে, জয়ী হইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জীবের সহিত একটি প্রাণের, একটি দরদের সম্বন্ধ স্থাপন কর, দেখিবে জগতের সবই সুন্দর। *

* ৯।৫।৩৩ তারিখে রাড়ুলী স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতা—আনন্দবাজার হইতে উদ্ধৃত।

## বাঙালীর দাস মনোভাব

### (খুলনায় বিজলীবাতি উপলক্ষ্যে)

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

সম্প্রতি আমি খুলনা সহরে কয়েক ঘণ্টা কাল অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে সহরের সৌভাগ্যের প্রতীক দুইটি জিনিস আমার দৃষ্টি গোচর হইল। প্রথম রাস্তায় পিচ ঢালিয়া মটর যাতায়াতের সুবিধা; দ্বিতীয়, বিজলীবাতি। বলা বাহুল্য ইহার সন্দর্শনে আমার চিত্তে হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদের ছায়াপাত হইল। একে ত এই বৃদ্ধ বয়সে দেশের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া আকুল হই, তাহার পর আমার প্রিয় খুলনা জেলার অধিবাসীগণ কি প্রকার মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভাবিয়া আরও বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম।

বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখা যাউক। দাস মনোভাব আমাদের কি ভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার একটু ইতিহাস জানা দরকার। সে আজ ৫৫।৫৬ বৎসর আগের কথা—আমি যখন F. A. এ পড়ি, তখন পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) মহাশয়ের সবে মাত্র হাইকোর্টে পেশার আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার হাবভাব, আকার ইঙ্গিত, হস্তসঞ্চালন ইত্যাদি আঠারোয়ানা ইংরেজী ধরণের। আমার একজন সহাধ্যায়ী প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন—"বলত ভাই, W. C. Bonerjee ত পুরোদস্তুর সাহেব, আচ্ছা ইনি স্বপ্ন দেখেন কোন্ ভাষায়? অথবা যদি কোন আততায়ী ইহাকে হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ করে এবং নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে, তখন কি তিনি Oh father, Oh

mother, come to my rescue, না, 'মারে বাবারে গেলুম রে' বলে চীৎকার করেন?" এইত গেল এক পর্ব্ব। W. C. Bonerjee-র সমসাময়িক আর একজন ব্যারিষ্টারের কথা বলি। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসভূমি ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে। ইহার পিতা একজন সাব জজ ছিলেন। ইনিও ব্যারিষ্টারীতে বিশেষ পশার লাভ করেন, এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাস করিতেন। প্রত্যহ প্রত্যূষে খানসামা বাবুর্চিরা টেবিলে খানা আনিয়া দিত, বেচারা সহধর্ম্মিণীও অনেকটা ইউরোপীয় মহিলার অনুকরণে কাঁটা চামচ লইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া খানা খাইতেন।

এইখানে একটু আত্মকথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি অন্যূন ৮ বৎসর বিলাতে বাস করিয়াছি। প্রথমবার একাদিক ক্রমে ৬ বৎসর; তাহার পর ক্রমান্বয়ে আরও ৪ বার যাতায়াত করিয়াছি। বলাবাহুল্য ইংলণ্ডে বড় বড় সভায় আমাকে ভোজ খাইতে হইয়াছে। বিশেষ যখন ১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ Congress of the Universities of the Empire-এ যোগ দান করি। এমন কি Lord Mayor's Banquet-এ উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এখানে যে প্রকার ভোজ হয়, তাহা ইংলণ্ডে অপরাপর স্থানে অতীব বিরল। কিন্তু আমি যখন বৎসরান্তে গ্রীষ্মকালে দেশে যাই তখন প্রায় ফরমাস করি যে, আমার নদীর নোনাজলের চিংড়ি ও পুই শাক চচ্চড়ী আমাকে একটু আস্বাদ করিতে দিতে। যাই হোক, শেষোক্ত ব্যারিষ্টার মহোদয় টাট্‌কা মচমচে মুড়ি ও তাহার সহিত খাঁটি সরিষার তৈল ও লঙ্কা মিশ্রিত করিলে যে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়, তাহার আস্বাদ কখনই ভুলিতে পারেন নাই। কিন্তু বড়ই মুস্কিল তাঁহার খানসামা ও বাবুর্চি যদি দেখে যে 'সাহেব' সত্য সত্যই সাধারণ ইতরলোকের ন্যায় মুড়ি খান তখন তাহারা বাহিরে না হোক মনে মনে বলিবে, সাহেব খাঁটি সাহেব নন? আমাদের মত দেশী। কিন্তু ব্যারিষ্টার মহোদয় তাঁহার দাসমনোভাবমূলক দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারিলেন না। বুদ্ধিমতী গৃহিণী এক সদুপায় স্থির করিলেন। নিজে একটি বাটিতে মুড়ির সহিত সরিষার তেল কাঁচা লঙ্কা মিশাইয়া অঞ্চলে লুকাইয়া স্বামীর ঘরে আনিয়া দিতেন এবং যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন। খাওয়া শেষ হইলে আবার বস্ত্রাঞ্চলে বাটিটা লুকাইয়া বাহির হইয়া যাইতেন।

১৮৮৩ সালে যখন আমি লণ্ডনে অবস্থিতি করি, সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তখন এই সমস্ত সাহেবীয়ানা সত্ত্বেও বাবুদের চোখ ফুটিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা নেটিব অর্থাৎ শিখিপুচ্ছধারী বায়স।

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে, আমাদের এখনও মোহ ঘুচে নাই। ইউরোপীয়গণের বাহিরের অনুকরণ করিতে পারিলেই আমরা ভাবি যে কেল্লা ফতে করিলাম। আমি এই বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইয়াছি যে, ইউরোপীয়গণের যে সমস্ত অসাধারণ গুণ, যথা—স্বদেশ প্রেম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মশীলতা, নির্দ্দিষ্ট সময় মত কাজ করা

ইত্যাদি—তাহার দশভাগের একভাগ যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা হইত না। কিন্তু হ্যাটকোট পরিলাম, সহরে বা ঘরে বিজলীবাতি প্রজ্জ্বলিত হইল, মোটরগাড়ী চড়িলাম, আর অমনি যে ইউরোপীয়দের সহিত এক পদবীতে উন্নীত হইলাম ইত্যাকার সংস্কার কেবল যে ভ্রমাত্মক তাহা নহে, সর্ব্বনাশের কারণ। প্রতি জেলার সহরে কেবল নয়, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তায়ও মোটর বাস, লরী ইত্যাদি ক্রমাগত চলিতেছে, এবং ইহা সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমরা কত বড় সভ্য হইয়াছি। বাঙালা দেশের অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। আমি রাজসাহী এবং রংপুরে দেখিয়াছি যে, অতি প্রত্যূষ হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী যাতায়াত করে এবং ইহার ফলে এত ভীষণ ধূলা উঠিতে থাকে যে, ঘর দরজার উপর এক ইঞ্চি পুরু ধূলা সর্ব্বদাই জমিয়া থাকে। এই ধূলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁফ, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা উৎকট ব্যাধির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

কয়েক বৎসর হইল খুলনার একখানি কাগজে একজন লেখক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন এই যে, মোটর লরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করাতে দুই একজন মহাজনের পকেট পূর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু শত শত দরিদ্র গাড়োয়ানের মুখের অন্ন কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। সেন্‌সাস হিসাবে একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির উপর স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি পরিবার ধরিলে গড়ে ৫জন নির্ভরশীল; সুতরাং ২।৩ খানা মোটর লরি চলিলে যদি একশত জন গাড়োয়ানের অন্ন যায় তাহা হইলে ছা-বাচ্চা সমেত অন্যূন ৫০০ শত লোক উপবাস করিতে বাধ্য হয়।

এতদ্ভিন্ন অর্থনীতি হিসাবে ইহা আরও দুঃখের কারণ; মোটর গাড়ী প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে আমদানী হয়, ইহার রবার টায়ারও বিদেশী এবং নূতন একখানি টায়ার বদলাইতে হইলে প্রায় ১৫০৲ খরচ, তা'ছাড়া পেট্রলও বিদেশী, কেবল স্বদেশী পরিচালক। এই মোটরের কল্যাণে বৎসরে কয়েক কোটি টাকা আমরা বিদেশে অম্লানবদনে পাঠাইয়া দিই। আমি বিজলী বাতি ব্যবহারের বিরোধী নই, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, যদি আমি বৈদ্যুতিক তার ( cable ), ডিনামো ( oil engine ) প্রভৃতির সাজ-সরঞ্জাম এই দেশে প্রস্তুত করিয়া শত সহস্র যুবকের ও শ্রমজীবীর অন্ন-সংস্থান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিত না। আজ খুলনা এবং সমগ্র বঙ্গদেশের অর্থনাতিক অবস্থা একবার আলোচনা করা যাক্। ধানের ও পাটের দর এক-তৃতীয়াংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ। সর্ব্বত্রই হাহাকার—জমিদার বল, গাঁতিদার বল, প্রজা বল, উকীল বল, ডাক্তার বল, ব্যবসাদার বল, মহাজন বল, সকলেই দিশাহারা। খুলনায় যে সময়টুকু ছিলাম তাহার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে বলিলেন যে, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়া আজকাল একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যথায় ঘটি, বাটী, অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া টানাটানি। কিন্তু এই দুরবস্থা সত্ত্বেও খুলনা সহরবাসীগণ আজ বিজলী বাতির মোহে অভিভূত। সকলেই মনে করেন যে, হয়তঃ কখন বৈদেশিক পর্য্যটক

আসিয়া বলিবে "What a prosperous town Khulna is ? And it is indicative of the wealth of the district, এবং দরকার ইহালে এই certificate ঘরে ঘরে টানাইয়া সকলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন।

হায় বাঙালী ! তোমার মহিমা কীর্ত্তনে আমি আজ বলিহারী যাই। তুমি দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছ, তবুও ইহাতে তোমার চৈতন্যোদয় হইতেছে না ! আমার আত্মচরিতে ইহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়াছি যে, কেবল অ-বাঙালীরা তোমার সোনার বাঙলা হইতে প্রতিমাসে দশ কোটি টাকা করিয়া লুটিয়া লইয়া যাইতেছে ; আর তুমি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় তকমা লইয়া বেকার সমস্যা বাড়াইতেছ এবং অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করিতেছে। অথচ কবির মর্ম্মস্পর্শী বাণী—"ভূষণ বলে পরব না আর গলার ফাঁসি"—এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না।

খুলনায় বিজলী বাতি সভ্যতার সোপানে আরোহণের প্রতীক না জাহান্নামের পথে অগ্রসরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ? কথায় বলে "বাহিরে কোচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন।" *

## জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি

বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে ও দুর্জ্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনে একাগ্র সাধনা করিয়া তাহারা যেরূপ দ্রুত ও আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থ ই প্রশংসনীয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। আজ যে ইয়োরোপ ও আমেরিকা জাতি হিসাবে সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান সাধনাই তাহার মূলে। বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলেই আজ আকাশের বিদ্যুৎ তাহাদের আজ্ঞাবাহিনী দাসী ! জলপ্রপাতের গতি, নদ-নদীর তরঙ্গবেগ, সূর্য্যরশ্মির উত্তাপ, আজ তাহাদের পদানত ভৃত্য। তাহারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে দূর দূরান্তরের লোকের সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে। বেতার বার্ত্তার সাহায্যে অগাধ সমুদ্রে ভাসমান তরীর সঙ্গে প্রতিক্ষণে যোগরাখা সম্ভব হইয়াছে। উড়োজাহাজে তাহারা দেশ দেশান্তরে ছয় মাসের

* খুলনায় বিজলীবাতি সম্বন্ধে "খুলনাবাসীর" সম্পাদকের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরীতে বসিয়া আচার্য্য দেব এই মন্তব্য প্রকাশ করেন। খুলনাবাসী, ৩-৬-৩৩।

পরিবর্ত্তে আজ ছয়দিনে উত্তীর্ণ হইতেছে। রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন প্রভৃতি বিস্ময়কর ও অদ্ভুত আবিষ্কারের দ্বারা আজ পৃথিবীর লোকের বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞান আজ ও-দেশের মানুষকে পৌরাণিক ঋষি তপস্বী বা দেবতাদের ন্যায় প্রভূত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে।

জাপান আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞান সাধনার বলে কত অল্পদিনের মধ্যেই না এশিয়া মহাদেশের সকল জাতি অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চীনও ক্রমশঃ এই বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীক্ষালাভ করার ফলে জগতে অজেয় হইয়া উঠিবে। জাপানকে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ সম্মান ও সম্ভ্রম দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীদের সম্মান কোথাও নাই। ইয়োরোপ আমেরিকা ত দূরের কথা, তাহারা আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইনেও সকলের অবজ্ঞার পাত্র। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মত বাঁচিতে হইলে আমাদের সকলকে বিজ্ঞান সাধনায় একাগ্রমনে ব্রতী হইতে হইবে। যতদিন না এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হইতেছে, ততদিন আমাদের দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ঘুচিবে না।

দেশের ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল। তাহাদের মধ্যে যেমন স্বদেশানুরাগ উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন, সেইরূপ বিজ্ঞান সাধনায় অনুরাগী হইয়া উত্তর-জীবনে যাহাতে তাহারা এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হয়, এখন হইতে তাহাদের সেইরূপ শিক্ষার দ্বারা মনোবৃত্তি গঠন করা আবশ্যক।

আজকাল দেখিতে পাই—"পুরাকালে আমাদের দেশে সমস্তই ছিল, য়ুরোপ ও আমেরিকা এখনও সেখানে পৌঁছাইতে পারে নাই"—এই বলিয়া অনেকেই ছেলেদের নিকট গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কেহই তাহাদের বলেন না যে, ভারতবাসী তাহাদের সেই প্রাচীন সাধনা হইতে বিরত হওয়ার ফলেই তাহাদের আজ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। উচ্চ শিক্ষার নামে কেবল কতকগুলি বড় বড় বই মুখস্থ করিয়া এদেশের ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বপুরুষদের অধুনাবিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া, আর বেদ-বেদান্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না। নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য একালে তাহারা কেবল মুখে বড় বড় কথা বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। দুঃখে, দৈন্যে, রোগে, অনাহারে, দাসত্বের নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া তাহারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবন ও ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় পরস্পর বিরোধ ও আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক বিজ্ঞানের সাধনায় যতদিন না তাহারা নিজেদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করিতে শিখিবে ততদিন দেশের ও জাতির উন্নতির কোন আশা নাই।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে য়ুরোপ ও আমেরিকা এমন কি জাপানও অগ্রণী হইয়াছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রতাপশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ও নিত্য-ব্যবহারের অসংখ্য জিনিসপত্র ঔষধ ও প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান জগতের যত শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিহীন দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিতেছে। ভারতবর্ষ তাহাদের একটি মস্ত বড় ক্রেতা। এদেশের বাজার বিদেশী জিনিসে ভরিয়া গিয়াছে আমরা নির্ব্বিচারে সেই সমস্ত কিনি, ফলে আমাদের কষ্টার্জ্জিত পয়সা অবাধে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যতই ধনী হইয়া উঠিতেছে, আমরা ততই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি।

মাত্র ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যেই জাপান যে আজ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইতে পারিয়াছে, সে কেবল বিজ্ঞান অনুশীলনের গুণেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা উপশাখায় জাপান যে কত রকমেই উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের দুই একটি স্থূল উদাহরণ দিলেই তাহা অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রচুর ফেলা-ছড়ানো অকেজো লোহার টুকরো-টাক্‌রা, কুচো লোহা, কাঁচা লোহা ও পিগ্-আয়রণ অত্যন্ত সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া তাহা হইতে মজবুদ পাকা লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারী করিতেছে। সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, অস্ত্রশস্ত্র-কামান বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশিরাশি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। জাপান খেলনা, পুতুল, বাইসিকেল, বিবিধ ইলেকট্রিক্ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া শুধু যে নিজেদের অভাবই পূরণ করিতেছে তাহাই নহে, দেশ বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিল রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে; অর্থাৎ জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষালাভ করিবার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু ভারতবর্ষ য়ুরোপের সাহিত্য লইয়াই ভুলিয়া রহিল; জাপান বাছিয়া লইল—বিজ্ঞান। ফলে সত্তর বৎসরের মধ্যে জাপানে হইল নবীন সূর্য্যোদয়, কিন্তু দেড়শত বৎসরেও ভারতবর্ষ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' রহিয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্যে। গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে কত হাজার হাজার ছেলে আই. এস-সি., বি. এস-সি., এম এস-সি. পাশ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ছেলে পরবর্তী কালে বিজ্ঞান সাধনাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে?

অনেকের মুখে শুনিতে পাই অর্থের অভাবেই বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায়-ক্ষেত্র কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা সত্য নয়। কত অশিক্ষিত, কপর্দ্দক শূন্য মাড়োয়ারী, বিহারী, পাঞ্জাবী এ দেশে আসিয়া দিনান্তে মাত্র একমুষ্টি ছাতু খাইয়া,

কত কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্রমে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। এদেশের ছেলেদের চাই ব্যবসায়ে সেই আগ্রহ, যাহা সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিবার ও জয়ী হইবার শক্তি দিতে পারে। সুখের বিষয় যে, চাকরির অভাবে কোনো কোনো ছেলের মতিগতি আজকাল ব্যবসায়ের দিকে ঝুকিয়াছে। দেশের লোকের উচিত তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া দেশীয় পণ্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা। বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও, বিলাসিতা ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের বৃহৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ ও পোষকতা দান করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কোন দিনই আমাদের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না, এবং আমাদের দুঃখও দূর হইবে না। পরাধীন জাতির বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বাবুগিরি করিতে লজ্জা পাওয়া উচিত। *

## সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙলার ও বাঙালা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাহিরে। গল্পে, গানে, কবিতায়, নাট্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় বাঙলা সাহিত্যে এই মহারথী তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বিজয়মাল্য আহরণ করিয়া আনিয়াছেন। বঙ্গজননীর লজ্জানত শিরে তিনি বিজয়তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। বাঙলাভাষা আজ যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত তাহার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টা। বাঙালী হইয়াও বাঙলাভাষা পাঠ করা ইংরাজ রাজত্বের প্রথম যুগে শিক্ষিত সমাজের রুচিবিকার বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লইয়া তথাকথিত শিক্ষাসমাজকে যথেষ্ট বিদ্রূপও করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠ আত্মচেতনা প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে গড়িয়া উঠে নাই, একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরও অনেক দিকপাল মাতৃভাষার উন্নতির জন্য এবং ভাষাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল ইহা ঠিক। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে প্রাণশক্তি তাঁহাদের প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ অতি দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া পথ খুঁজিয়া লইতেই তাঁহাদের অনেকটা শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছিল। সাধারণ লোক তখনও যেমন সাহিত্যের ধার ধারিত না, এখনও তেমনি তাহার সন্ধান রাখে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ কালেও যে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আস্থাবান্ ছিলেন না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে

* পাঠশালা, ১ম বর্ষ ( ১৩৪৫ ), ৮ম সংখ্যা।

অবশ্য এই অবস্থা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহার গতিবেগ খুব বেশী ছিল না। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিলেন, তাঁহার চিত্তের ঐশ্বর্য্য ও ভাষার ভাণ্ডার লইয়া। কমপক্ষে ৩০ বৎসর বাঙলা সাহিত্য তাঁহার অলোক-সামান্য সৃজনীশক্তি ও অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিয়াছে, এবং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বোধ হয় বলা যায় সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালে শ্রদ্ধানতশিরে তাঁহার সার্থক সৃষ্টির পূজা করিবে। রবীন্দ্রনাথের গুণকীর্ত্তন করার আজ প্রয়োজন কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। বাঙলার এই সত্যকার গুণীর গুণ কীর্ত্তন সমস্ত জগতেই হইতেছে। বিজ্ঞাপন দিয়া বক্তৃতা দিয়া প্রচার করিবার মত প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের হয় নাই। তাঁহার প্রতিভার অমর অবদানে আমাদের এই পরিষদ আজ ধন্য হইয়াছে। তাই পরিষদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহার স্মৃতি পূজার। বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব। আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাঁহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীর্ব্বাদে কবে আবার নূতন ঊষার অরুণোদয় হইবে।

মাত্র এই কয়টি কথা বলিয়াই আমি আজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিতেছি। *

# কলিকাতা ও সহরতলী—৫৪ বৎসর পূর্ব্বে

ইংরেজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর অতীত হইয়া গেল। সে সময়ের কলিকাতা কিরূপ ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, উহা যেন নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছি। কবি সত্যই বলিয়াছেন—"স্মৃতি শুধু জেগে রয়।" বাস্তবিক তখন কি ছিল, আর এখন কি হইয়াছে, তাহা আমার মত বৃদ্ধদিগের নিকটে শুনিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে, বিশেষতঃ যুবকবৃন্দের ; অবশ্য আমার নূতন কিছু বলিবার নাই।

প্রথম যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন আমাদের বাসা ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সন্নিকটে। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে বিলাত গমন করিয়াছেন॥ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সেই সময়কার কলিকাতার কোনও প্রতিকৃতি আছে কিনা, জানি না। তখন সবেমাত্র খিলান করা পয়ঃপ্রণালী ( Drain) কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত

*১৩৪৮ সালের ২০শে ভাদ্র তারিখে সাহিত্য-পরিষদে আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসুর অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচনকালে এই অভিভাষণ দেন। প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৪৮

হইতেছে। দুই চারিটি রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে, এবং নূতন জলের কল আসিয়াছে। হিন্দু সমাজের অনেকেই কলের জল অপবিত্র বলিয়া ব্যবহার করিতে নারাজ ছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থের গৃহে উড়িয়া ভারীদিগের দ্বারা ভারে তোলা গঙ্গাজল ব্যবহৃত হইত। এক ভার অর্থাৎ দুই কলসী জলের দুই আনা মূল্য ছিল। সুতরাং আজকাল আমরা জলের জন্য যে টেক্স দিই সেটাকে টেক্স বলা অন্যায়। পূর্ব্বের তুলনায় আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। তখন প্রতি বাড়ীতে মাটির সাধারণ পাতকূয়া ছিল, তাহার জলে থালা বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। আর ভারীরা যে গঙ্গাজল বা হেদুয়া, লালদীঘি, গোলদীঘি প্রভৃতি হইতে যে জল আনিত, তাহা কেবল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। পথে এক শ্রেণীর লোক "কূয়োর ঘটী তোলাবে" বলিয়া হাঁকিত। তাহাদের সহিত দড়ি ও কাঁটা থাকিত। তাহারা এখন আর নাই বলিলেই হয়। এরূপ অনেক পেষারই বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী (পগার) ছিল। সেই পগার দিয়া অতি কদর্য্য পঙ্কিল আবিল জলের স্রোত বহিত। সেই জলের Chemical character-এর কথা বলিতে চাহি না। তাহাতে ছিল না এমন জিনিস নাই। তাহার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইত। আর সেই পগারের পাড়ে গৃহস্থবাড়ী ও দোকান প্রভৃতি ছিল। প্রত্যেক পগার পার হওয়ার জন্য সাঁকো ছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, গাড়ী ঘোড়া একেবারে তাহার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে! এখনকার মত পূর্ত্তবিভাগ, মিউনিসিপ্যালিটি তখন হয় নাই। পয়ঃ প্রণালী ইত্যাদিতে কতরূপ জীব যে ভাসিয়া বেড়াইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশণের অন্ন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইত। পায়খানার মলও তাহাতে ঢালা হইত। আমার সম্পর্কীয় জ্যেঠা মহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা তখন কলিকাতায় চাকরি করিতেন, তাঁহারা বলিতেন—হাট-খোলা, কুমারটুলী প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মেথর গঙ্গায় বিষ্ঠা ঢালিত। স্রোতে সে সমস্ত ভাসিয়া বেড়াইত। কাপড় কাচিবার সময় তাহাতে সেই মল লাগিয়া যাইত, আর স্নানের সময় সিমন্তিনীদের কেশগুচ্ছে তাহা জড়িত হইয়া যাইত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। তখনকার তুলনায় এখন কলিকাতা স্বর্গ।

গঙ্গাতে সর্ব্বদা পালের জাহাজ দেখা যাইত। ইউরোপ হইতে যে সমস্ত সমুদ্রপোত পণ্যসম্ভার লইয়া এদেশে আসিত, তাহা পাল খাটাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইত। তবে তখন সুয়েজ খাল সবে মাত্র কাটা হইতেছে।

প্রায় একশত দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কবি ঈশ্বর গুপ্তের বয়স তখন ৬ কি ৭ বৎসর হইবে। সবেমাত্র তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি; চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহাকে কবি হইতে হয় নাই। কলিকাতায় কি দেখিয়াছ, জিজ্ঞাসা করিলে অমনি তিনি বলিয়া উঠিতেন—

"রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

কলিকাতায় কি প্রকার আবর্জ্জনা ও ময়লা ছিল, এবং কলেরার প্রকোপ কিরূপ ছিল, তাহা এই মশা মাছি হইতেই বুঝা যায়! সে সব কথা ভাবিলেও এখন আতঙ্ক হয়।

এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে, সেখানে তখন হেয়ার স্কুল ছিল। সেখানে আমরা সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া হাজির হইতাম। হেয়ার স্কুলের স্থানে তখন খোলা মাঠ ছিল। তখন স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া হেয়ার স্কুল রাখা হয়। একতলা বাড়ীতে ভবানীচরণ দত্ত লেনে তখন হেয়ার স্কুল বসিত। এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজ, উহার অপর পার্শ্বে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ। তখন হেয়ার স্কুলের মাত্র ২।৪ খানি ঘর ছিল। আর যে জায়গা খালি ছিল, সেখানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রিন্সিপাল মিঃ সাটক্লিফ য়ুনিভারসিটির কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান্ মেধাবী ছাত্র লইয়া শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা পাশের উচ্চ ভিটার উপর দাঁড়াইয়া সে সব অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। এখনকার হেয়ার স্কুল তখন সবেমাত্র নির্ম্মিত হইতেছে। তখন পুরাতন এলবার্ট হলও সংস্থাপিত হয় নাই। তাহার পর যে বাড়ীতে এলবার্ট হল স্থাপিত হয়, তাহার ২।৪ খানি ঘর ভাড়া লইয়া হেয়ার স্কুলের কাজ চলিয়া যাইত। তাহারই একটা হলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অতিরিক্ত রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে লেক্‌চার দেওয়া হইত। তখন বর্ত্তমান হাইকোর্টের বিল্ডিং তৈয়ারী হইতেছে। এখন যেখানে আলিপুরের সংলগ্ন সার্কুলার রোডের উপর ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ডিপাটমেণ্টের কতকগুলি গভর্ণমেণ্টের কারখানা-ঘর আছে, সেখানে ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। কিছু দিন পরে উহা হাইকোর্টে পরিণত হইয়া নব-নির্ম্মিত বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া গেল। যাদুঘর তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। পার্ক ষ্ট্রীটে এসিয়াটিক সোসাইটীর হলে যাদুঘর অবস্থিত ছিল। এখনও শকটচালকেরা তাহাকে "পুরানো যাদুঘর" বলে। চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে এক চিড়িয়াখানা ছিল। তাহাতে অনেক রকম পশুপক্ষী ও সরীসৃপাদি ছিল, দলে দলে লোক তাহা দেখিতে যাইত। কলেজের মধ্যে 'প্রেসিডেন্সী', 'জেনারেল এসেমব্লী' ও 'লণ্ডন মিশনারীর' খুব নাম ছিল। কলিকাতায় ২।৪টি মাত্র স্কুল ছিল। সমস্ত বাঙলায় এখন ৯ শত হাই স্কুল আছে। তখন মাত্র প্রত্যেক জিলায় একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুল ছিল, সব জিলায় ছিল কি না, মনে পড়ে না। যখন আমার পিতা আমায় কলিকাতায় আনয়ন করিলেন, তখন আমাদের গ্রামে আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত একটা মাইনর স্কুল ছিল। গ্রামে মাইনর স্কুল থাকিলে তখন সে গ্রাম ধন্য হইত। লোকে ভাবিত, না জানি কি একটাই না হইয়াছে। তখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, মেট্রোপলিটান, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমী নামক স্কুলটিও তখন ছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং "সুলভ

সমাচার" নামক একখানি পত্রিকার প্রচলন করেন। তাহাতে অনেক সংবাদ থাকিত; কিন্তু দাম ছিল মোটে এক পয়সা। এ রকম স্বল্পমূল্যের সংবাদপত্র পূর্ব্বে আর ছিল না। অবশ্য, বাঙলা "সোমপ্রকাশ" লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সাধুভাষায় লিখিত হইত বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন। তখনকার দিনে গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদক হইতে বাধা ছিল না। এমন কি, 'এডুকেশন গেজেট' নামক পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন গভর্ণমেণ্টেরই বেতনভোগী এক জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—স্বনামধন্য ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এডুকেশন গেজেটে তখন ভারতের অশান্তির কথাও প্রকাশিত হইত। এখন কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি কোনও কাগজের সম্পাদক, হন এবং তাহাতে যদি ভারতের অশান্তির কথা বাহির হয়, তবে সে কর্ম্মচারীর ভাগ্যে গভর্ণমেণ্টের কিরূপ কৃপাদৃষ্টি পড়ে, আশা করি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তখন খবরের কাগজ অত্যন্ত নিরীহ ও ভাল ছিল, তাহাদের রচনায় গভর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র আপত্তি করিতেন না, বরং অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন।

দেখিতে দেখিতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে পর পিতা মহাশয় আমাকে মাঝে মাঝে নিজের মামলা-মকদ্দমার তদ্বিরের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বিলাতী জজদিগকে দেখিয়া তখন অবাক্ হইয়া যাইতাম। আজ আমাদের দেশী লোকেরাও জজ হইতেছেন। পরলোকগত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়কেও আমি দেখিয়াছি।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক দিন আমাদের দেশের কপোতাক্ষী নদীর তীরস্থ সাগরদাড়ীর কবি ও ব্যারিষ্টার মধুসূদন দত্তের সঙ্গে আমার পিতা আমাকে পরিচয় করিয়া দিলেন। তখন আমি বালকমাত্র। বোধ হয়, ইংরাজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও আন্দামান পরিদর্শন করিতে যান, সেখানে শের আলী নামক এক জন ওহাবী তাঁহাকে হত্যা করে। সে সময়ে কিছুদিনের জন্য হাইকোর্ট বোধ হয় এখনকার টাউনহলে বসিত। সেখানেও জজ নর্ম্ম্যানকে আর এক জন ওহাবী ছুরিকাঘাত করে। অল্পসময়ের মধ্যে দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। ইহাতে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকলের মূলে ওহাবী ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ হইল। তাই এই ব্যাপার উপলক্ষে অনেক কাণ্ডকারখানা হইল। আমীর আলী নামক এক জন ধনী ওহাবীর বিচার হয় ও তাহাকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা যায়।

কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার তখনও আরম্ভ হয় নাই। তখনকার চৌরঙ্গী ও এখনকার চৌরঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। এ কালের মত বিরাট হর্ম্ম্য তখন মাত্র ২।৪টি হইয়াছে। উইলসন্ হোটেল তখন অবশ্য ছিল; কিন্তু এ কালের মত এত প্রকাণ্ড ছিল না। আর তখন কলিকাতার ধন-দৌলৎ এখনকার এক-দশমাংশও ছিল কি না সন্দেহ।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তেমন ছিল না। পাট তখন এ দেশে জন্মিত না বলিলেই চলে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী পাট চাষ হইত। গো-বন্ধনের, ঘর বা বাগানের বেড়ার এবং মৃৎকুটীরের চাল ছাইবার জন্য রজ্জু প্রস্তুত করিতে পাটের আবশ্যক হইত। তখন প্রতি পল্লীগৃহস্থ অবসর মত পাট হইতে সূতা পাকাইত। তখন পাট বড় একটা রপ্তানি হইত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পাটের রপ্তানি আরম্ভ হয়। তখন দুই একটি পাটের কারখানা হইতেছে। এখন কলিকাতা বন্দর হইতে পাট ও বোম্বাই বন্দর হইতে তূলার রপ্তানি বাদ দিলে কি অবস্থা হয়, তা কল্পনায় আসে না।

হাওড়ার লোকসংখ্যার অধিকাংশই পাটের ব্যবসাদার ও কুলী লইয়া গঠিত। বজবজ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত হুগলীর উভয় তটে ৮২টি পাটের কল আছে। প্রত্যেক পাটের কলে গড়ে ৪।৫ হাজার শ্রমজীবী আছে। এইরূপে প্রায় ৩।৪ লক্ষ লোক আজ জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যখন পাট হয় নাই, তখন চাউল অত্যন্ত কম হইত, চাউলের রপ্তানিও খুব কম ছিল। আমাদের ছেলে বেলায় পাঁচসিকা মন চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তাহার পর দেড় টাকা, পৌণে দুই টাকা। দেশী জিনিসের দুর্ম্মূল্যতা চাউলের দর দেখিয়া বুঝা যায়। আমাদের দেশী মোটা চাউল যখন পাঁচসিকা, দেড় টাকা, তখন কলিকাতায় না হয় মূল্য ছিল ২৲ টাকা হইতে ২৷৹ টাকা পর্য্যন্ত। আমি যখন কলিকাতায় আসি, তখন বিশুদ্ধ ঘৃত ছিল মণ প্রতি ১৮৲ টাকা, আর এখন বিশুদ্ধ ঘৃত ত বাজারেই পাওয়া যায় না।

যাহার গৃহে গরু আছে, সে নিজে ননী মাখন করে। সে উহা হইতে বিশুদ্ধ ঘৃত পাইতে পারে। বাজারে যে ঘৃত বিশুদ্ধ বলিয়া চলে, তাহাতেও কিছু না কিছু ভেজাল আছেই, আর তাহাও ৩৲ টাকা সেরের কমে পাওয়া দুষ্কর।

এখন যেমন এদেশে কেরোসিনের বহুল প্রচার হওয়াতে টিনের ক্যানেস্তারা অসংখ্য মিলে, তখন তাহা ছিল না—কেন না কেরোসিন তৈলের ব্যবহার হইত না। মট্‌কির বিশুদ্ধ ঘৃত মণ প্রতি ১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইত, এবং চর্ব্বি, মহুয়া প্রভৃতির তৈল ভেজাল দেওয়া হইত না। মিঠাই, কচুরী, গজা, জিলাপী প্রভৃতি ৫ আনা হইতে ৬ আনা সের মূল্যে পাওয়া যাইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার পিতা এই জন্য তাড়াতাড়ি এক গাড়ী অর্থাৎ ২০ মণ বালাম চাউল ২৷৹ মণ দরে ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, মহাজনেরা এই সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই কিছু দর চড়াইয়াছিলেন, নচেৎ বাজার দর আড়াই টাকার বেশী হইত না। এখন সেই চাউলের বাজার দর ১০৲ টাকা। আমরা যে বাড়ীতে মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়ায় থাকিতাম, তাহার ভাড়া এখন অন্যূন দেড় শত টাকা। তখনকার দিনে আজকালকার মত এত বেশী পয়সা, সিকি, দুয়ানীর প্রাচুর্য্য ছিল না। সাধারণ কেনা বেচা কড়ি দিয়া চলিত। যাহার যতটুকু জিনিস আবশ্যক, কড়ি মূল্যে তাহা ক্রয় করিত। আজকাল সামান্য পানওয়ালীও পয়সার কমে পান বিক্রয় করে না।

বলা বাহুল্য, গঙ্গার সেতু তাহার অনেক পরে হইয়াছে—বোধ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই পুলের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফোর্ড লেস্‌লী ( Sir Bradford Leslie ) এখনও জীবিত আছেন। বয়স অন্ততঃ ৯০ এর অধিক হইবে। তখনকার বড়বাজার আর এখনকার বড়বাজারে অনেক প্রভেদ। তখন কতক কতক মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বটে। বিলাতী কাপড়ের আমদানী তাহারাই আরম্ভ করিয়াছিল। সে সময় ২।৪ জন বাঙালী বিদেশী সওদাগরী হৌসের মুচ্ছুদী ছিল। প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী, অর্থাৎ রাজা হৃষীকেশ লাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ও শিবকৃষ্ণ এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি ২।৪টি বড় বড় বাঙালী ফারম (Firm) ছিল। ইহারা বিলাতী মাল আমদানি করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের অপটুতা ও শ্রম-বিমুখতা বশতঃ মাড়োয়ারীরা সেই সমস্ত পদ দখল করিয়া লইয়াছে। সে সময় বড়বাজারে অনেক বাঙালীর বাড়ী ছিল। বিশেষতঃ তখন চোরবাগানের মল্লিকদের, জোড়াসাঁকোর শ্যাম মল্লিক প্রভৃতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। আর এখন যদি মাড়োয়ারীদের সহিত তুলনা করেন, তাহা হইলে কি দেখিতে পাইবেন ? রাজা হৃষীকেশ লাহাকে আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি—এমন অনেক মাড়োয়ারী ভাটিয়া আছেন, যাঁহারা তাঁহার মত লোককে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারেন। এক এক জন মাড়োয়ারী আছেন, যিনি অল্পসময়ের মধ্যে ২।৪ কোটি টাকা রোজগার করেন ; আবার হয় ত ততোধিক অল্পসময়ের মধ্যে সেই পরিমাণ টাকা লোকসান দিয়া থাকেন। অথচ তাহাতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

বোম্বাইয়ে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে মথুরাদাস গোকুলদাস একাই বোধ হয় ৪ কোটি টাকা ব্যবসায়ে লোকসান দেন ; কিন্তু তিনি মাথা খাঁড়া করিয়া রহিলেন—কতকগুলি কাপড়ের কারবারের Managing Agency তাঁহাকে অবশ্য ছাড়িতে হইল। বিলাতে তাঁহার যে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিল, তাহাদের দাম ৫০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। তাঁহার জননী তখন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন—"তুই ভাবিস্ না। আমার যে জহরৎ, মণি, মুক্তা আছে তার দাম ফেলে ছড়িয়ে দিলেও ১ কোটি টাকা হবে, তোর ইন্‌সলভেন্সী নিতে হবে না।" বড়বাজারেও এইরূপ দুই দশ জন ভাটিয়া, মাড়োয়ারী আছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বড়বাজারে তখন অনেক বাঙালীর বাড়ী ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাড়োয়ারীরা সে সকল দখল করিয়াছে। আমি যখন মফঃস্বলে যাই, তখন বলিয়া থাকি British Conquest of Bengal, এবং মাড়োয়ারী Conquest of Bengal ইত্যাদি। এ জন্য অনেক মাড়োয়ারী আমার উপর বিরক্ত হন। কিন্তু আমি নিন্দার জন্য বলি না। স্বজাতিকে উদ্যোগী পুরুষ হইতে বলিয়া থাকি। এখন যদি বলি, ইংরাজরা দেশের সব ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে, তখন ভাবিবেন না, ইংরাজকে ডাকাইত বলিতেছি ; সে বলার অর্থ—'তোমরা দেশবাসীরা জাগ।' আমার অনেক মাড়োয়ারী মক্কেল আছেন, অনেক সময় ভিক্ষার জন্য তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাঁহারা আমাকে খুলনা দুর্ভিক্ষ ও উত্তর-বঙ্গ-প্লাবন উপলক্ষে মুক্তহস্তে হাজার হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এক সময়ে বড়বাজারে বাঙালীর অনেক বাস্তুভিটা ও জমী ছিল। এখন অবশ্য দেখিতে গেলে বর্দ্ধমানের ও কাশিমবাজারের মহারাজাদের এক আনা আন্দাজ যায়গা আছে। এক দিকে হুগলীর পুল, এ দিকে গঙ্গা, ও দিকে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত, আর এ দিকে কুমার টুলীর কাছাকাছি Y. M. C. A. এই সমস্ত পল্লী মাড়োয়ারীদিগের দখলে আসিয়াছে। আর্ম্মেনিয়ান্ আছে, ইহুদী আছে, ইংরাজ আছে—ইহারা সমস্ত জমী বাঙালীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছে। আর অভাগা বাঙালী 'ভিটে-মাটিচ্যুত' হইয়া ক্রমে এই সংগ্রামে হটিয়া আসিতেছে। এক্ষণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বাঙালী পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ভিটাশূন্য হইয়াছে। যাহাকে peaceful penetration বলিয়া থাকে, সেই প্রথায় ক্রমান্বয়ে চোরবাগান, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট পার হইয়া সারকুলার রোডের উপর পর্য্যন্ত মাড়োয়ারীরা আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, অনেক মাড়োয়ারী ভাটিয়া আছেন, যাঁহারা চৌরঙ্গী অঞ্চলে বড় বড় বাড়ীর মালিক হইয়া তথায় বাস করেন। যাঁহারা একটু শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি, তাঁহারা আবার য়ুরোপীয়দের মত থাকিতে শিখিয়াছেন। তাহার উপর সেণ্ট্রাল এভিনিউর দুই পার্শ্বে আমাদের চোখের উপর যে সব ৪।৫ তলা বাড়ী হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা একখানা বাড়ীও বাঙালীর কি না সন্দেহ।

বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারত-বন্ধু জন ব্রাইটের ( John Bright ) কথায় বলিতেছি—We are homeless strangers in the land we once called our own.

গঙ্গায় তখন ষ্টীমার একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশ মাস্তুলওয়ালা পাইল-তোলা জাহাজ ছিল। সুয়েজ ক্যানাল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাটা হয়। তখন হইতে সুয়েজের ভিতর দিয়া ষ্টীমার চলিতে থাকে। তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়; কারণ, উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পালী-জাহাজকে এ দেশে আসিতে হইত। তাহাতে প্রায় ৩।৪ মাস, কখনও ৬ মাস সময় লাগিত; কাজেই পণ্যসম্ভার অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইত। কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়ার পর ৩।৪ সপ্তাহে লণ্ডন হইতে কলিকাতা আসা সম্ভব হইল; ফলে পণ্য অতি সস্তায় বিক্রয় হইতে লাগিল।

( ২ )

চেতলা, কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল তখন একেবারে পল্লীগ্রাম ছিল। আমার মনে আছে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমি বাড়ী না যাইয়া চেতলায় এক আত্মীয়ালয়ে সপ্তাহখানেক অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন মনে হইয়াছিল, যেন খাঁটি পল্লীগ্রামে রহিয়াছি। ইদানীং দুই একবার চেতলা যাইতে হইয়াছে। তখন মনে হইয়াছে, এ কোথায় আসিলাম? কালীঘাটের ও ভবানীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের সব বাড়ীর চারি দিকে বড় বড় ডোবা ছিল—সকল প্রকার আবর্জ্জনায় ঐ সকল ডোবা পূর্ণ থাকিত। সহরের নিকটস্থ পল্লীগ্রামের মত দুর্দ্দশাপন্ন স্থান আর নাই। কেন না, সহরের

সমস্ত আবর্জ্জনা ও অসুবিধার ভার ইহাদের স্কন্ধেই পতিত হয়। দেখিতে দেখিতে এই চেতলা, কালীঘাট ও আলিপুর কি আশ্চর্য্যরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে! জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ব্যারিষ্টার, রাজা, মহারাজা এইরূপ বহু সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোক অধুনা এই সমস্ত অঞ্চলে বাস করিতেছেন। খিদিরপুর আর বালীগঞ্জও আমাদেরই আমলে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও কত বড় আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা প্রাচীনেরা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ বাড়ীই মাড়োয়ারী ও ইংরাজের হাতে। হরিশ মুখার্জি ষ্ট্রীট ও রসারোডের অনেক বাড়ী সুখের বিষয়, এখনও বাঙালীর হাতে আছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, তখন পল্লীগ্রামের জমিদার পল্লীগ্রামে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, দেশের টাকা দেশে থাকিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহরে থাকা একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন বড় বড় জমিদার পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা একরূপ 'দেশছাড়া' বলিলেই হয়। ইহার কুফল অনেক। পল্লী-শ্রী অন্তর্হিত হইয়া সহর-শ্রীতে পরিণত হইয়াছে। আমি সমস্ত বাঙলায় বোধ হয় গত আড়াই বৎসরে অন্ততঃ ৩০ হাজার মাইল ঘুরিয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পল্লীগ্রামগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। দেখিয়াছি—বীরভূম ও বাঁকুড়া জিলা দুর্ভিক্ষের পীঠস্থান হইয়া পড়িয়াছে। বাঁকুড়ায় প্রতি তিন বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে পূর্ব্বে এক রাজা ছিলেন। মারহাট্টাদের আক্রমণে আলীবর্দ্দী খাঁ যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুপুরের রাজা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর হইতে বিষ্ণুপুরের রাজাদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' পর রাজা যখন লাটের খাজনা সরবরাহ করিতে পারিলেন না, তখন কুল দেবতা মদনমোহনকে আনিয়া বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়ীতে রাখেন। তদবধি তাঁহাদের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। সমস্ত সম্পত্তি বর্দ্ধমানের মহারাজা পত্তনী লইলেন। সেই সময় হইতে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর শ্রীভ্রষ্ট হইল। বাঁধ-বন্দীর দিকে আর নজর রহিল না।

এই সমস্ত বাঁধে আবশ্যকমত জল ধরিয়া রাখা হইত। আবার তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ কাটিয়া দিলে উপর হইতে জল নামিয়া আসিত। ঐ জল নানা পয়ঃপ্রণালীর মারফতে কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইত। ইহাতে প্রচুর ফসল হইত। সেচের এমনই সুব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজা জানেন, পত্তনী তালুক 'অষ্টমে গেলে' তিনি টাকা পাইবেন; পত্তনীদার ভাবেন তিনি নালিশ করিলে নিম্নদরপত্তনীদারের নিকট টাকা পাইবেন। এইরূপে জমি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। কেহ কাহারও জন্য চিন্তা করেন না। ইহাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এখনও দেখা যায়, যাহাকে 'তাল পুকুর' বলিত, বর্দ্ধমান বিভাগের বহুস্থানে সেইরূপ অনেক তালপুকুর ভরাট হইয়া গিয়াছে; তথায় চাষ-বাস হইতেছে। জল ধরিয়া রাখিবার কোনও বন্দোবস্ত নাই। ময়মনসিংহ ও বরিশাল প্রভৃতি সমস্ত জিলারই জমিদারগণ পল্লী ছাড়িয়া

সহরবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে বৎসরে দুই এক মাসের জন্য সহর হইতে পল্লীতে ফিরিয়া যান বটে, কিন্তু বড় বড় জমিদার বারমাসই কলিকাতায় থাকেন। ফল এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। ইহা হইতে যদি জমিদারেরা অত্যাচারী হইয়াও প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে জমিদারির মধ্যে বড় বড় দীঘি কাটাইতে হইত, পুরাতন পুষ্করিণীগুলির সংস্কারসাধন করিতে হইত, পথ-ঘাটের দিকে নজর রাখিতে হইত। কবি কালিদাস রঘুবংশে রাজাদিগের সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" বাঙ্‌লার জমিদার পূর্ব্বকালে বস্তুতই প্রজাগণের পিতার মত ছিলেন। অত্যাচারী জমিদার যদি প্রজার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিয়াও প্রজাদের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা হইলে সেই স্থানে 'বারো মাসে তের পার্ব্বণ' করিয়া এবং পুষ্করিণী খনন, পথ নির্ম্মাণ, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি সদনুষ্ঠান করিয়া দেশের টাকা দেশেই ব্যয় করিবার সুযোগ পাইতেন। প্রজারাও সেই টাকার কতকাংশ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু অধুনা জমিদারেরা কলিকাতায় বা অন্যান্য সহরে বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এক জমিদার কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে বসতবাটি নির্ম্মাণ করিলেন। অন্য জমিদার ভাবিলেন—ঐ জমিদার যদি ঐরূপ গৃহে বাস করেন, মোটরে চড়েন, খানা দেন, তাহা হইলে তিনিই বা করিবেন না কেন? এইরূপে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঐ প্রতিযোগিতা হইতেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি নিজে দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ীতে একটা "পার্টি" হইলে তথায় রোভার, রোল্‌স রয়েস প্রভৃতি বহুমূল্য মোটরের সমাগম হয়। এইরূপে বিলাসের নানা সাজসজ্জায় জমিদারের বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ দেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়। রাজসাহী, বগুড়া অঞ্চলে দেখিয়াছি—পূর্ব্বতন পল্লীবাসী জমিদারেরা তথায় শত শত বাঁধ, দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন; সেজন্য তথায় জলকষ্ট কোনকালে অনুভূত হইত না। এখনও দেখিতে পাই, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী যে সকল দীঘি ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, সেগুলি সংস্কারাভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। যদি বা কোথাও কিছু জল থাকে, তাহাও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একেবারে কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়। সেই জলে বস্ত্র ধৌত করা ও তৈজসপত্র পরিষ্কার করা হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল পানীয়রূপেও ব্যবহৃত হয়। ফলে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে দেশ একেবারে ধ্বংসের পথে যাইতে বসিয়াছে। গত ২৫ বৎসরের মধ্যেই এই সকল রোগের প্রকোপ অধিক হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অধুনা পল্লীগ্রামে বাস করা অসভ্যতার পরিচায়ক। কলিকাতায় আসিয়া তথা কথিত সভ্যসমাজে বাস করাই এখন সকলের লক্ষ্য হইয়াছে।

হরিশ মুখার্জ্জি রোডে অথবা রসা রোডে এখন অনেক সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি হইয়াছে। এই বাঙালী বাসিন্দার মধ্যে ইংরাজ, ভাটিয়া, মাড়োয়ারীও আসিয়া বসবাস করিয়াছে। কিন্তু বাঙালীর সহিত ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে। বাঙালী ব্যতীত

অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা ব্যবসাদার; প্রতিনিয়ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আর বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে উকীল, ব্যারিষ্টার ও দুই চারি জন জজ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে সমস্ত জমিদার মামলা-মকদ্দমা করিয়া উৎসন্ন যাইতেছেন, তাঁহাদের অর্থ এই সমস্ত উকীল-ব্যারিষ্টারদের পকেট পূর্ণ হইতেছে। ইহাতে দেশে নূতন ধনাগম হইতেছে না; মাত্র দেশের এক স্থানের অর্থ অন্য স্থানে শোষিত হইতেছে।

আর এক কথা, অধুনা রেল ও ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের মারফতে পল্লীগ্রাম হইতে সহরে তরিতরকারী, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি নিত্য বাহিত হইতেছে বলিয়া পল্লীগ্রামে ঐ সমস্ত দ্রব্য দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে হয় ত অবগত নহেন যে, খুলনায় দুগ্ধের মূল্য আট আনা সের। পূর্ব্ব হইতেই ব্যাপারীরা পল্লী-মফঃস্বলে ঘুরিয়া দাদন দিয়া রাখে বলিয়া এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, আবশ্যক হইলে উচ্চ মূল্যেও উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মৎস্য অথবা তরিতরকারী এখন আর পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না। এই শোষণক্রিয়াই পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশের মূল। রেল ও ষ্টীমারের কল্যাণেই পল্লীগ্রামের এই দুরবস্থা হইয়াছে। আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন যে ইহার মূলে নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে দিন দেখিলাম, বাংলা দেশে ৩ শত ৮০ কোটি টাকার মাল আমদানি-রপ্তানি হইয়াছে। কথাটা শুনিলে মনে হয়, বুঝি বা সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে কলিকাতার ধন বাড়িয়া চলিতেছে। কলিকাতায় অবশ্য প্রভূত ধনের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু আমাদের বাঙালীর সহিত ইহার সম্পর্ক কি? এই টাকার শতকরা পাঁচ টাকাও বাঙালীর কি না সন্দেহ। বাঙালী কেরাণী, স্কুল-মাষ্টার, উকীল এবং দুই চারি জন মুন্‌সেফ-জজের সংখ্যা অঙ্গুলীর পর্ব্বে গণনা করা যায়। ইঁহারা ত অর্থের সৃষ্টি করেন না। আমি আজ ২৫ বৎসর যাবৎ দেশের তরুণদের নিকট 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারের' কথা বলিয়া আসিতেছি। দেশে রাসবিহারী ঘোষ কিংবা এস্. পি. সিংহ ২।৪ জনের অধিক নাই। এক একজন মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়া বণিক এক দিনে যাহা রোজগার করে, একজন সমপর্য্যায়ের বাঙালী তাহা সংবৎসরেও করিতে পারে না। আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যবহারজীবী; তাহার নিকট শুনিয়াছি, আলিপুরে ৭ শত ৫০ জন এবং খুলনায় একশত জন উকীল আছেন। তাহার উপর প্রতি বৎসর ১০।১৫ জন ওকালতীতে যোগদান করিতেছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে আমি বরিশালে গিয়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তথায় এমন ২।৪ জন উকীল আছেন—যাঁহারা মাসিক ৫।৭ শত টাকা উপার্জ্জন করেন। অবশিষ্ট উকীলেরা গড়পড়তায় মাসিক ১৫ টাকা পান কি না সন্দেহ। কেন না, যাঁহারা ঘরের পয়সা আনিয়া বাসাখরচ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঐ সঙ্গে ধরিতে হয়। অথচ প্রতি বৎসর ২ হাজার ছাত্র আইন শিক্ষা করিতেছে! ইহা কি অর্থনীতিক আত্মহত্যা নহে?

আরমেনিয়ান ষ্ট্রীটে ও এজ্‌রা ষ্ট্রীটে ইহুদী ও আরমানী জাতীয় বড় বড় বণিক

আছেন। তাহার পর ইংরাজদের মহল্লা। তাহার পর ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, দিল্লীওয়ালা ও পার্শী। এসমস্ত ধনী বণিককে বাদ দিলে বাঙ্‌লার ধন কোথায় থাকে? বাঙ্‌লায় ৮২টি জুট মিল আছে, তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র মাড়োয়ারীর। গত ৪।৫ বৎসরের মধ্যে বিরলা ব্রাদার্স ও স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ কোম্পানী প্রভৃতির উদ্যোগে এই মিলগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত মিলই ইংরাজের। অবশ্য মিলে বাঙালীর সেয়ার কিছু আছে। ইংরজেরাই মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। তাহাদের মুষ্টির মধ্যেই সমস্ত ধন ন্যস্ত। আপনারা জানেন, সার ডেনিয়াল হ্যামিল্‌টন্, ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির প্রধান অংশীদার। তিনি একদিন কলিকাতা ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে বলিয়াছিলেন—"আমার বলিতে লজ্জা করে যে, আমার অনেক জুট মিলের শেয়ার আছে।" এই যে জুট মিলে লাভ হইতেছে, এই লাভ কাহারা ভোগ করিতেছে? যাহারা ম্যালেরিয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে ৮।১০ ঘণ্টা কোমর-জলে থাকিয়া পাট কাচে, তাহারা কি পায়? রেলি ব্রাদার্স, বার্ক মায়ার ব্রাদার্স, ডেভিড কোম্পানী প্রভৃতি লাভের কিছু অংশ পায়। আর লাভের মোটা অঙ্ক পায় মিলওয়ালারা। আফিসে বাঙালী বড় বাবুর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইংরাজ বণিকগণ কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছে।

আমি ত খদ্দর খদ্দর করিয়া পাগল। গত বৎসরের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখি, ২৫ হইতে ৩৫ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ও আমাদের চীৎকারের পুরস্কার যথেষ্ট পাইয়াছি। ব্যবসাক্ষেত্রে জাপান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বোম্বাইয়ের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্র বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া বেড়াই। কিন্তু বাঙালীর মত অনুকরণপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। বাঙালী যুবক যেমন ব্যারিষ্টার হইল, অমনই হ্যাট্, কোট, কলার কি রকম করিয়া পরিতে হয়, কি রকমে টাই বাঁধিতে হয়, গলায় কলার আঁটিতে গিয়া কিরূপে থক্ থক্ করিয়া কাসিতে হয়, কিরূপভাবে কাঁটা-চামচ ধরিতে হয় এই বিষয়ে তাহারা হয় ওস্তাদ। আর বেশী বলিব না।

কলিকাতা এক হিসাবে নরক হইতে এখন স্বর্গ হইয়াছে। চৌরঙ্গীতে প্রাসাদতুল্য ভবনশ্রেণী, সহরের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ট্রাম, মোটর প্রভৃতির সমাবেশ, অন্যান্য সুসভ্য দেশে এ সকল বিষয়ে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, এ দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই বলিয়া সক্রেটিস, প্লেটো—ইহারা কি অসভ্য ছিলেন? ফল মূল ভোজন করিয়া আজীবন নিভৃত অরণ্যে যাঁহারা কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি অসভ্য বলিব? আধুনিক সভ্যতা যাহাকে বলে সেটা সাম্যনিদর্শন মাত্র—বহির্ভাগ দুরস্ত রাখিতে পারিলেই আজকাল সভ্য আখ্যা পাওয়া যায়। আমরা মোটর চড়িতেছি; কিন্তু মোটর নির্ম্মাণ করিয়া বা পেট্রোল সরবরাহ করিয়া আমাদের দেশের লোক অর্থ উপার্জ্জন করে না। ফোর্ড, রকফেলার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। ফোর্ডের আয় বৎসরে ৩৩ কোটি টাকা। সমগ্র বাঙলা

দেশের রাজস্ব ৩১ কোটি টাকা। ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্টের দেয় রাজস্ব বাদ দিলে বাঙলার ভাগ্যে ১০ কোটি টাকা পড়ে। এই যে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির রাজস্ব—একক ফোর্ডের আয় তদপেক্ষা বেশী। কথা এই—আমি যখনই মোটরে আরোহণ করি অমনি সেই অর্থ হয় ফোর্ড, নয় ত রোলস্ রয়েস অথবা ওভারল্যাণ্ডের তহবিলে চলিয়া যায়। আমেরিকার প্রতি তিনজনের একখানা মোটর গাড়ী আছে। কিন্তু তাহাদের টাকা অন্যত্র যায় না, সেই দেশেই থাকে। আমাদের টাকাটা যদি আমাদের দেশেই থাকিত, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন বাঙলা দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। জীবন যাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের মুখের গ্রাস বিদেশে যাইতেছে। রেল অথবা ষ্টীমারে চড়িলেই টিকিটের মূল্যের চৌদ্দ আনা বিদেশের তহবিলে চলিয়া যায়। যে দুই আনা আন্দাজ এই দেশে রহিল, তাহা ষ্টেশন মাষ্টার, খালাসী প্রভৃতি ভাগ করিয়া লয়। বৈদ্যুতিক শক্তিও বিদেশীর হাতে—

"পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

আমরা যদি উহা উৎপন্ন করিতে পারিতাম, তবে টাকাটা আমাদের হাতেই থাকিত।*

* বসুমতী—পৌষ ও ফাল্গুন, ১৩৩২

## দেশবন্ধু স্মৃতিতর্পণ

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলায়, এমন কি সমগ্র ভারতে হাহাকার পড়িয়াছে কেন? রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরমপন্থী বল, দোকানী পসারী বল, সকলের মধ্যেই ক্রন্দনের রোল কেন? যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এমন কি বিপরীত মতাবলম্বীও ছিলেন, তাঁহারাও আজ সমস্বরে তাঁহার মৃত্যুতে যে কেবল শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয়, তাঁহার গুণকীর্ত্তনেও শতমুখ। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছি। অনেকেই ইঁহার পূর্ব্বে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগ-লালনা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন, এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়া ছিলেন; তিনিই এক মহা শুভমুহূর্ত্তে, দেশের পক্ষে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণে, সকল ছাড়িয়া রিক্ত হইয়া বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। হয়ত তিনি আর্ত্তা, বিপন্না, লাঞ্ছিতা

দেশমাতার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। দেশের কাজে এ-প্রকার আত্মোৎসর্গ, এ-প্রকার জীবনাহুতি কখনও দেখি নাই—আর দেখিব কিনা তাও জানি না। সকলেই আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন—হ্যাঁ, বাঙালীর ঘরে একটা মানুষ জন্মিয়াছিল বটে! যিনি নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান গণনা না করিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজ সাধনায়, তাঁহার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন, আর সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন অসময়ে তাঁহার বিয়োগ ঘটিয়াছে। দেশবন্ধু প্রকৃত প্রস্তাবে মরেন নাই। তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মে ও বাষ্পে পরিণত হইয়া পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাঁহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত আজ বাঙালী মাত্রেরই মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান করুন, যেন তাঁহার চিতা-বাষ্প সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাসে মিলাইয়া গিয়া নিঃশ্বাসের সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে তাঁহার সুমহান্ আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে। ভারতের জননীগণ যেন এইপ্রকার সন্তানই গর্ভে ধারণ করেন।

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে;
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন॥"*

* বঙ্গবাণী—শ্রাবণ, ১৩৩২

## গিরীশ-সম্বর্দ্ধনা

### ( অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে )

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে মাত্র দুই একটি কথা বলিব। তিনি এখনও অশীতি বৎসরের ভার সুন্দরভাবে বহন করিতেছেন। কিছুমাত্র কুব্জদেহ ও ন্যুব্জ-পৃষ্ঠের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এতবড় একটা কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াও অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের জন্য অশেষ পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। Hindu Family Annuity Fund-কে বাঙালীর একপ্রকার প্রথম জীবনবীমার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ইহার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক বছর যাবৎ অকাতরে বহুমূল্য সময় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের "তিনি একটি প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন।" এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যে প্রকার পরিশ্রম করেন তাহার সিকিমাত্রও অনেক তরুণ বা যুবাপুরুষ

করিতে সক্ষম নহেন। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি স্বাস্থ্যের দিকে রীতিমত নজর রাখেন। প্রত্যহ মুক্তবাতাসে তিনি অন্যূন এক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। বহুবৎসর যাবৎ তিনি আমাদের ময়দান ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট স্বরূপ।

অধ্যক্ষ বসু মহাশয়ের অনেকগুলি সামাজিক গুণ আছে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের হিতকল্পে তিনি মুক্তহস্ত। অর্থে হোক, সামর্থ্যে হোক, তিনি পুরাতন বন্ধুদিগকে কখনই সাহায্য করিতে ক্রটী করেন না। অনেক সময়ে আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছি যে, ভগবানের কৃপায় তাঁহার বহু সন্তান সন্ততি, এমন কি প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্র আছে। সর্ব্বদাই ইহাদের লইয়া তিনি পরিবৃত। কিন্তু ইহা সত্বেও তাঁহার পুরাতন বন্ধুবর্গ কি প্রকারে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলের স্থান হইতে বঞ্চিত হইল না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন, এবং দেশের কল্যাণে রত থাকুন।

* Bangabasi College Magazine. 80th Birth-day Number—Pp. 101-2.

## শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রকে লিখিত পত্র

৯১, আপার সার্কুলার রোড
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০

প্রিয় সতীশবাবু,

দেবী সরস্বতী স্বপ্নে আবির্ভূতা হ'য়ে আপনাকে বল্‌ছেন—"আবেগ-উচ্ছ্বাস আর কেন? অনেক হয়েছে। দুহাজার বৎসর ধরে হিন্দুরা শুধু ঘুমিয়ে আছে। আর নয়; এখন কেবল উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত। তোমাকে যে প্রতিভা দিয়েছি, 'আবেগ-উচ্ছ্বাসে' তার অপব্যয় করো না। 'যশোর খুলনার' ইতিহাস-রচনায় আত্মনিয়োগ কর; এতেই ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে চিরকাল স্মরণ করবে।" *

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

* দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিক্ষক বলিয়া দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কোন্ পথে গেলে ভাল হয়, দারিদ্র্যবশতঃ তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া 'উচ্ছ্বাস' নামে এক কবিতার বই লেখেন, এবং উহার একখণ্ড আচার্য্য দেবকে উপহার পাঠাইলে তিনি এই পত্র লিখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। এই পত্রের সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট, কারণ ইহারই প্রেরণায় তিনি 'যশোহর-খুলনার' ইতিহাস লিখিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যদেব উহা প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন।

# শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে লিখিত পত্র (১)

গ্লেনডেল—দার্জিলিং

১৪-৬-১৯১১

প্রিয় জিতেন,

তোমার ১২ তারিখের পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। তোমাদের কাজ কতদূর এগিয়েছে জানবার জন্য তোমাকে পত্র লিখতে যাচ্ছিলাম। তোমার কাজের যা খবর দিয়েছ, তাতে সব কথা লেখনি। তবে কাজ ভালই চলছে বোধ হয়, হেমেন্দ্রকে (২) বলবে মেথিল ইথার ( Methyl Ether ) সম্বন্ধে তার গবেষণা বিশেষ মূল্যবান হবে।

আমার হয়েছে আহত সেনাপতির অবস্থা—নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই—সৈন্যেরা যুদ্ধ জয় করতে করতে কেমন এগিয়ে চলেছে দূর থেকে বসে শুধু তাই দেখা। ভগবানের অনুগ্রহে আমার অসুখের বৎসরটাই দেখছি গবেষণার গৌরবে উজ্জ্বল হ'তে চলেছে। আমি আশা করি ভারতীয়-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব তোমরা প্রতিপন্ন করতে পারবে।

রসিকের (৩) কাজও খুব ভাল হচ্ছে শুনে খুব আনন্দ হ'ল।

গত শুক্র শনি বারে এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল ছিল। পরে তিন দিন অবিরাম বৃষ্টি। আজ আকাশ ভাল দেখাচ্ছে। ধীরেন (৪) Germany থেকে লিখেছে, সেখানে P. H. D. উপাধির জন্য তাকে গবেষণা করতে দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় ধারণা তুমি, হেমেন এবং রসিক এদেশে থেকে গবেষণা করে তাদের সমান ফল দেখাতে পারবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১) বর্ত্তমানে ইনি বিহার গভর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।
(২) তখন সায়ান্স কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।
(৩) বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের রাসায়নিক।
(৪) ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—বর্ত্তমানে রিপণ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

## শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে লিখিত পত্র

( দেশবন্ধুর কারাবরণের সময় লিখিত )

University College of Science
১৪—১২—২১

প্রিয় ভগিনী,

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জন সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম বদান্যতা, তাঁহার আন্তরিক স্বদেশ প্রীতি, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও দুর্ব্বলকে আশ্রয়দান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে বাঙলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তাঁহার বর্ত্তমান পরীক্ষার সময় আমার মন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জন-সাধারণ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয় আমি হয়ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারা জীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত আমার অন্তর্দৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার মানসিক শক্তিও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনী, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসিমুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, এবং আপনি বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, এবং আপনার স্বামীও আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

---